॥ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ

মণি বাগচি

শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

SAPARSAD SRI RAMAKRISHNA

A Bengali biography of the sixteen direct disciples of Sri Ramakrishna.

By : MONI BAGCHEE

॥ প্রকাশক ॥

দুলাল বল

শৈব্যা পুস্তকালয়

৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৭ জন্মাষ্টমী

প্রচ্ছদ : শ্রীধীরেন বল

মুদ্রাকর :

লীলা ঘোষ

তাপসী প্রিণ্টার্স

৬, শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৬

॥ ভূমিকা ॥

মায়ের কথা মিথ্যা হবার নয়।

ছেলেরা সব একে একে আসতে থাকেন দক্ষিণেশ্বরে। আসেন নরেন, রাখাল, তারক, শরৎ, শশী প্রমুখ যোলজন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-সহচর। এঁদেরই হাতে যুগাবতার তুলে দেন তাঁর তপস্যার সম্পদ। সিদ্ধির ফল। একজনের ললাটে এঁকে দিয়েছিলেন নেতৃত্বের রাজতিলক। তিনি আর কেউ নন—বিশ্বমঠ-বিহারী স্বামী বিবেকানন্দ।

এই লীলাসহচরদের জীবনেই লেখা আছে রামকৃষ্ণ-জীবনের ভাষ্য। উনিশ শতকের শেষ পাদে এঁদের নিয়েই ইতিহাসের এক শুভ লগ্নে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল রামকৃষ্ণ-যুগ, রামকৃষ্ণ-আন্দোলন। বলা বাহুল্য, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতিতে এঁদের প্রত্যেকেরই ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। এঁদের প্রত্যেকেরই জীবন স্ব-স্ব বিশেষত্বে ভাস্বর হলেও, প্রত্যেকেরই ছিল একটি সর্বতোমুখী প্রতিভা। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পতাকাধারী, মানব-সেবাব্রতী এই রামকৃষ্ণগণের অমৃতসমান জীবনকথা পরিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থের পরিকল্পনা শ্রীরবীন বলের, আমি শুধু এর রূপকার।

৯০ বাগুইআটি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৮

মণি বাগচি

স্বামী বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্ ।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥ ১

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্ ।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥ ২

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব
শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং ।
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥ ৩

অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং
কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং ।
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥ ৪

মহাসমন্বয়াচার্য
যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের
পুণ্যস্মৃতিতে নিবেদিত।

সূচীপত্র

॥ শৈব্যা প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ॥

যুগমানব রামমোহন

যুগদেবতা রামকৃষ্ণ

পরমাপ্রকৃতি সারদামণি

বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

আলোকময়ী শ্রীমা

আচার্য জগদীশচন্দ্র

শরৎচন্দ্র

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন বোস

পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা

জীবনীশতক

॥ পরবর্তী বই ॥

বাঘা যতীন

শ্রীরামকৃষ্ণ

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিনে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

বিবেকানন্দ।
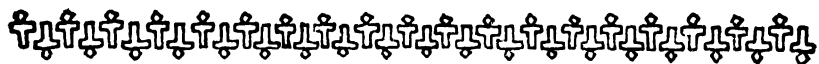
দিনের সূর্য অস্ত গেল।

অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ রশ্মি রাঙিয়ে দিয়েছে মন্দিরের চূড়া।

দক্ষিণেশ্বরে মহাপীঠ ভবতারিণী দেবীর মন্দির। রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের যিনি পূজারী তিনি তখন কুঠির ছাদে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন, আর একবার পশ্চিম আকাশে ঢলে-পড়া সূর্যের দিকে তাকিয়ে, আবার মন্দিরের চূড়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, চীৎকার করে বলছেন: ওরে্ তোরা কে কোথায় আছিস এখানে আমার কাছে চলে আয়—তোরা যে মায়ের চিহ্নিত সন্তান, তোদের দিয়ে মা কতো কাজ করাবেন। আমি যে তোদের জন্য অপেক্ষা করছি।

একটু পরে জগৎজননীর উদ্দেশে তিনি তেমনি আর্তস্বরে বলেন, মা, তুই যে আমাকে বলেছিলি কত ছেলে আসবে এখানে; কই তাদের কেউ তো এলো না। একটা দিন যে বৃথা গেল। আমি যে আকুলভাবে তাদের আসার পথ চেয়ে আছি। নিজের হাতে তাদের তৈরি করে দিয়ে যাব—নবযুগের ভগীরথ যে তারা, না এলে আমার কাজ যে শেষ হবে না, মা। তারা ঠিক আসবে তো মা?

সূর্য অস্ত গেল। গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে যায় সেই আর্তকণ্ঠ স্বর: ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, এখানে আমার কাছে চলে আয়।

চরাচর নিস্তব্ধতায় ভরে ওঠে। এ শুধু একজন সিদ্ধ সাধকের হৃদয় নিঙরানো বিলাপ ছিল না—এ ছিল যেন ইতিহাসের অন্তরের আকুল আর্তি। উনিশ শতকের বাংলার বর্ণাঢ্য ইতিহাসের তখন ক্রান্তিলগ্ন সমুপস্থিত হয়েছে। তারই তরঙ্গশীর্ষে দাঁড়িয়ে আছেন তপঃসিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ সাধক, মায়ের একনিষ্ঠ পূজারী, সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাস্বর বিগ্রহ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। এঁরই অলৌকিক সাধনার কষ্টিপাথরে হাজার বছরের পুরানো হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য আবার নতুন করে প্রমাণিত হয়েছিল চূড়ান্তভাবে। তাঁরই এক মানস-সন্তান এই যুগ-দেবতার মহিমা বর্ণনা করেছেন এইভাবে:

'এক্ষণে এমন এক ব্যক্তির জন্মের সময় হইয়াছিল, যাঁহাতে একাধারে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয় বিরাজমান থাকিবে, যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন—সকল সম্প্রদায় এক আত্মা। এক ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত, ও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান। যাঁহার হৃদয় ভারতান্তর্গত বা ভারত বহির্ভূত দরিদ্র, দুর্বল, পতিত সকলের জন্য কাঁদিবে। অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকলের উদ্ভাবন করিবে, যাহাতে ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত সকল বিরোধী সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করিবে ও এইরূপ অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যভাবে উন্নতি সাধক সার্বভৌমিক ধর্মের প্রকাশ করিবে।'

'এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি অনেক বর্ষ, ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলাম। এইরূপ একজন ব্যক্তির জন্মিবার সময় হইয়াছিল প্রয়োজন হইয়াছিল। আর অদ্ভুত ব্যাপার এই, তাঁহার সমগ্র

জীবনের কার্য এমন এক শহরের নিকট অনুষ্ঠিত হয় যাহা পাশ্চাত্য ভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল, ভারতের অন্যান্য শহর অপেক্ষা যাহা অধিক পরিমাণে সাহেবীভাবাপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যা কিছুমাত্র ছিল না। এরূপ মহামনীষাসম্পন্ন হইয়াও তিনি নিজের নামটা পর্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রত্যেকে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারী পর্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া একজন মহামনীষী বলিয়া স্থির করিয়াছিল।'[১]

ইনিই যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি ভারতের সকল মহাপুরুষের পূর্ণ প্রকাশ আমরা এঁরই মধ্যে দেখি। সর্বধর্মসমন্বয়ের পথ তিনিই তো খুলে দিয়ে গেছেন। 'অবতার বরিষ্ঠায়'—সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার বলে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ঘোষণা করে গিয়েছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, বাংলার সুদূর অজ্ঞাত অপরিচিত কোন এক পল্লীতে তাঁর জন্ম। অথচ আজ য়ুরোপ আমেরিকায় হাজার হাজার নরনারী সত্যিই ফুল-চন্দন দিয়ে তাঁর পূজা করছে। কামারপুকুর গ্রামের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র গদাধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৩-১৮৮৬) ইতিহাসের এক মহালগ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই বাংলার মাটিতে। তাঁর বারো বছরের কঠোর আর অলৌকিক সাধনা ও সিদ্ধি শতাব্দীর পটে নিঃশব্দে লিখে দিয়েছিল এক নতুন ইতিহাস। তাঁর প্রত্যেকটি মানস-সন্তান একবাক্যে বলে গিয়েছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই আদি কারণ ঈশ্বর—জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যুগাবতার।

সর্ব সাধনায় সিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁর ভাবী সন্তানদের জন্য দিনের পর দিন দক্ষিণেশ্বরে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন উনিশ শতক শেষ হতে মাত্র দুই দশক বাকী। তখনই একে একে আসতে থাকেন সংসারের সকল আকর্ষণ ছিন্ন করে সন্ন্যাসী

[১] 'ভারতে বিবেকানন্দ' (ষষ্ঠ সংস্করণ) : মাদ্রাজ বক্তৃতা।

সৈনিকের দল। এলেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি তাঁর চিহ্নিত মানসপুত্রগণ। দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে শুরু হয় আত্মনিবেদনের পালা। এইসব লীলা-সহচর যখন একে একে তাঁর কাছে এসে জড়ো হলেন, তখন রামকৃষ্ণের কী আনন্দ। ভাগ্নে হৃদয়কে ডেকে বললেন, ওরে হৃদু, আমার মায়ের কথা কি মিথ্যে হয় রে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যেদিন থেকে রামকৃষ্ণের অভ্যুদয় হয়েছে, সেদিন থেকেই বর্তমান ভারতের সূত্রপাত হয়েছে। রামপ্রসাদের গানেই রামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়ের সূচনা; তাঁর কাব্যে এবং গানে যা ফুটে উঠেছিল, দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীতলে একদিন তাই্ই মূর্তি ধরে এসে দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকের অতি প্রত্যুষেই সাধক কবি গেয়েছিলেন :

'আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কারু ঘরে,
যা চাবি সেই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরমধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
ও মন, কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।।'

তারপর শতাব্দীর শেষভাগে সিদ্ধ মহাপুরুষ রামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা তাঁরই প্রকাশ দেখলাম। এই দেবমানবের চরিতালোচনায় সকলের আগে একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। তাঁর মহিমান্বিত আবির্ভাব ইতিহাসেরই অভিপ্রেত ছিল—এ শুধু ব্যক্তিগত একটি অভ্যুদয় ছিল না। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, রামকৃষ্ণের আবির্ভাব বাঙালির স্বভাবধর্মের এক আশ্চর্য প্রকাশ। কি করে যে এই নিরক্ষর দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে এমন গভীর অধ্যাত্মবোধ, জগতের সকল বিরোধী ধর্মমত ও সাধনার, অনুভূতির সমন্বয় ঘটেছিল, তার কারণ নির্ণয় করা কঠিন; এর সবটাই অদৃশ্য।

সংস্কার যুগের শেষে এক সমন্বয় যুগের সূচনা করে দিয়েছিল রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ১৮৭৫ সাল থেকেই কলকাতার শিক্ষিত বাঙালিদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতার টাউন হলে একটি বক্তৃতার সময় পরমহংসদেবের অপূর্ব আধ্যাত্মিকতার বিষয় সর্বসাধারণের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে কলিকাতা মহানগরীতে বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশববাবুর বক্তৃতা মারফৎ পরমহংসদেবের বিষয় প্রথম প্রচার হইয়াছিল। তিনিই পরমহংসদেব দ্বারা সর্বপ্রথম আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হন।' রামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনটাই উপনিষদের মহাসমন্বয়ের রূপ। সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদের মধ্যেই তো তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। দীর্ঘ বারো বছরের সাধনার ফলে তিনি যে পরম সত্য লাভ করেছিলেন তারই সাহায্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্য। সেই সামঞ্জস্যকে কার্যে পরিণত করে নিজের জীবনে তিনি দেখিয়েছিলেন। তাই তো বিবেকানন্দকে আমরা বলতে শুনি: 'ঠাকুরের এক-একটি কথা অবলম্বন করে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন গ্রন্থ লেখা যেতে পারে।'

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: 'ঠাকুরের কথা অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তিনি যেন সর্বপ্রকার ভাবের মূর্তিমান সমষ্টি ছিলেন। ভাব রাজ্যের অত বড় রাজা মানবজগতে আর কখনও দেখা যায় নাই। ভাবময় ঠাকুর ভাবমুখে অবস্থান করিয়া নির্বিকল্প অদ্বৈতভাব হইতে সবিকল্প সকল প্রকার ভাবের পূর্ণ প্রকাশ নিজে দেখাইয়া সকল শ্রেণীর ভক্তদিগকে স্ব স্ব পথের ও গন্তব্যস্থলের সংবাদ দিয়া অন্ধকারে অপূর্ব জ্যোতিঃ, নিরাশায় অদৃষ্টপূর্ব আশা এবং সংসারের নিদারুণ দুঃখকষ্টের ভিতর নিরুপম শান্তি আনিয়া দিতেন।'[১]

দক্ষিণেশ্বরে দেবলীলার সহচর রূপে নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, তারক,

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ: ৩য় খণ্ড স্বামী সারদানন্দ

শরৎ, শশী ও বাবুরাম প্রভৃতির আগমন যখন একে একে ঘটতে থাকে তখন থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে আশ্চর্য রূপে গুরুরূপে প্রকাশ করেন। নিজমুখেই তিনি বলেছেন: 'ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।' মানস সন্তানদের আসার অনেক আগে থেকেই অবশ্য বলরাম বসু প্রমুখ তাঁর চিহ্নিত গৃহী ভক্তদের আসা যাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেসব কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে 'কথামৃত' গ্রন্থে যার লেখক মহেন্দ্রগুপ্ত ('শ্রীম') ছিলেন রামকৃষ্ণের অনুগৃহীত একজন বিশিষ্ট গৃহী ভক্ত। রামকৃষ্ণের দিব্য বাণীকে লিপিবদ্ধ করে তিনি লীলাপ্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে গেছেন। দক্ষিণেশ্বরের কি রকম আনন্দের হাট বসেছিল চিত্তাকর্ষক সেই কাহিনীই কথামৃত গ্রন্থের উপজীব্য হয়েছে। ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে ঈশ্বরীয় কথা প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ কয়েক বছরের দিনগুলি কিভাবে অতিবাহিত হতো 'কথামৃত' পাঠ করেই আমরা জানতে পারি। ধর্ম জগতে এ যেন এক এক নতুন ভাগবত, নতুন গীতা।

বলেছি, রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ছিল ইতিহাসের অভিপ্রেত। এর তাৎপর্যটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ধর্ম জগতে তখন দেখা দিয়েছে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য। পৃথিবীর নর-নারী তখন অপেক্ষা করছিল একটা উদার সার্বভৌমিক ধর্মাদর্শের জন্য। গীতায় শ্রীভগবানের প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে: যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়, তখনই ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য আমি নিজরূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই। উনিশ শতকের পৃথিবীতে আমরা ঠিক এমনি ধর্মের গ্লানি—যা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল—প্রত্যক্ষ করেছি এবং সেই গ্লানির পরিণতি হিসাবেই সুদূর আমেরিকা মহাদেশের চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিগত শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে এক বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন। সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ

সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে হিন্দু সন্ন্যাসীর কণ্ঠ থেকে উদার সার্ব-ভৌমিক ধর্মাদর্শের বাণী প্রচারিত হয়েছিল তা ছিল প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণেশ্বরের সেই নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণের বাণী। এ কথা আদৌ মিথ্যা নয় যে, ইতিহাসের নিগূঢ় অভিপ্রায় পূর্ণ করবার জন্যই যুগে যুগে অবতারপুরুষদের শুভ আবির্ভাব ঘটে থাকে। যুগ প্রয়োজনেই ভগবান শরীর পরিগ্রহ করে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাই ঘোষণা করে গেলেন: এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। বর্তমান কালের যুগ প্রয়োজন সাধিত করতেই যুগদেবতা রামকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব ঘটেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম গ্লানি দূর করে, শান্তিময় নতুন পথে জীবন পরিচালিত করতে মানুষকে শিক্ষা প্রদান করতেই তো ইতিহাসের বিধানে ভগবানকে আসতে হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। এই আবির্ভাব ধর্ম জগতে সত্যিই এক যুগান্তর এনে দিয়েছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আজ ভারত তথা পৃথিবীর বুকে এক অকল্পিত যুগান্তরের প্রতীক রূপে আমাদের সম্মুখে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখান থেকেই পৃথিবীতে আজ ছড়িয়ে পড়েছে নতুন আলো, নতুন ভাবধারা যা মানুষের চিত্তকে করেছে সমুদ্ভাসিত আর চিন্তাকে করেছে সর্বসংস্কার মুক্ত। 'যত মত তত পথ'—এই আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সেই নিরক্ষর সাধক। আর সেই আদর্শকে বিপুল উৎসাহে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ তাঁরই নিজের হাতে তৈরী সন্ন্যাসী শিষ্যগণ। রামকৃষ্ণ-আন্দোলন ইতিহাসের নিস্পন্দ বুকে একটি বিরাট তরঙ্গ প্রবাহ। সেই তরঙ্গ শীর্ষে যাঁদের আমরা প্রত্যক্ষ করি সেই বীর বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের জীবন কথা এইবার একে একে আলোচনা করছি।

স্বামী বিবেকানন্দ

'নরেন যেন খাপ্-খোলা তলোয়ার।'

'নরেনকে এনেছিলাম সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে। সে সপ্তর্ষির এক ঋষি।'

এই উক্তি স্বয়ং রামকৃষ্ণের। নরেন বলতে তাই বুঝি তিনি অজ্ঞান হতেন। নরেন তাঁর যুবরাজ।

রামকৃষ্ণ-লীলার কেন্দ্রমণি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্বমঠ-বিহারী এই সন্ন্যাসী উদাত্ত কণ্ঠে একদিন তাঁর তন্দ্রাহত স্বজাতিকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন: উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। তাঁর সেই আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। পৃথিবী-ওল্টানো ক্ষমতা নিয়ে এসেছিলেন তিনি; সেই ক্ষমতার আশ্চর্য প্রকাশ ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল তাঁর মাত্র স্বল্পকালস্থায়ী প্রচারজীবনের মধ্যে। ১৮৯৩ থেকে ১৯০২—এই তো ছিল তাঁর কর্মজীবনের পরিধি। এরই মধ্যে একটা ঘুমন্ত জাতিকে তিনি জাগিয়ে, মাতিয়ে দিয়ে গেছেন আর পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করে এসেছেন অদ্বৈত বেদান্তের উদার বাণী। একেই বলে অসাধ্য সাধন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে নিজের মনোমত করে স্বহস্তে গড়েছিলেন তাঁরই অমোঘ শক্তি বলে বলীয়ান্ এই তেজস্বী সন্ন্যাসীর জয়রথচক্র কি স্বদেশে, কি বিদেশে সর্বদা সিদ্ধির পথেই ধাবিত হয়েছে—পরাজয় তাঁকে স্পর্শ করে নি, কর্মে অসিদ্ধি যে কেমন তা তিনি জানতেন না। তাঁর জন্মের সমকাল যেমন নানা ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, তাঁর সমগ্রজীবনটাও তেমনি নানা ঘটনা-বৈচিত্র্যে সৌষ্ঠবসম্পন্ন। কত না বাধা, কত না বিদ্রোহের ভেতর দিয়েই

তাঁকে নিজের হাতে নিজের অগ্রগতির পথ কেটে প্রস্তুত করতে হয়েছে। সেই বর্ণাঢ্য কাহিনী তো আজ উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় বলে গণ্য হয়ে থাকে।

কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলের দত্ত পরিবার খুব বিখ্যাত। এই পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত; মা ভুবনেশ্বরী। ইনিই ভবিষ্যতের ভুবনবিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। কাশীর বীরেশ্বর মহাদেবের কৃপায় ভুবনেশ্বরী এই পুত্র লাভ করেছিলেন। তাই ছেলের নাম রাখা হয় বীরেশ্বর; পরে অন্নপ্রাশনের সময় তাঁর নাম হয় নরেন্দ্রনাথ। তিনি যে একটি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেছিলেন তা নয়, উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের এক বর্ণাঢ্য সময়ে ঘটেছিল ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষের আবির্ভাব। পিতামহ দুর্গাচরণ দত্ত পঁচিশ বছর বয়সে স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। এই ঘটনাটি দত্ত পরিবারের পরবর্তী একটি বংশধরের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারা যায়; পিতামহের সঙ্গে পৌত্রের দেহগত সাদৃশ্য দেখে পরিবারের অনেকেই ভাবতেন যে, দুর্গাচরণই মারা যাওয়ার পর আবার এসেছেন নরেন্দ্ররূপে। শুধু তাই নয়, বালকের মনও ছিল পিতামহের অনুরূপ। তাঁর জীবনেতিহাসে আমরা দেখতে পাই, বাড়িতে সাধু সন্ন্যাসী আসা মাত্র নরেন তাঁদের দিকে ছুটতেন এবং তাঁরা যে যা চাইতেন তা তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে এনে দিতেন—কারো অনুমতির অপেক্ষা করতেন না কিংবা কোন বাধা মানতেন না।

নরেন্দ্রনাথের জন্ম কাল ১৮৬৩। তার আগের সাতটা বছর ছিল বাঙালির জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ। এই সাত বছরের মধ্যে একের পর এক বহু বিচিত্র ঘটনা বাংলা সমাজকে একেবারে আধুনিকতার রাজপথে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং একথা বললে ভুল হবে না যে, আধুনিকতার প্রখর মধ্যাহ্নকালেই সিমুলিয়ার দত্ত

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। ঠিক তার দু'বছর আগে জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। ইতিহাসের বিচারে দেখা যায় যে এঁরা দুজনেই উত্তরকালে ভুবনবিজয়ী হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকেই ইতিহাসের বুকে স্ব স্ব নামের মুদ্রাঙ্কিত করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে কবি ও সন্ন্যাসী দুজনে যেন বিপরীতমুখ করে দাঁড়িয়ে স্ব স্ব 'মিশন' সিদ্ধ করে গেছেন। সন্দেহ নেই, দুটিই ঐতিহাসিক চরিত্র।

যৌবনকাল থেকেই নরেন্দ্রনাথের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচরীভূত হয় এমন কোন আদর্শ আছে কি না, সত্যকে দর্শন করা যায় কি না। অবশেষে সেই ব্যাকুল আত্মার অভিসার একদিন তাঁকে টেনে নিয়ে এলো দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। কলেজে পড়তেই যুবক নরেন্দ্রনাথের মনে ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড় সেই চিত্ত বিক্ষেপ 'হয়েছিল' শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য স্পর্শ লাভের পর। পরম সত্যলাভের জন্য যখন তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছে তীব্র ব্যাকুলতা, সংশয় এবং অবিশ্বাসের মধ্যে যখন তাঁর সমগ্র চিত্ত দোলায়মান, ঠিক সেই সময় শিমুলিয়ার সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে একদিন এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি ঠাকুরের অন্যতম গৃহী ভক্ত। আরো কয়েকজন ভক্তও নিমন্ত্রিত হয়েছেন। ছোটখাটো একটা উৎসবের অনুষ্ঠান হয়েছে ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে। তিনি গান শুনতে ভালোবাসেন। তাঁকে গান শোনাবার জন্য ডেকে আনা হলো দত্তবাড়ির নরেনকে। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক; ব্রাহ্মসমাজে রবিবারের উপাসনায় তিনি নিয়মিত গান গাইতেন। দত্তবাড়িতে গানবাজনার চর্চা ছিল রীতিমত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর প্রধান লীলাসহায়কের সেই ছিল প্রথম মিলন। এ ঘটনা ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসের কোন একটি দিনের। 'নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দেখিবামাত্র ঠাকুর যে তাঁহার প্রতি

বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে এবং পরে রামচন্দ্রকে (রামচন্দ্র দত্ত) নিকটে আহ্বান পূর্বক সুগায়ক যুবকের পরিচয় যতদূর সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং একদিন তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। আবার ভজন সাঙ্গ হইলে স্বয়ং যুবকের নিকট আগমন পূর্বক তাঁহার অঙ্গলক্ষণ সকল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত দুই একটি কথা বলিয়া অবিলম্বে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।'[১]

কিন্তু তখনই তাঁর যাওয়া হয়নি। পরীক্ষার চাপে সে কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। তারপর সত্যলাভের পিপাসা যখন আরো তীব্র হয়েছে এবং অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের কয়েকজন আচার্যের কাছে (এঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন) গিয়ে তাঁদের প্রশ্ন করে সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে যখন নিরাশ হয়েছেন ; যখন বাড়িতে তাঁর বিয়ের কথা চলছে, ঠিক সেই সময়ে বিশ্বনাথ দত্তের আত্মীয়, ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত (রামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত) নরেন্দ্রনাথকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাবার পরামর্শ দিলেন। ঠিক ঐ সময়ে কলেজে হেস্টি সাহেবের মুখে দক্ষিণেশ্বরের সাধুপুরুষের কথা শোনেন। তখন তাঁর স্মৃতিতে নতুন করে উদিত হলেন বহুশ্রুত রামকৃষ্ণ। এবার সত্যিই তিনি একদিন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সাক্ষাৎ করলেন, আলাপ করলেন অন্তরঙ্গ ভাবে। এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ নিজে বলেছেন : 'তিনি আমার সঙ্গে চিরপরিচিতের সঙ্গে সরলভাবে আলাপ করতে লাগলেন। গান শেষ হয়ে গেল, সহসা তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে আমাকে একান্তে নিয়ে গেলেন হাত ধরে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। সহসা তিনি ভাবে বিভোর হয়ে

১ লীলাপ্রসঙ্গ-দিব্যভাব।

আমার হাত ধরে স্নেহগদগদস্বরে বলতে লাগলেন, 'তুই এতদিন কেমন করে আমায় ভুলেছিলি? তুই আসবি বলে আমি কতদিন ধরে পথপানে চেয়ে আছি।' এই কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি আমার হাত দুটো ধরে বললেন, 'আমি জানি, তুমি নররূপী নারায়ণ। জীবের কল্যাণ কামনায় দেহ ধারণ করেছ।' তাঁর এই অদ্ভুত আচরণে আমি যারপরনাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে মনে ভাবলাম—কে এই উন্মাদ মানুষ যাঁকে আমি দর্শন করতে এসেছি।'[১]

স্পষ্টতই নরেন্দ্রনাথের জীবনে একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল সেদিন। এটা ছিল ইতিহাসেরই অভিপ্রেত। সংশয় সন্দেহ দোলায়িত চিত্তে ঘরে ফিরলেন তিনি। জীবনধারা আগের মতোই চলতে থাকে। কিন্তু তারই মধ্যে কি যেন একটা আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন দক্ষিণেশ্বরের সেই অবোধ্য ও অর্ধোন্মাদ মানুষটির জন্য। ওদিকের অবস্থাও ছিল একই প্রকার। নরেন্দ্রনাথ চলে আসার পর আবার তাকে দেখার জন্য রামকৃষ্ণ যারপরনাই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কথিত আছে, 'ওরে, তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছিনা,' এই বলে তিনি কাঁদতেন। তারপর দ্বিতীয়বার নরেন্দ্র যখন এলেন দক্ষিণেশ্বরে তখন আরো একটি রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের লেখক এইভাবে বর্ণনা করেছেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় দক্ষিণচরণে নরেন্দ্রের অঙ্গস্পর্শ করিলেন, অমনি মুহূর্ত মধ্যে নরেন্দ্র দেখিলেন, সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে—নিখিল বিশ্বের সহিত নরেন্দ্রের আমিত্ব যেন কোন্ এক মহাশূন্যের দিকে ধাবিত হইতেছে।'

পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত। ক্রমাগত তিন বছর কাল নানা ভাবে পরীক্ষা করে দক্ষিণেশ্বরের এই দেবমানবকে তাঁর জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। দীর্ঘ পাঁচ বছর কাল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের

১. পত্রাবলী (১ম খণ্ড) স্বামী বিবেকানন্দ।

সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য পেয়েছিলে যেমনটি পেয়েছিলেন রাখাল, তারক, শরৎ, শশী ও কালীপ্রসাদ প্রমুখ তাঁর অন্যান্য লীলা-সহচরগণ। এই সময়ের মধ্যে ছেলেদের যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা সবই সম্পূর্ণ হয়েছিল। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের সুমধুর দিনগুলি ফুরিয়ে গেল। গলরোগে আক্রান্ত হয়ে ঠাকুর প্রথমে শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে এলেন। শ্যামপুকুরে নরেন্দ্র ঠাকুরের শুশ্রূষার জন্য বাড়ি থেকে যাওয়া আসা করতেন। তারপর কাশীপুরের বাগান বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের আসার পর, তিনি, অন্যান্য গুরু ভাইদের সঙ্গে, এইখানেই থেকে যান। তখন ঠাকুরের পরিচর্যার জন্য এখানে সর্বক্ষণ থাকতেন রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপাল, কালী, শশী ও শরৎ। এঁদের সকলকে পরিচালনা করতেন নরেন্দ্র। এই সময়ের মধ্যেই একবার তিনি তারক ও কালীকে সঙ্গে নিয়ে তিন দিনের জন্য বুদ্ধগয়া ঘুরে এসেছিলেন। কাশীপুরে সাধনায় নিরন্তর মগ্ন থাকতেন নরেন্দ্র। 'কথামৃত' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে :

'নরেন্দ্র—কাশীপুরে তিনি শক্তিসঞ্চার করে দিলেন।

মাস্টার—যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জ্বেলে বসতে, না ?

নরেন্দ্র—হ্যাঁ। কালীকে বললাম, আমার হাত ধর দেখি। কালী বললে, কী একটা শক্ তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল। একথা আমাদের মধ্যে কারুকে বলবেন না।

মাস্টার—তোমার ওপর শক্তি সঞ্চার করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে। একদিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, নরেন শিক্ষে দিবে।

নরেন্দ্র—আমি কিন্তু বলেছিলাম, আমি ওসব পারব না। তিনি বললেন, তোর হাড় করবে।'[১]

---

১. 'কথামৃত'-৩য় ভাগ (পরিশিষ্ট)।

শিবরাত্রির গভীর নিশীথে ধ্যানের সময় এই ঘটনাটি ঘটেছিল। রাত্রি নিস্তব্ধ, সম্মুখে ধুনি জ্বলছে—তার সামনে পাশাপাশি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ, এ দৃশ্য কল্পনা করতে আমাদের মনে আজো শিহরণ জাগে। কাশীপুরের বাগানবাড়ি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে গুরুসেবা, ঈশ্বর আরাধনা, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা ও সংঘসৃষ্টির বিবিধ প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসাবে চিরস্মরণীয়। এইখানেই ঠাকুর একদিন তাঁর এগারটি সন্তানকে (নরেন, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শশী, শরৎ, কালী, যোগীন, লাটু, তারক ও গোপাল) নিজের হাতে একখণ্ড করে গৈরিক বস্ত্র ও একটি করে রুদ্রাক্ষের মালা মন্ত্রপূত করে প্রদান করেন ও তাদের ভাবী সন্ন্যাসজীবনের সূচনা করে যান।

১৮৮৬, ১৬ আগস্ট (বাংলা ১২৯৩,৩১ শ্রাবণ) ঝুলন পূর্ণিমার গভীর রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি হয়। চিরবিদায়ের মাত্র দু'দিন আগে নরেন্দ্রকে ডেকে তিনি বলেছিলেন, 'নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি।' আরো একটি গুহ্য কথা তাঁকে বলেছিলেন ; 'সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম সে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' রামকৃষ্ণ অপ্রকট হলেন। গুরুভাইদের সকল দায়িত্ব এখন নরেন্দ্রনাথের উপর। 'আমার ওপর প্রভুর নির্দেশ এই যে তাঁর দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগী মণ্ডলীর দাসত্ব আমি করব'—তাঁর এই উক্তিটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। বাগানবাড়ি ছেড়ে দিতে হলো মাথা গুঁজবার স্থান নেই ছেলেদের। তাঁরা কেউ সংসারে ফিরে যাবেন না। রামকৃষ্ণের নাম নিয়ে ও তাঁর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করে ত্যাগ পরিশুদ্ধ জীবন তাঁরা যাপন করবেন। তখন রামকৃষ্ণের এক ভক্ত বরাহনগরে দশ টাকা ভাড়ায় একটি জীর্ণ ও পরিত্যক্ত বাড়ি ঠিক করে দিলেন। অনশনে, অর্ধাশনে সেইখানেই লোকচক্ষুর অন্তরালে শুরু হয়েছিল রামকৃষ্ণ-সন্তানদের

মনুষ্যত্ব লাভের সাধন। সে ইতিহাস আজো সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি।

১৮৮৬। বড়দিন। নরেন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর ও সারদা প্রসন্ন—এই নয়জন আঁটপুরে বাবুরামের বাড়িতে আসেন। সেখানে গাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়ে সদালোচনা চলতো। এক রাতে নরেন্দ্র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঈশার ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও প্রেমের কথা বলতে বলতে, গুরুভাইদের মনে সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা এমন দৃঢ়াঙ্কিত করে দিলেন যে, প্রত্যেকে সেই আলোকিত মুহূর্তে সংকল্প করলেন, তাঁদের ভাবী জীবন ঐ আদর্শকে সামনে রেখেই পরিচালিত হবে। এই স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ঈশার পুণ্য আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যায়।

আঁটপুর থেকে ফিরে আসার কিছুকাল পরে নরেন্দ্র প্রমুখ রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ বিধিমত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন রামকৃষ্ণের ষোলটি চিহ্নিত সন্তান নতুন নাম গ্রহণ করেন ; যথা : নরেন্দ্রনাথ—বিবেকানন্দ ; রাখাল—ব্রহ্মানন্দ ; শরৎ—সারদানন্দ ; তারক—শিবানন্দ ; কালীপ্রসাদ—অভেদানন্দ ; যোগীন্দ্র—যোগানন্দ ; বাবুরাম—প্রেমানন্দ ; রাখ্‌তুরাম—অদ্ভুতানন্দ ; হরিপ্রসন্ন—বিজ্ঞানানন্দ ; হরিনাথ—তূরীয়ানন্দ ; শশী—রামকৃষ্ণানন্দ ; গোপালচন্দ্র—অদ্বৈতানন্দ ; গঙ্গাধর—অখণ্ডানন্দ ; সুবোধচন্দ্র—সুবোধানন্দ ; সারদাপ্রসন্ন—ত্রিগুনাতীতানন্দ ; নিত্যনিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ। এখানে উল্লেখ্য যে, নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল তিনি 'রামকৃষ্ণানন্দ' এই নামটি গ্রহণ করবেন। কিন্তু শশীর শরীর-প্রাণ-মন-ঢালা গুরুসেবা দেখে তাঁকেই তিনি ঐ নামটি গ্রহণ করতে বলেন। শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিতে হলে, মুণ্ডিত মস্তকে বিরজা হোম করে, শিখা সূত্র নাম গোত্র বিসর্জন দিতে হয়। বিরজাহোমের মন্ত্র ছিল কালী-প্রসাদের কাছে। এটি তিনি একজন দশনামী সন্ন্যাসীর কাছ

থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। ঠাকুরের পবিত্র পাদুকার সামনে এই ঐতিহাসিক সন্ন্যাসগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ লোকান্তরিত হওয়ার পরবর্তী ছয় বছর আমরা বিবেকানন্দকে দেখি পরিব্রাজকরূপে। পরিব্রাজক জীবনে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বজাতির প্রকৃত অবস্থা ও সমাজের যথার্থ চিত্র। তিনি নির্জনতাবিলাসী সন্ন্যাসী ছিলেন না। ১৮৯১ সাল থেকেই তাঁর পরিব্রাজক জীবন, কর্মব্যাকুলতা এবং জ্ঞান ও কর্মের ঐক্য সন্ধান তীব্র হয়ে ওঠে। এই ছয় বছর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সঙ্ঘ গঠনের কথা চিন্তা করেছেন। বরাহনগরের সেই জীর্ণ বাড়িতে সঙ্ঘের যে সূচনা হয়েছিল সেটি যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয়ে যায়, এই ছিল তাঁর অহোরাত্রির চিন্তার প্রধান বিষয়। কারণ, তিনি জানতেন তিনি যতখানি রামকৃষ্ণের চিহ্নিত সন্তান ও প্রধান লীলা-সহচর, ঠিক ততখানি তিনি ইতিহাসের চিহ্নিত মানুষ। বাংলা তথা ভারতে উনিশ শতকের শেষ ভাগে সন্ন্যাসের আদর্শে বর্তমান ভারত ও সমগ্র মনুষ্য পরিবারের জন্য ধর্মের সঙ্গে সামাজিক জীবনের যোগসূত্র আবিষ্কার ও নির্ধারণ করা—পরিব্রাজক বিবেকানন্দের সকল চিন্তা ভাবনার এটাই হয়ে উঠেছিল কেন্দ্রবিন্দু। এইজন্যই তো তিনি ভারতের বিশাল জনজীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে এর বহু জনপদ, নগর অক্লান্তভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভারত পরিক্রমার সম্পূর্ণ ইতিহাস জানবার উপায় নেই। এই সময়কার চিঠিপত্রে এর কিছু উল্লেখ আছে। আমাদের মনে হয়, বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনের বড়ো অভিজ্ঞতা এই ছিল যে, তিনি ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের ভয়াবহ বৈষম্য চাক্ষুষ করতে পেরেছিলেন।

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন বিবেকানন্দ। এইভাবে পরিভ্রমণ করে সমকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে

সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তিনি। শুধু কি তাই? ধ্যান, জপ, বেদান্ত চর্চা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, জিজ্ঞাসুকে ধর্মোপদেশ দেওয়া—এইসব বিধিই কাজের ভেতর দিয়েও সার্থক হয়েছিল তাঁর এই পরিব্রাজক জীবনে। এই অক্লান্ত ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির পরিচয় পেয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা সামান্য ছিল না। কিন্তু সকলের ওপর জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ফলস্বরূপ দুঃখই তাঁর বিশাল হৃদয়কে ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে ১৮৯৩ সালে তিনি উপনীত হয়েছিলেন কন্যাকুমারিকা। সেখানে ভারত মহাসাগরের দিকে মুখ করে, কন্যাকুমারিকার সর্বশেষ শিলাখণ্ডের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট যে বিবেকানন্দ, তাঁর মধ্যে আমরা এখন দেখতে পাই এক অভিনব মানসিক বিকাশ। তার পেছনে ছিল ইতিহাসের সক্রিয় প্রেরণা। সেদিন শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট সেই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়েছিল বর্তমান ভারত—বাসনায় ও বেদনায় উজ্জ্বল ও বিষণ্ণ বর্তমান ভারত। তাঁর সত্তা উন্মথিত করে সেদিন জেগেছিল এই একটিমাত্র অনুভূতি: 'এই আমার ভারতবর্ষ। আমার প্রিয় জন্মভূমি!' শতাব্দীর অস্তিমলগ্নে এক নবীন সন্ন্যাসীর কণ্ঠকে আশ্রয় করে সেদিন ঝঙ্কৃত হয়েছিল যে দেশাত্মবোধ, ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের ইতিহাসে তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

এইবার আমরা বিবেকানন্দ-জীবনের তৃতীয় পর্বে উপনীত হব। ১৮৯৩ সালের ৩১মে তিনি বিশাল সমুদ্রপাড়ি দেওয়ার জন্য জাহাজে উঠলেন। গন্তব্য স্থল—আমেরিকা। আগামী সেপ্টেম্বরে সেখানে চিকাগো মহানগরীতে এক বিশ্বধর্ম মহাসভা বসবে। তিনি তাতে যোগদান করবার ইচ্ছা নিয়েই সমুদ্রপাড়ি দিয়েছিলেন একরকম কপর্দকহীন অবস্থায়, বললেই হয়। তখন কে জানত যে, এই

অজ্ঞাতপরিচয় সন্ন্যাসীই ভারতে, তথা পৃথিবীতে, এক নতুন ভাব-ধারার প্রবর্তন করবেন, কে ভেবেছিল যে, চিকাগোর ধর্মমহাসভাকে অবলম্বন করে বিশ্বের ইতিহাসে বিরচিত হবে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ বছর। বহু প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে তাঁকে মহাসভার মঞ্চে স্থান করে নিতে হয়েছিল। জাগ্রত পৌরুষের মূর্তিমান বিগ্রহ একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল।

পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত। চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মহিমান্বিত জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারই (কেশবচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ অনুবর্তীদের মধ্যে ইনিই ছিলেন প্রধান) অপরিচিত বিবেকানন্দকে মহাসভা প্রতিনিধিত্বলাভে সহায়তা করেছিলেন। ইনি ঐ মহাসম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণকে প্রচার করলেন আর কেশব-শিষ্য প্রতাপচন্দ্র বিশ্বধর্মমহাসভায় প্রতি-নিধিত্বলাভে বিবেকানন্দকে সহায়তা করলেন—এই ঘটনা দুটি মনে রাখার মতো। স্বামীজী হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবেই সেখানে পরিগৃহীত হন। ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। চিকাগোর প্রসিদ্ধ আর্ট প্যালেসে সমাগত চার হাজার দর্শকের সামনে বিশ্বধর্ম সম্মেলনের উদ্বোধন হয়েছিল। প্রথম দিনের বৈকালিক অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দের স্বাগত বক্তৃতাটি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল।[১]

ধর্মের সার্বভৌম উদার অঙ্কে সর্বধর্ম সমন্বয়ই বর্তমান যুগের মানুষকে শান্তি ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের সন্ধান দিতে পারে। একই সত্যের দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিচিত্র প্রকাশ এক-একটি ধর্মমত ও বিশিষ্ট সাধনা। প্রত্যেক ধর্মের আদর্শনিচয় পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপূরক—চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম দিনে

১. Proceedings of the Parliament of Religion, 1893.

বিবেকানন্দের বক্তৃতার এই ছিল মর্মকথা। পাশ্চাত্য জগৎকে ভারতবর্ষ উপহার দিল বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ, বিশ্বমৈত্রীর মহৎ বাণী। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে যুগান্তরকারী। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তিনি যখন দর্শকবৃন্দকে 'ভাই ও ভগ্নী' এই বলে সম্বোধন করেন তখন সভাগৃহটি কয়েক মিনিট ধরেই শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্মমহাসভায় তাঁর সাফল্যলাভের মূলে যে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা ছিল একথা স্বামীজি তাঁর গুরুভাইদের কাছে লেখা একাধিক চিঠিতে মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন। 'বাণী তুমি বীণাপাণি কণ্ঠে মোর'—একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন। রামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী 'নরেন একদিন জগৎ মাতাবে' এতদিনে সত্যে পরিণত হলো।

আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন শুধু এইজন্য নয়। 'আমি এদেশে এসেছি,দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, আমার দেশের দরিদ্রদের জন্য উপায় দেখতে। সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে, যদি ভগবান সহায় হন।...যে উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ নর-নারী দিন দিন দুঃখের তমোময় গর্ভে ধীরে ধীরে ডুবছে, যাদের সাহায্য করবার কিংবা যাদের বিষয়ে চিন্তা করারও কেউ নেই তাদের জন্যই আমার সমস্ত সহানুভূতি ও ভালবাসা—ইহাই আমি ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেছি।'[১] এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, তখন থেকেই সন্ন্যাসীর চিন্তায় ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছিল দরিদ্র-নারায়ণ সেবার সুমহৎ আদর্শ। আমেরিকায় প্রথমবার তিনি ১৮৯৫ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। এই দু'বছরের মধ্যে বেদান্ত প্রচারের ভিত্তিটা ভালভাবেই স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে স্বামীজির এই কাজকে সম্পূর্ণতা দান করেন স্বামী অভেদানন্দ। বেদান্ত প্রচার ভিন্ন ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মহিমাকে সেখানে তুলে ধরেছিলেন বিবেকানন্দ।

১. পত্রাবলী (১ম খণ্ড)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের অসামান্য সাফল্যলাভের পর তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার আরম্ভ হয়েছিল স্বদেশে ও বিদেশে। এর প্রতিকার করতে স্বদেশে অবস্থিত তাঁর গুরুভাইরা সেদিন সচেষ্ট হয়েছিলেন; এই ব্যাপারে স্বামী অভেদানন্দই অগ্রণী হয়েছিলেন এবং প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার টাউন হলে এক মহতী সভা হয়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম না করলে এই সভা হতো না। দিনরাত একাগ্রচিত্তে কাজ করে তিনি টাউন হলের সভা করেছিলেন। আমেরিকায় বসে এই সংবাদ পেয়ে স্বামীজি এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'এই দুঃসাধ্য কাজ একমাত্র কালীর পক্ষেই সম্ভব।'

আমেরিকা থেকে বিবেকানন্দ য়ুরোপ এলেন ১৮৯৫ সালের শেষ ভাগে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের য়ুরোপ ভ্রমণ ও লণ্ডনে অবস্থান মাত্র অল্পকাল স্থায়ী ছিল। এই বছরের নভেম্বরের শেষভাগেই তিনি লণ্ডন ত্যাগ করেন। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে চার মাসকাল অতিবাহিত করে, ১৮৯৬ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা করেন। এইবার ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। এই বছরের ১৬ ডিসেম্বর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে মোট তিন বছর তিন মাস অবস্থান করে, অবিরাম পরিশ্রম করে তিনি ঐ দুইটি মহাদেশে তাঁর কাজের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন। আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেই তাঁর কাজের সাফল্য বেশি, একথা বিবেকানন্দ নিজেই বলেছেন এক চিঠিতে। 'I have a message to the world which I shall deliver without fear and without care for the future.' তাঁর এই উক্তিটি বিশেষ-ভাবেই স্মর্তব্য। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। ১৮৯৭ সালের প্রথম ভাগেই বিবেকানন্দ তাঁর গুটিকতক
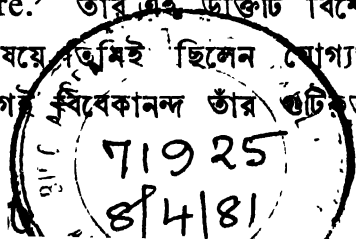
ইংরেজ শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে এসে পৌছলেন। তাঁর কর্মবহুল জীবনের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষায় সমস্ত ভারত সেদিন অধীর আগ্রহে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল।

এইবার আমরা বিবেকানন্দ-জীবনের চতুর্থ বা শেষ পর্বে (১৮৯৭-১৯০২) উপনীত হব। এই পর্বেও তাঁর কাজের যেন অন্ত ছিল না। প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল মঠ ও মিশন স্থাপন করা। এর ভেতর দিয়েই ঠাকুরকে রূপায়িত করতে হবে। বলরাম বাবুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় মঠস্থাপনের চূড়ান্ত আলোচনা হয় ও সিদ্ধান্ত। গৃহীত হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ গুরুভাইরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৯১ সালে বরাহনগর থেকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আলমবাজারে উঠে এসেছিল। পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর স্বামীজি প্রথমে আলমবাজার মঠেই উঠেছিলেন এবং এখানেই তিনি তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। একটি দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তিনি এইবার অস্থির হলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা তখন ভাল ছিল না, তথাপি উৎসাহের সঙ্গে এই কাজে অগ্রসর হলেন। জমি কেনা, প্রতিষ্ঠান গঠন ও কর্মীদের শিক্ষায় মন দিলেন। পরিকল্পনা বিরাট, উদ্যম-উৎসাহ ছিল তেমনি বিপুল। তিনি বুঝেছিলেন যে, ইহলোকে তাঁর দিন নিতান্তই সুপরিমিত। এই অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল কাজের সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করতে গিয়ে নিজের শক্তিকে নিঃশেষে ব্যয় করতে লাগলেন তিনি।

রচনা করলেন ভাবী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মানস মূর্তি। ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষে দার্জিলিঙ থেকে মঠে ফিরে কল্পনাকে রূপদান করতে বিধিমত গড়লেন রামকৃষ্ণ মিশন। বলরাম বসুর ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় গুরুভাইদের ইচ্ছানুসারে বিবেকানন্দ স্বয়ং হলেন মিশনের সাধারণ সভাপতি আর স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী

ব্রহ্মানন্দ হলেন যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে যে প্রস্তাব উক্ত সভায় গৃহীত হয় এবং পরে যা মুদ্রিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, তার থেকে জানা যায় যে 'মানুষের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন ও কাজে তাঁর জীবনে প্রতি-পাদিত হয়েছে, তার প্রচার এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাতে সেই সব তত্ত্ব প্রযুক্ত হতে পারে, সেই বিষয়ে সাহায্য করা এই মিশনের উদ্দেশ্য।' শুধু ফুল-চন্দন দিয়ে গুরুর পূজা-অর্চনা করা নয়, সমাজসেবা ও জনসেবাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়ে একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সমাজজীবনে তুলেছিলেন একটা নতুন তরঙ্গ।

১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গঙ্গার তীরে স্থাপিত হলো বেলুড় মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, নরেন আমাকে মাথায় করে যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই থাকব। মঠ নির্মাণের কাজ শেষ হলে ৯ ডিসেম্বর ঠাকুরের একটি আলোকচিত্র নিজের মাথায় করে এনে যথারীতি পূজার পর স্বামীজী ইস্টদেবকে এখানে স্থাপন করেন। এইভাবে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল সন্ন্যাসীর একটি কল্পনা। স্বামী বিবেকানন্দের এ এক অক্ষয় কীর্তি। বেলুড় মঠ তথা রামকৃষ্ণমিশন সম্পর্কে আর একটু বলার আছে। মঠ স্থাপিত হওয়ার পর ইংরেজি নববর্ষের আগস্ট মাসে স্বামীজি একটি দলিল (Trust Deed) সম্পাদন করলেন। মঠ ও মিশনকে আইনত সিদ্ধ করার জন্য এই অর্পণনামার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৯০১, ৩০ জানুআরি দলিলটি সম্পাদিত হয় আর ফেব্রুয়ারি ছয় তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত হয়। এই-ভাবে মঠ ও মিশন একটি দেবোত্তর সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এই দলিল দ্বারা স্বামীজি বেলুড় মঠের যাবতীয় সম্পত্তি একটি বোর্ড অব ট্রাস্টির হাতে অর্পণ করেন। যাঁদের নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ

অখণ্ডানন্দ, ত্রিগুণাতীত, রামকৃষ্ণানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, সুবোধানন্দ, অভেদানন্দ এবং তুরীয়ানন্দ। তিনি নিজে বোর্ডের বাইরে রইলেন, এমন কি তাঁর কোনো শিষ্যকেও এর মধ্যে রাখেন নি। ট্রাস্টিদের মধ্যে থেকেই একজন সভাপতি নির্বাচিত হবেন, এমন কথা দলিলে বলা ছিল। এই দলিল বা অর্পণনামা সম্পাদিত হওয়ার পর স্বামীজি মিশনের সাধারণ সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। তখন (১৯০১, ১২ ফেব্রুআরী) স্বামী ব্রহ্মানন্দ সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। সহোদর-তুল্য ও অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত দেখে স্বামীজি সেদিন বলেছিলেন: এতদিন যার জিনিস বয়ে বেড়িয়েছি, আজ তাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।'[১]

এর সংগঠন কাজের সকল দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেন ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের ওপর। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রধানত স্বামীজির ভক্ত মিসেস ওলি বুল ও মিস হেনরিয়েটা মূলারের প্রদত্ত প্রচুর অর্থেই মঠের জমি কেনা হয় ও ভবন নির্মিত হয়। আলমবাজার থেকে বেলুড়ে মঠ স্থানান্তরিত হবার পর এর কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে ও সুশৃঙ্খলভাবেই চলতে থাকে। এই বছরেই উত্তরপ্রদেশে হিমালয়ের সন্নিকটবর্তী মনোরম ও নির্জন পরিবেশের মধ্যে আলমোড়ায় মায়াবতী নামক একটি স্থানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন অদ্বৈত আশ্রম আর সেই সঙ্গে ইংরেজী পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত'। এর অল্পকাল পরেই (১৮৯৯) মিশনের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়। অতঃপর যে স্বল্পকাল স্বামীজি ইহলোকে বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বহু সারগর্ভ রচনা এই পত্রিকা দু'খানিতে প্রকাশিত হয়।

'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'To The Awakened India' শীর্ষক সম্পাদকীয়টি কবিতায় রচিত। বিবেকানন্দের বহু

১, HISTORY OF THE RAMAKRIEHNA MATH AND MISSION ៖ Swami Gambhirananda.

ইংরেজী রচনার মধ্যে এটি অন্যতম। এর ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রচণ্ড কর্মৈষণা। আর হৃদয়ে অনুভূত অগ্নিময়ী সত্য। ভারতের পুনরভ্যুত্থান সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। অলীক স্বপ্নের অবসান হোক—এই ছিল সম্পাদকীয়টির প্রধান বক্তব্য। উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের ওপর। 'উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনার একস্থলে স্বামীজি লিখেছিলেন; 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।...ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্বগুণের। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধন'-এর জীবনোদ্দেশ্য।' সন্ন্যাসীর এই সমন্বয়ী চিন্তা দিয়েই তো সেদিন ভারতে একটি নতুন শতাব্দীর উদ্বোধন হয়েছিল। মঠের প্রতিষ্ঠা ও সংঘের গঠনমূলক কার্যপ্রণালীর শৃঙ্খলাবিধান ভিন্ন এই সময়ে তিনি আরো একটি কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পাশ্চাত্য দেশ থেকে যেসব শিষ্য ও শিষ্যা এসেছিলেন, তাঁদের শিক্ষাদান কাজটা খুবই কঠিন ছিল। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আইরিশ-দুহিতা কুমারী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল—বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা।[১] স্বামীজি খুব যত্নের সঙ্গে এঁদের প্রত্যেককে ভারতীয় আচার-ব্যবহার, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। এই নিবেদিতার ওপরেই তিনি তাঁর পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়ের দায়ীত্ব প্রদান করেন। ১৮৯৮ সালে কালীপূজার দিন এর উদ্বোধন হয়েছিল।

মিশনের উদ্যোগে জনসেবার কাজের সূচনাও বিবেকানন্দের জীবিতকালের ঘটনা। দিনাজপুর থেকে দুর্ভিক্ষের সংবাদ এলো কলকাতায়, স্বামীজি অমনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকে পাঠালেন সেখানে

১. দক্ষিণেশ্বরে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন, শাদা শাদা মুখ অনেক লোক এখানে আসবে।' তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী নিরর্থক ছিল না।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীদের সেবা করার জন্য। ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় প্লেগ দেখা দিল মহামারীরূপে। অমনি তিনি মিশনের সন্ন্যাসীদের প্লেগ-আক্রান্ত রোগীদের সেবায় নিযুক্ত করলেন। তাঁর গৈরিকবাসের অন্তরালে সেদিন বাঙালি একজন যথার্থ মানবপ্রেমিককে আবিষ্কার করে বিস্মিত হয়েছিল। আরো একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। এতসব কাজের মধ্যে বিবেকানন্দ একটি দিনের জন্যও সঙ্ঘজননী সারদাদেবীব কথা বিস্মৃত হন নি। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর থেকে শ্রীমার সেবার ভার তিনি অর্পণ করেছিলেন বিশেষ ভাবে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দের ওপর। শুধু তাই নয়। কলকাতায় মায়ের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের কথা তিনি সর্বদাই গুরুভাইদের বলতেন।

১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি সন্ন্যাসী আবার পৃথিবী-ভ্রমণে বেরুলেন। তাঁর এইবারকার ভ্রমণের সময়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মনে রাখতে হবে যে, তাঁর দেহ তখন ভগ্নপ্রায়, তথাপি তাঁর কার্যক্ষমতা ছিল তখনো যথেষ্ট—বিশেষত তাঁর অমিত মনোবলের সম্মুখে সব বাধা-বিঘ্ন পরাজিত হতো। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে আরম্ভ হলো বিংশ শতাব্দী। শেষবারের মতো অর্ধ পৃথিবী পরিক্রমা, য়ুরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার, বুদ্ধগয়ায় শেষ তীর্থদর্শন, পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ এবং বাংলায় স্বদেশীযুগের উষার আহ্বান করে, কর্মক্লান্ত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তারিখে গভীর রাত্রে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন। মহাসমাধি লাভের মাত্র দু'ঘণ্টা আগে স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর অস্ফুট বাণী শুনলেন: 'যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কি করে গেল।' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর গুরুভাইদের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, চিরসমাধিতে নিমগ্ন বিবেকানন্দের মুখখানি তখন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল ও পদ্মপলাশ

সেই চোখ দুটি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অমিত তেজ। নতুন শতাব্দীকে তিনি স্পর্শ করে গিয়েছিলেন সেই জ্যোতি আর তেজ দিয়ে। ১৯০১, অক্টোবর মাসে বেলুড়মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজা স্বামীজির জীবনের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ছিল।

তাঁর মহাপ্রয়াণের পূর্বে স্বামীজি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন সেই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা দরকার। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে একজন শিল্পরসিক ও শিল্পবোদ্ধা মানুষ ছিলেন তা অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত বললেই হয়। ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকার। তাঁর পরিব্রাজক জীবনে ভারতের সকল প্রধান তীর্থস্থান তিনি পরিদর্শন করেছিলেন ও প্রত্যেকটি তীর্থের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতিও গভীরভাবে তিনি ঐ সময়ে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর শিল্পবোধ সত্যিই অসামান্য ছিল। এমন কি গ্রীক, রোমান প্রভৃতি শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর প্রখর জ্ঞান ছিল। বেলুড়ে যখন মঠ স্থাপিত হয় তখন থেকেই তাঁর মনে একটি সুন্দর পরিকল্পনার উদয় হয়। ভারতীয় ও অন্যান্য স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে বেলুড়ে তাঁর ইষ্টদেবের জন্য একটি মন্দির তৈরি হয়—এই ছিল তাঁর মনোগত বাসনা। মহাপ্রয়াণের কিছুপূর্বে তিনি এলাহাবাদ থেকে তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে বেলুড়ে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, ‘দেখো প্রসন্ন, শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের একটা নক্সা করতে হবে। তিনি যেমন ছিলেন সকল ধর্মের মূর্তবিগ্রহ, তাঁর মন্দিরেও ঐরকম পৃথিবীর সকল শিল্পকলার সমবায় থাকবে। তুমি ঐরকম একটা নক্সা করো তো।’ এই বলে তিনি ঐসব দেশের বিভিন্ন শিল্পকলা সম্বন্ধে প্রিয় গুরুভ্রাতাকে অনেক কথা বলেন। আরো একটি কথা বলেছিলেন স্বামীজি, ‘যখন ঠাকুরের মন্দিরটি তৈরি হবে, তখন আমি হয়ত আর এ শরীরে থাকব না, কিন্তু ওপর থেকে তা আমি দেখব।’ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

উপলক্ষ্যে যখন বেলুড়ে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত এই মন্দিরের উদ্বোধন হয়, তখন তাঁর ষোলজন সন্তানের মধ্যে মাত্র দুজন ইহলোকে ছিলেন—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ।

নিবেদিতা যথার্থই লিখেছেন; 'বিবেকানন্দ এসেছিলেন মানুষ গড়বার জন্য এবং সেই কাজে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি অমানুষিক পরিশ্রমই না তিনি করেছিলেন এবং সেই দুরূহ কাজের জন্য তাঁকে পর্যায়ক্রমে আচার্য, পিতা ও লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তিনি একাধারে ছিলেন ভারতের শ্রেয়ধর্মী অধ্যাত্মধারণার মূর্তবিগ্রহ ও একজন বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক। ভারতের জাতীয় জীবনের পরিণতি যেন তাঁরই মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করেছিল এবং তিনি এক নতুন জীবনবোধের সূচনা করে উনিশ শতকের জাগরণকে সফলতার পথে অনেকখানি অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যেই যেন আমরা ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ বেদ পেয়েছিলাম।' বিবেকানন্দ আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর রচিত 'সন্ন্যাসীর গীতি', 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'কর্মযোগ', 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য' প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থনিচয়, এবং তাঁর পত্রাবলী ও উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতাবলীর মধ্যে তিনি আজো বিদ্যমান। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই যে, আধুনিক কালেই তিনিই ভারতের ধর্ম ও দর্শনকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে ভারতের ওপর তাঁদের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করেন। এ বড়ো কম গৌরবের কথা নয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ
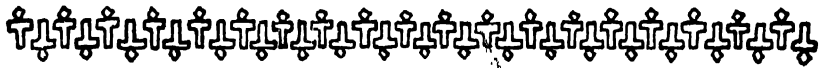
ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীকে যাঁর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ডাব-চিনি মানত করেছিলেন এবং যাঁকে একদিন সঙ্গে করে ডাব-চিনি নিয়ে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে তিনি গিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত। পূর্বাশ্রমের নাম: রাখালচন্দ্র ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলতেন 'ব্রজের রাখাল'। তাঁর ত্যাগী শুদ্ধসত্ত্ব সন্তানদের মধ্যে ইনি ছিলেন অন্যতম। ঠাকুরের মানসপুত্র। রামকৃষ্ণ বলতেন, জগন্মাতা রাখালের আসার কথা আগে থেকেই তাঁকে জানিয়ে রেখেছিলেন। 'রাখাল যেদিন এখানে এলো, বুঝলাম—এই সেই বালক যাকে মা আমার কোলে একদিন বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—এইটি তোমার ছেলে।'[1] অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ঠাকুরের দিক থেকে রাখালের স্থান অতি উচ্চে। রামকৃষ্ণ-লীলায় তাঁর এই মানসপুত্রটির একটি স্বতন্ত্র স্থান ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দের একটি উক্তি স্মর্তব্য। তিনি বলতেন, 'আমাদের মধ্যে একমাত্র রাখালই ছিলেন বালকভাবাপন্ন। তাই তাঁকে নিয়ে মাতৃভাবে ভাবিত ঠাকুর বাৎসল্যরস সম্ভোগ করতেন।' আবার রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বিকাশ ও পরিণতি সাধনেও তাঁর একটি বড় ভূমিকা ছিল।

১৮৬৩, ২১ জানুআরি বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরা-কুলীন গ্রামে এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন রাখালচন্দ্র ঘোষ। বিবেকানন্দের ও ব্রহ্মানন্দ জন্মের মধ্যে ব্যবধান মাত্র বারো

১ কথামৃত (২য় ভাগ)

দিনের। সেই জন্যই কি নরেন্দ্রনাথ ও রাখালচন্দ্র দুজনে দুজনকে সহোদর তুল্য মনে করতেন? বাবা আনন্দমোহন ঘোষ ছিলেন জমিদার; পাঁচ বছর বয়সে রাখালের মা কৈলাসকামিনীর মৃত্যু হয়। অতঃপর আনন্দমোহন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বিমাতা হেমাঙ্গিনীর নিবিড় স্নেহে মাতৃহীন শিশু লালিত পালিত হয়েছিলেন। কমনীয় রূপ আর মাধুর্যমণ্ডিত স্বভাব নিয়ে জন্মেছিলেন রাখালচন্দ্র। যে তাঁকে একটিবার দেখত সেই-ই বালকের প্রতি আকৃষ্ট হতো। বালকের হৃদয়টি ছিল কোমলতায় পরিপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার ব্যাখ্যাতা স্বামী সারদানন্দ বলতেন, মহারাজের বিষয় বলা বা লেখা কঠিন। ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানদের মতো মহারাজের জীবন ধরাবাঁধা নিয়ম সীমায় আবদ্ধ ছিল না। বিশাল রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তিনি 'রাজা-মহারাজ' বা শুধু 'মহারাজ' নামে অভিহিত হতেন। ব্রহ্মানন্দ-চরিত্র, অনুধ্যান করলেই মনে হয় যেন একটি সুনির্মল ভাগবত জীবনগঙ্গাপ্রবাহ সচ্চিদানন্দ-গোমুখী থেকে নির্গত হয়ে, গৃহী-সন্ন্যাসী-সাধক-সিদ্ধ—নানা খাতে বইতে বইতে, প্রতিনিয়ত বৈচিত্র্যময় তরঙ্গরাজি বিস্তার করে, কূলে কূলে তাপদগ্ধ নর-নারীর প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে, খেলতে খেলতেই অবশেষে একদিন সচ্চিদানন্দ সাগরে বিলীন হয়েছিল।

গ্রামের পাঠশালায় রাখালের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পর ইংরেজী শিক্ষার জন্য আনন্দমোহন ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। রাখালের বয়স তখন বারো বছর। থাকার ব্যবস্থা হলো কাঁসারীপাড়া বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরবাড়িতে। কাছেই ট্রেনিং একাডেমি। সেই স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা হলো। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ব্যায়ামচর্চা করতেন ও নানা রকম খেলাধূলায় নৈপুণ্য দেখাতেন। কলকাতায় স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর ব্যায়াম চর্চা সমানভাবেই চলতে থাকে স্কুলের কাছাকাছি একটি ব্যায়ামাগারে। কাঁসারীপাড়ার পাশেই শিমুলিয়া বা সিমলা। সিমলার অধিবাসী

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাখালের বন্ধুত্ব হয় ট্রেনিং একাডেমিতে। স্কুলে রাখাল যদিও দু'তিন ক্লাস নীচে পড়তেন, বয়সে সমান বলে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে বিলম্ব হলো না। দুজনে একই সঙ্গে একই পাড়ায় কুস্তি লড়তেন। নরেন তখন থেকেই ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা করতেন। একটু বয়স বাড়লে রাখালও বন্ধুর দেখাদেখি ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া-আসা শুরু করেন। শহরের অধিকাংশ শিক্ষিত ও ধর্মপ্রাণ তরুণদের কাছে তখন রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত এই ব্রাহ্ম-সমাজই আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এখানকার নৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ হিন্দু যুবকদের পক্ষে যে খুবই কল্যাণপ্রদ হয়েছিল, তা বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে নব্য যুবকেরা দলে দলে ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। নরেন ও রাখাল দুজনেই সমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। এমন কি, দুই বন্ধুতে কেবলমাত্র নিরাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা করবেন এই মর্মে সমাজের অঙ্গীকারপত্রে পর্যন্ত সহি করেছিলেন।

কিন্তু তা করলে কি হয়, দক্ষিণেশ্বরে আসার পর তাঁদের চিন্তার ধারা, এক মহান্ যাদুকরের সংস্পর্শে, আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'শিশুর ন্যায় সরলপ্রকৃতিসম্পন্ন নির্ভরশীল রাখালচন্দ্র যে নরেন্দ্রনাথের সপ্রেম ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইবেন ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।'[১] পরে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ভক্তদের সামনে একদিন বলেছিলেন: 'রাখালের সাকারের ঘর, নিরাকারের কথা শুনলে এখান থেকে উঠে যাবে।'[২] স্কুলে পড়বার সময়েই রাখাল ও নরেন্দ্র দুজনই মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট অম্বিকা গুহের কুস্তির আখড়ায় যোগদান করেছিলেন। সুস্থ সবল শরীর গঠন, সংযত আহার-বিহার আর ব্রাহ্মসমাজের

১. লীলা প্রসঙ্গ (৩য়)। ২. কথামৃত (৪র্থ)।

উপাসনায় যোগদান—এই ছিল রাখালচন্দ্রের তখনকার জীবনের ধারা। ক্রমে লেখাপড়াটা গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

অভিভাবকেরা এটা লক্ষ্য করে চিন্তিত হলেন। সাংসারিক বিষয়ে ছেলের মনকে ব্যাপৃত রাখার জন্য আনন্দমোহন ছেলের বিয়ে দেবার কথা চিন্তা করলেন। ছেলের দিক থেকে এই বিষয়ে কোনো অমত বা আপত্তি ছিল কিনা তা জানা যায় না। শীঘ্রই মনের মতো পাত্রী পাওয়া গেল। কোন্নগরের মনোমোহন মিত্র তখন শিমুলিয়াতে বাস করতেন। কুলে-শীলে ভাল ঘর। তাঁরই সেজ বোন বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রাখালের বিয়ে হলো। মেয়েটি সুলক্ষণা ; বয়স এগারো বছর পূর্ণ হয়েছে। রাখালের বয়স তখন আঠারো বছর। বিয়ে হলো বটে, কিন্তু রাখালের স্বভাবগত বাল্যভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। মনোমোহন আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাওয়া-আসা করতেন। একদিন তিনি ভগিনীপতিকে সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। রাখালের জীবনে সেই প্রথম রামকৃষ্ণদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণও সেই প্রথম তাঁর মানসপুত্রকে স্বচক্ষে দেখলেন।

'রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রী-জগদম্বা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন এইটি তোমার পুত্র। শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, সে কি, আমার আবার ছেলে কি ? তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সাধারণ সংসারি-ভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র। তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক।'[১] রাখাল আসবার কিছুকাল পরে মনোমোহনের মা একদিন বালিকা পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর এলেন। ছেলে বিয়ে করেছে, বৌমার সংসর্গে তার ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো ?—এই প্রশ্ন করতেই শ্রীরামকৃষ্ণ অবগুণ্ঠিতা বধূকে কাছে আনিয়ে তার পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত

১. লীলাপ্রসঙ্গ (৩য় ভাগ)

শরীরের গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করে দেখলেন এবং বললেন, না ভয়ের কারণ নেই। দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কখনো হবে না। তারপর তিনি তাকে নহবতের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন এবং সারদাদেবীকে বলে পাঠালেন, টাকা দিয়ে যেন ছেলের বৌর মুখ দেখেন।'[১]

রাখাল রামকৃষ্ণের পুত্র, ব্রজের রাখাল। সাক্ষাৎ নারায়ণ, পুত্ররূপে। রামকৃষ্ণ-লীলায় তাঁর স্থান নরেন্দ্রনাথের পরেই। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা করেন রাখাল। ঠাকুরের ভাবগতি দেখে, তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনে অবাক হন। একদিনের একটি ঘটনা তিনি স্বয়ং এইভাবে তাঁর এক ভক্তের কাছে বর্ণনা করেছিলেন: 'তখন বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট থেকে ঠাকুরের কাছে যাতয়াত করি। একদিন ছুপুর বেলা গেছি, মা-কালীর মন্দির বন্ধ, ঠাকুর খেয়ে বিশ্রাম করছেন। আমি যেতেই ওঁর বিছানায় বসালেন; একথা সেকথার পর বললেন, একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দে তো। আমি বললুম, মশায়, এটি মাপ করবেন; আমারই পায়ে কে হাত বুলিয়ে দেয় তার ঠিক নেই। বেশ তো গল্প করছিলেন, গল্প করুন। তথাপি সানুনয়ে তিনি বললেন, দে না, সাধু-সেবার ফল আছে। ছু'তিন বার বলার পর পায়ে হাত দিতেই অবাক কাণ্ড! আমি তো তাজ্জব! লোকটা কি ভৌতিক জানে? সাদা চোখে দেখলাম, মা-কালী সাত-আট বছরের মেয়েরূপে তীরবেগে ঘরে ঢুকলেন, ওঁর তক্তপোশের চারধারে কয়েকবার ঘুরপাক খেলেন, পায়ে মল বাজছে, শেষে ওঁর বুকে মিলিয়ে গেলেন। মুচকি হাসতে হাসতে তিনি বললেন, দেখলি হাতে হাতে সাধুসেবার ফল?'[২] নরেন্দ্রনাথেরও ঠিক এই ধরনের অনুভূতি হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে একান্তভাবে স্পর্শ করেছিলেন।

১. তদেব।

২. ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা: ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য।

আর একদিনের ঘটনার কথায় ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন: ‘জানো জ্ঞানদানন্দ, আমরা যেমন কাদামাটি নিয়ে ইচ্ছামত পুতুল গড়ি, ঠাকুর তেমনি আমাদের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন। আমি একদিন নিজের হাতে করে প্রসাদী মাখন তুলে খেয়েছিলুম, তার জন্যে ঠাকুর আমাকে গালমন্দ করেন। আমি বল্লুম, খিদে পেয়েচে, খাব না তো কী করব, আপনি তো আমার জন্যেই রেখেছিলেন। প্রসাদ নিজ হাতে নিয়ে খেতে নেই, তাতে লোভ হয়—এই বলে আরো গালমন্দ করেন। আমি তখন রাগ করে, আমার কি বাড়ি নেই, আপনার এখানে থেকে শুধু গালমন্দ শুনব? আমি চল্লুম—বলেই হন হন করে গেটের দিকে চল্লুম। কিন্তু গেট পর্যন্ত গিয়ে গেট পার হতে আর পারলুম না, কে যেন আমার ঘাড় ধরে ফিরিয়ে ঠাকুরের ঘরে এনে হাজির করল। ঠাকুর বল্লেন, কই যাবি বলিছিলি, গেলি না যে? আমি কেঁদে ফেল্লুম।’[১]

সকলেই জানেন যে, উদ্যতফণা বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন একটা প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের ভাব নিয়ে—‘ঠাকুর, তুমি ঈশ্বরকে দেখেছ’?—এই ছিল সংশয়বাদী যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম প্রশ্ন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্তানগণ ঠিক এই রকম মনোভাব নিয়ে এখানে আসেন নি। এইসব রামকৃষ্ণ-পার্ষদদের অন্তর্জগতের ভাঙাগড়ার ইতিহাসটা সম্পূর্ণরূপে জানবার উপায় নেই। এঁরা নিজে থেকে এঁদের অহেতুক কৃপাসিন্ধু ইষ্টদেবের কথা, তাঁদের সম্পর্কে তাঁর আচরণের কথা যা সময় সময় বলতেন তার থেকেই আমরা জানতে পারি যে, কেবলমাত্র কতকগুলি নিয়ম বা কঠোর অনুশাসনের বাঁধনে না রেখে, হাস্যপরিহাস কৌতুকের ভেতর দিয়ে, শুভসংস্কারসমূহকে জাগ্রত করে তাঁর বালক শিষ্যদের ঈশ্বরের পথে তিনি পরিচালিত করতেন। সত্যিই তিনি এক আশ্চর্য কারিগর ছিলেন। ঠাকুর তাঁর প্রিয়

১ ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা।

রাম—

মানসপুত্রকে কিভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদের যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে গড়ে তুলেছিলেন 'লীলাপ্রসঙ্গ' লেখক আর 'কথামৃতকার' তার কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন।

নরেন্দ্রনাথের মতো, সঙ্গীতে রাখালচন্দ্রের অসাধারণ প্রীতি ছিল—শৈশবে সময় সময় সঙ্গীদের নিয়ে গ্রামের বাইরে এক নিরালা স্থানে গিয়ে একসঙ্গে শ্যামাসঙ্গীত গাইতে গাইতে এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে, দেশ-কালের জ্ঞান বিলুপ্ত হতো। কারো মুখে নতুন শ্যামাসঙ্গীত শুনলে তিনি তা শিখে নিতেন। আবার গৃহে সমাগত বৈষ্ণব ভিখারীর মুখে বৃন্দাবনচন্দ্রের গান শুনে আত্মহারা হতেন। কৃষ্ণ-গুণ-মহিমা হোক, বা জগন্মাতার মহিমা হোক, যখন যা শুনতেন রাখালচন্দ্রের তাতেই ভাবাবেশ হতো। বলরাম বসুর বাড়িতে একবার আর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে আর একবার রাখালচন্দ্রের ভাবাবেশের কথা কথামৃতকার উল্লেখ করেছেন। উত্তরকালে কৃষ্ণ ও কালী-নামগুণ কীর্তন শুনে তাঁর অবিরাম ভাবাবেশ হতো। বহুবার অনেকেই এটা প্রত্যক্ষ করেছেন। এর থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, শ্যামচন্দ্র যেমন তাঁর ইষ্টদেব ছিলেন, নৃমুণ্ডধারিণী শ্যামাও তেমনি ছিলেন রাখালের ইষ্টদেবী।

প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছিলেন রাখালচন্দ্র সেদিন বিদায় বেলায় স্নেহভরা কণ্ঠে ঠাকুর বলেছিলেন, আবার এসো। সেই প্রথম দর্শনেই তিনি যে এই যুগাবতারের প্রতি নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, উত্তরকালে তাঁর কোন এক শিষ্যের কাছে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: 'প্রথম দর্শনেই আমার অন্তরে বিদ্যুৎচমকের মতো কি এক উচ্ছ্বাস খেলে গেল—আমার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ এককালে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, ঠিক চুম্বক যেমন লোহাকে টানে। মনে মনে ভাবলাম, ইনি কে? কে এই সৌম্য মহাপুরুষ? তাঁর প্রতি তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল—কী যেন একটা দিব্য মাধুরী তাঁর পলকহীন দৃষ্টির সামনে খেলে বেড়াচ্ছে।

ফিরে আসবার সময় সারাটা পথ আমার কানে বাজছিল তাঁর সেই মধুর কথা দুটি—'আবার এসো।'

—রাখাল, তুই ভণ্ড। তুই কপাটাচারী।

—একথা বলছ কেন নরেন?

—তুই আমার সঙ্গে সমাজে যাওয়া-আসা করিস, সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে তুই না সই করেছিস?

—কিন্তু কপটাচারণটা দেখলে কোথায়? এখানে আসি বলে? সে তো তুমিও আস।

—আমি আসি ঠিক, কিন্তু আমি নিরাকারের পথ থেকে একটুও বিচ্যুত হইনি। আর তুই কি না সাকারে মজে গেলি।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সামনেই দুই বন্ধুতে এই রকম কথা হচ্ছিল। ঘরের মধ্যে ঠাকুর ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। তক্তপোষের ওপর মুদ্রিত নয়নে বসে তিনি এই আলোচনা শুনছিলেন। কী এক দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত তাঁর মুখ; ঠোঁটের কোণে মৃদুহাসির রেখা। যে কোন চিত্রশিল্পীর পক্ষে এই দুর্লভ দৃশ্যটি স্পৃহনীয়। একদিকে সপ্তর্ষির এক ঋষি—নর-রূপী নারায়ণ, আর অন্যদিকে সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। দুজনের কথার মাঝখানে অনন্তভাবময় ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে বলেন: 'রাখালের সাকারের ঘর, তোর নিরাকারের। রাখালকে আর কিছু বলিসনি। তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে। সকলেই কি একেবারে নিরাকারে বিশ্বাস করতে পারে?'[১]

১৮৮১ সাল থেকে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা করতেন রাখালচন্দ্র। দিনের পর দিন আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে ঈশ্বরীয় ভাব। কথিত আছে, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করতে করতে তাঁর প্রবল ভাব হয়েছিল। এখানে আসার অল্পকাল মধ্যেই ঠাকুর তাঁর

১. কথামৃত (৪র্থ)।

নিত্যসিদ্ধ এই বালককে মন্ত্রদীক্ষিত করেন। রামকৃষ্ণ শিষ্যগণের মধ্যে রাখালচন্দ্রের জপনিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। 'জপৎ সিদ্ধি' এই শাস্ত্র বাক্যের সাক্ষাৎ প্রমাণ ছিলেন তিনি। তাঁর সকল গুরুভাই বলতেন, আজীবন মহারাজের জপনিষ্ঠা অব্যাহত ছিল। গুরুসেবা ও গুরুর সাহচর্যে নিরন্তর বাস করার ফলে তাঁর জপনিষ্ঠায় কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখা যেত না। এর ফলে তিনি একেবারে অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিলেন সেই বয়সেই। ঠাকুর স্বয়ং এর সাক্ষ্য দিয়েছেন: 'রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্চে যে তাকে আমার জল দিতে হয়। সেবা করতে বড় পারে না'[১] নাট মন্দিরে তাঁর মানসপুত্রকে যেদিন ঠাকুর মন্ত্র দান করেন সেদিন তাঁকে তিনি বলেছিলেন, 'এই নে তোর মন্ত্র, আর ঐ ভাখ্ তোর ইষ্ট।' আমরা অনুমান করতে পারি যে, তাঁর জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যুগপৎ মন্ত্রলাভ ও ইষ্ট-মূর্তির দর্শন রাখালচন্দ্রকে নিশ্চয়ই এক অকল্পিত আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থতা যখন সংকট আকার ধারণ করলো তখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য কাশীপুরে আনা হয়। সেখানে রাখালচন্দ্র এসে ইষ্টদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই কাশীপুরের বাগান বাড়িতে রামকৃষ্ণ সন্তানদের সংসার-চিন্তা বলতে কিছু ছিল না। গুরুসেবার সঙ্গে চলতো এক অপূর্ব সাধনা—সে ইতিহাস তো লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: 'কাশীপুরে আসার কিছুদিন পরেই মনোমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন যে, রাখালের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। রাখাল পার্শ্বেই ছিলেন, তিনি সব শুনিলেন; কিন্তু তখন মায়িক সংসারের ঘটনাবলী তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করিত না; সেজন্য এই সংবাদে তাঁহার বৈরাগ্যজনিত প্রশান্তির কোন হ্রাস লক্ষিত হইল না—তিনি পূর্বেরই ন্যায় দিবসে সেবা ও রাত্রে ধ্যানজপে নিমগ্ন রহিলেন।'

১. তদেব।

দিন যায়। কাশীপুরে লীলাবসান আসন্ন হয়ে উঠেছে। লীলাময় তাই বুঝি এই সময়ে ভাবী রামকৃষ্ণসঙ্ঘ-গঠনের জন্য প্রায় প্রতিদিন নরেন্দ্রকে গোপনে ডেকে নানা উপদেশ দিতেন। কথিত আছে, একদিন রাখালচন্দ্রের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে সে একটা রাজ্য চালাতে পারে। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তিটির মধ্যে একটি ইঙ্গিত পেয়ে থাকবেন। তারপর একদিন গুরুভাইদের ডেকে বললেন, আজ থেকে তাঁরা রাখালকে 'রাজা' বলে ডাকবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভবিষ্যতের স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত এই অভিধাটি অনুমোদন করে গিয়েছিলেন। সেই থেকে গুরুভাইদের কাছে তিনি 'রাজা' বলেই পরিচিত হলেন। উত্তরকালে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে 'মহারাজ' এই নামে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতি সর্বোতভাবেই রাজোচিত ছিল। আবার তাঁকে বলা হতো যেন রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্মৃতি। তিনি যখন হেঁটে যেতেন তখন তাঁর পশ্চাদছায়া দেখে মনে হতো ঠাকুর হেঁটে যাচ্ছেন।

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাখালচন্দ্রের স্মৃতিপট থেকে মুছে গেল সংসার, পিতার বিপুল সম্পত্তি, যুবতী স্ত্রী, শিশুপুত্র। কেউই আজ তাঁর হৃদয়ে স্থান পেল না ; সমস্ত হৃদয় জুড়ে রইল শুধু ইষ্ট-স্মৃতি আর তাঁর বিরহজনিত এক অবর্ণনীয় ব্যথা। কাশীপুরের বাগানবাড়ি ছেড়ে দিতে হলো। সাময়িকভাবে আশ্রয় নিলেন বলরাম বসুর বাড়িতে। ঠাকুরের প্রত্যেকটি সন্তানকে এই রামকৃষ্ণ-ভক্ত অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। ইনি স্বামী প্রেমানন্দের ভগ্নীপতি ছিলেন। তারপর বরাহনগরের জীর্ণবাটিতে মঠ স্থাপিত হলে তিনি সেখানেই চলে আসেন। এই সময়ে তাঁর পিতা আনন্দমোহন মাঝে মাঝে মঠে এসে ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় না ; এমন কি এই সময়ে পত্নীর আকস্মিক মৃত্যুতে

দেখা গেল যে রাখালচন্দ্র অবিচলিত আছেন। এর দশ বছর পরে নিজের একমাত্র দশ বছর বয়স্ক পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর তিনি যে রকম নির্বিকার ছিলেন তা দেখে তাঁর গুরুভাইরা পর্যন্ত যারপর নাই বিস্মিত হন।

দিন যায়। নির্জনে তপস্যা করবেন, মনের মধ্যে এই ইচ্ছা প্রবলতর হতে থাকে। শুরু হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। তীর্থপর্যটনে বের হলেন তিনি। ঠাকুরের জীবিতকালেই তিনি কিছুকাল বৃন্দাবন বাস করেছিলেন। একমাত্র ঈশ্বরকে আশ্রয় ও ভরসা করে শুরু হয়েছিল তাঁর ভারত-তীর্থ পরিক্রমা। ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু হয় এই তীর্থ পর্যটন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাঁকে একাকী যেতে দেন নি। তাঁর সহচররূপে পাঠালেন স্বামী সুবোধানন্দকে। ১৮৯০ সালের শেষভাগে তিনি হরিদ্বারে উপনীত হন। তখন সেইখানে কয়েকজন গুরুভাই আগে থেকেই ছিলেন। ১৮৯১ সালের জানুআরি মাসে স্বামী বিবেকানন্দ এইখানে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তীর্থ পর্যটন কালে মহারাজকে যে কঠোর জীবন যাপন করতে হয়েছিল তার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি বললেই চলে। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের এই মানস-পুত্রের যেসব দুর্লভ সাধন, অনুভূতি বা দর্শনাদি হয়েছিল তার সবটাই প্রায় অপরিজ্ঞাত হয়ে আছে। ১৮৯৪ সালের মাঝামাঝি তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে তিনি যখন মঠে প্রত্যাগমন করেন তখন আমেরিকা ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি উঠেছে।

বিশ্ববিজয়ী গুরুভ্রাতা, মঠ ও মিশনের প্রাণস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের লোকান্তর গমনের পর স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনে শুরু হয় তৃতীয় পর্ব। এর পরিধিকাল ছিল সুদীর্ঘ বিশ বছর। তাঁর গৌরবময় জীবনের এই সময়কার যে ইতিহাস তা প্রত্যক্ষভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ক্রম-বিকাশেরই ইতিহাস। বিবেকানন্দ তাঁকে প্রেসিডেন্টের পদে বসিয়ে তাঁর ওপর যে গুরুভার চাপিয়ে

গিয়েছিলেন তা, সকলেই জানেন, কী সুষ্ঠুভাবেই না ব্রহ্মানন্দ সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর অত্যাশ্চর্য সাংগঠনিক প্রতিভা দেখে তাঁর গুরুভাইরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যেতেন। কে বলবে, ইনিই সেই জপনিষ্ঠ ও নির্জন তপস্যাপ্রিয় সন্ন্যাসী যিনি, স্বামীজির মহাপ্রয়াণের দুই দশক কালের মধ্যে ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে রামকৃষ্ণ-নামের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন—স্থাপন করেছিলেন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েকটি কেন্দ্র এবং সেই সঙ্গে কাশী প্রভৃতি স্থানে সেবাকার্যমূলক কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। বস্তুতঃ এইদেশে মিশনের আদর্শ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-ধারার ব্যাপক প্রচার তাঁরই নিরলস উদ্যমের ফলে সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য তাঁর এই কাজে স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ যে একটি আখড়া নয়, নবযুগজীবন গঠনের একটি কেন্দ্রবিশেষ, ব্রহ্মানন্দের সাংগঠনিক প্রতিভা সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছিল।

সঙ্ঘনায়কের গুরুদায়িত্ব বহন করা যে কী দুরূহ ব্যাপার তা মহারাজ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। বিবেকানন্দের জীবিতকালেই ভারত ও ভারতের বাইরে মঠ ও মিশন বেশ কিছুটা সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। সেই সুনাম রক্ষা করা আর মিশনের প্রসার সাধন করা—এই দুটি কাজই যে বিশেষ আয়াসসাধ্য তা জেনেই তিনি কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। অগাধ আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর, ছিল প্রচণ্ড কর্মশক্তি আর হৃদয়ে ছিল অপরিসীম ভালবাসা। সর্বোপরি ছিল আধ্যাত্মিক শক্তি। স্বামীজির পর তিনিই তখন হয়ে উঠেছেন সকলের আশ্রয়স্থল। তাঁর আকর্ষণে দলে দলে আসতে থাকেন ভক্তগণ। অনেক শিক্ষিত ত্যাগী যুবকও মঠে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসী হয়। স্বামীজির সেই কম্বুকণ্ঠের আহ্বান—ওঠো, জাগো, মানুষ হও—তখনো বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে ছিল। মহারাজের প্রথম কাজ ছিল এদের প্রত্যেককে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দবাণী বহনের

যোগ্য আধার করে তোলা এইকাজে তিনি সফল হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী কর্মজীবনে স্বামীজি মঠ ও মিশন সম্পর্কে যেসব কাজ করে গিয়েছিলেন—বেলুড়, মাদ্রাজ ও আলমোড়াতে মঠ স্থাপন এবং শিবধাম কাশীতে অদ্বৈত আশ্রমের সূচনা—মহারাজ তাকে শতগুণে প্রসার করে, জনসমাজে মঠ ও মিশনকে পরম সমাদরের বস্তু করে তুলেছিলেন। তাঁরই সময়ে মিশনের ভিত্তি দৃঢ়তর হতে থাকে আর সেই সঙ্গে এর প্রভাব ভারতের বাইরেও প্রসারিত হতে থাকে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্টরূপে যে সব কাজ করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদত্ত হলো। হরিদ্বার, প্রয়াগ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির উন্নতি সাধন; দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি নতুন কেন্দ্র স্থাপন; কাশীতে স্বামীজি একটি অনাথ আশ্রমের সূচনা করে গিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতাকে এই প্রতিষ্ঠানটির ওপর দৃষ্টি রাখতে বলেছিলেন। মহারাজ সে নির্দেশ বিস্মৃত হন্ নি। ১৯০৩ সালের শেষভাগে তিনি কাশীতে এসে অনাথ আশ্রমটিকে মিশনের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তখন থেকে এটি 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম' এই নামে পরিচিত হয়। ১৯০৪ সালে ভাগলপুরে প্লেগের আবির্ভাব হয়; তাঁর নেতৃত্বে সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য আরম্ভ হয়েছিল। ১৯০৭ সালে তাঁর নির্দেশে বৃন্দাবনে স্থাপিত হয় 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম'। দাক্ষিণাত্যে তাঁর ইষ্টদেবের ভাবধারা যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হয় সেজন্য তিনি ১৯০৯ সালে বাঙ্গালোরে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন 'রামকৃষ্ণ আশ্রম'। এইখানে তিনি রামনাম-কীর্তন শুনে খুবই মুগ্ধ হন; সেখান থেকে এই কীর্তনের পদ তিনি সংগ্রহ করে এনেছিলেন এবং পরে মঠ ও মিশনের সর্বত্র প্রচলিত করেন। এই বছরেই মিশনকে আইন অনুসারে রেজেস্ট্রী করা হয়। তখন মিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা নতুন করে স্থিরীকৃত হয়।

১৯১২ সালের মার্চ মাস থেকে দীর্ঘ আট মাস কাল তিনি কনখলে (হরিদ্বার) অবস্থান করেন ও 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম' স্থাপন করেন। তাঁরই উদ্যোগে এই বছরে এখানে প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুর্গাপ্রতিমা কলকাতা থেকে আনা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, কেদার-বদরী তীর্থযাত্রীরা কনখলের এই সেবাশ্রমটি থেকে নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি এলাহাবাদে এসে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠে কিছুকাল অবস্থান করেন। ১৯১৬ সালের গোড়াতে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে এসে তিনি ঢাকা শহরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শিলান্যাস করেন। এই বছরের শেষভাগে ত্রিবান্দ্রম গিয়ে সেখানে রামকৃষ্ণ আশ্রমের শিলান্যাস করে আসেন। ১৯১৭, ২০ জানুআরি মহারাজ মাদ্রাজ এসে এখানকার রামকৃষ্ণ মঠের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন; এই মঠের শিলান্যাসও তিনি করেছিলেন এক বছর আগে। বেলুড় মঠ যেমন বিবেকানন্দের অদ্বিতীয় কীর্তি তেমনি ব্রহ্মানন্দের কীর্তি হলো ভুবনেশ্বরে রামকৃষ্ণ মঠ। ভারতের সকল তীর্থস্থান অপেক্ষা কাশী, বৃন্দাবন আর ভুবনেশ্বর ছিল মহারাজের খুব প্রিয়; বলতেন, ভুবনেশ্বর শিবধাম, গুপ্ত কাশী। তাঁর বহু দিনের ইচ্ছা ভুবনেশ্বরে একটি মঠ স্থাপিত হয়। ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি এই মঠের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন করেন। লিঙ্গরাজ মন্দিরের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হয় এই মঠ। ১৯২১ সালে মাদ্রাজ গিয়ে সেখানে 'রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস'-এর নব-নির্মিত দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তাঁরই নির্দেশে ও উৎসাহে এই বছরে মাদ্রাজ মঠে বিশেষ ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিমা এসেছিল কলকাতা থেকে। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই উপলক্ষ্যে স্থানীয় জনসাধারণের মনে তুমুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। এই সময়ে তিনি এখানে অনেককে দীক্ষাদান ও ব্রহ্মচর্য প্রদান করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ-সংঘের মূল প্রেরণা এসেছে বিবেকানন্দের কাছ থেকে, কিন্তু এর বিকাশ ও বিস্তার সাধিত হয়েছে সঙ্ঘাধিনায়ক ব্রহ্মানন্দের অক্লান্ত যত্ন প্রয়াসের ফলেই। তাঁর কাছে সমাগত প্রত্যেক ধর্মার্থীকে মহারাজ কিভাবে ঈশ্বরের পথে প্রেরণা দান করতেন, সেই বিষয়ে বহু ঘটনা আছে। মঠের সাধকদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিয়মিত কীর্তনভজনের প্রবর্তন করে, তাদের ধর্মস্পৃহাকে একটা নতুন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে তুললেন। বলতেন, সংগীতে স্বরময় হয়ে শব্দব্রহ্ম সাধকের চিত্তবৃত্তির তন্ময়তা সাধন করেন। যুগে যুগে সংগীত সেই কারণেই ভক্তিপথের সাধকদের বিশেষভাবে অবলম্বনীয় হয়েছে। মহারাজ যখন যেখানে যেতেন, দু'একজন গায়ক তাঁর সঙ্গে যেতেন; গানের সরঞ্জামের মধ্যে থাকত ছোট্ট একটি হারমোনিয়ম।

সমুদ্রবৎ বিশাল ও গম্ভীর ছিল মহারাজের প্রকৃতি আর হিমালয়-তুল্য উন্নত ও বিরাট ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁর সমগ্র সত্তা ছিল অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত। স্নেহে তিনি ছিলেন যেমন কোমল ও বিগলিত চিত্ত, শাসনে তেমনি কঠোর। বস্তুত ব্রহ্মানন্দ-চরিত্রের সম্যক ধারণা সাধারণ মানুষের পক্ষে আদৌ সহজ নয়। আচার্যরূপে মহারাজের আর এক মূর্তি। নির্বিচারে তিনি কাউকে বড়-একটা দীক্ষা দিতেন না; কথিত আছে, এই ব্যাপারে তার যথেষ্ট বাছবিচার ছিল। এই বিষয়ে সব সময় তাঁর কঠোরতা দেখে অনেক দীক্ষার্থী তাঁকে ভুল বুঝতেন। তেমনি সাধারণ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেও তিনি পরাঙ্মুখ হতেন। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির ব্যাকুলতা বুঝতে পারলে, অথবা কাউকে যদি মনে করতেন যথার্থ অধিকারী, তবেই না তিনি ধর্মোপদেশ করতেন।

আশ্রিতবাৎসল্য ছিল মহারাজের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়ে দুটি ঘটনা উল্লেখ্য। একবার তাঁর এক সেবক কিছু নীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছিলেন। আর একটি সেবক সেই কথা হরি মহারাজকে (স্বামী তূরীয়ানন্দ) বলেন। হরি মহারাজ কথাটা

মহারাজের কানে তুলেন। অভিযোগকারী সেবককে ডাকিয়ে এনে মহারাজ গম্ভীর স্বরে তাকে বলেন: 'শুনলাম তুমি সব কথা হরি মহারাজকে বলেছ। আমি থাকতে এসব তুচ্ছ কথা তাঁর কাছে গিয়ে বলার কি দরকার ছিল তোমার? তোমার যদি এখানে অসুবিধা হয় তাহলে অন্য কোথাও চলে যেতে পার। তুমি আছ আমার সেবা করার জন্য, লোকের দোষগুণ বিচারে তোমার অধিকার নেই।'

অভিযোগকারী সেবকটি তখন সেই লোকটির দোষের কথা বলতে উদ্যত হলে, মহারাজ প্রশান্ত ভাবে তাকে বললেন: 'আমি কি দেখছি না? আমি জানি তুমি যার দোষ গেয়ে বেড়াচ্ছ তার দোষ তেমন কিছু নয়। তার এত গুণ আছে যার তুলনায় দোষ অতি তুচ্ছ। দোষে-গুণেই মানুষ। আমার কাছে যারা আছে তারা কেউই হীন নয়, এটি মনে রেখো।' এমনিভাবেই তিনি সেবকদের শিক্ষা দিতেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো এই। বেলুড় মঠে একবার মহারাজের এক সেবককে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র পাঠিয়ে দেবার কথা হয়। বিষয়টি তাঁর কাছে আসামাত্র তিনি ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলেছিলেন: 'তোমাদের প্রেসিডেন্টগিরি ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু যাকে একবার আশ্রয় দিয়েছি তাকে কোনদিন ছাড়তে পারব না।'

এই আশ্রিতবাৎসল্যের কি কোনো তুলনা হয়?

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বা এর নেতৃস্থানীয় অনেকে বেলুড় মঠে যোগদান করে সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিল, কিন্তু মহারাজ অনুমোদন করেননি বলে কারো সেই ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারেনি, যদিও তাঁদের দেশপ্রেমের তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রসংসা করতেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, আবাল্য স্বামীজির ভাবে ভাবিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র একবার মঠে এসে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও সাধু হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'তোমার সাধু হওয়া চলবে না, তোমাকে দেশের কাজ করতে হবে'—এইভাবে তাঁকে নিরস্ত

করেছিলেন। এর পর কলকাতায় রামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নেতাজী যখন তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন, তখন কালী মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি ক্ষত্রিয় বীর। তুমি বিজয়ী হও।'[১]

ঘটনাবহুল জীবন ছিল মহারাজের। তাঁর সম্পর্কিত একাধিক বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থে সেসব ঘটনার উল্লেখ আছে। তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের নানা দিক এইসব ঘটনার মধ্যে আভাসিত হয়েছে। তাঁর চরিত্রের নানা দিক, তাঁর স্বভাবের মধ্যে নানা রকম ভাবের প্রকাশ দেখা যেত। তাঁর এক জীবনীকার এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন: 'রসিকশেখর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র শ্রীরাখাল মহারাজ আজীবন রঙ্গরসপ্রিয় ছিলেন। একই সময়ে স্তব্ধ গভীরতা ও চঞ্চল বীচিবিক্ষোভ লইয়া সমুদ্র যেমন আপন মহিমায় বিরাজ করে, ব্রহ্মসমুদ্রাবগাহী ব্রহ্মানন্দ-চরিত্রও তেমনি ধারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কখনো সমাধির নিস্পন্দ গভীরতায়, কখনো বা রসস্বরূপের নৃত্যধর্মী চঞ্চলতায়।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন রাখালের বালকভাব। কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই ভাবটি ছিল মহারাজের স্বভাব-সিদ্ধ। বসু-ভবনে,[২] ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অনেক এসে জড়ো হতো, মহারাজ তাদের সঙ্গে তাদের মতো হয়ে খেলা করতেন। ছোটরা গল্প শুনতে ভালবাসে; তিনি তাদের গল্প বলতেন। এই স্বভাবের কি কোনো তুলনা আছে?

মহারাজ যখন বেলুড় মঠে আসতেন, তখন মঠস্থ সকলের মনে

১. যতদূর স্মরণ হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক এক বছর আগে এই স্মরণীয় সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল বেদান্ত মঠের দ্বিতলে স্বামী অভেদানন্দের কক্ষে।

২. শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম রসদদার ও গৃহীভক্তদের মধ্যে অন্যতম বলরাম বসুর বাগবাজারস্থ বাড়ি। বর্তমানে এই ভবনের অর্ধেক অংশ 'বলরাম-মন্দির' নামে পরিচিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন কলকাতায় আসতেন তখন এই বাড়িতেই অবস্থান করতেন এবং গৃহেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হতো, তাঁরা যেন কৈলাস অথবা বৈকুণ্ঠে আছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায় যে, একটা অপূর্ব এবং অনাস্বাদিতপূর্ব অধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হতো তখন সেখানে। সমস্ত মঠটি যেন আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে ভরপুর হয়ে উঠতো—সমস্ত পারিপার্শ্বিক কি যেন একটা দিব্যভাবে জমজমাট হয়ে উঠতো। মানবীয় ভাষায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এক মহাশক্তিধর সাধককে কেন্দ্র করে, পূজা-অর্চনা, কীর্তনভজন ও ধ্যান-ধারণায় স্থানটি দিব্যভাবে জমজমাট হয়ে উঠতো। পুরাণে ও শ্রুতিতে জনকাদি যেসব ঋষির কথা আছে, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মধ্যে অনেকেই সেই ঋষিদের প্রত্যক্ষ করে ধন্য হতেন। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন মহাবিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, আবার অন্যদিকে ছিলেন তুরীয় অবস্থাসম্পন্ন তত্ত্বদর্শী জীবন্মুক্ত ঈশ্বরকোটী মহাপুরুষ। এক সময়ে একজনের মধ্যে যুগপৎ এই প্রকাশ কেমন করে সম্ভব তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য বিষয়। সাধারণ মানুষের বোঝার অতীতে বহু দূরে থাকতেন তিনি। অথচ সঙ্ঘজননীর প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধার কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখা যেত না। ঠাকুরের সকল সন্তানই মাতৃভক্ত ছিলেন। মহারাজ যখন বেলুড় মঠে থাকতেন তখন প্রতিদিন সকালবেলায় বাগবাজারে উদ্বোধনে মা'র বাড়িতে সন্দেশের টুকরী করে কিছু ফুল ও ফলাদি পাঠিয়ে দিতেন।

এই অলৌকিক পুরুষের অলৌকিক ভালবাসা সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন ঃ 'মহারাজের স্নেহের অভিব্যক্তির কথা একটু লিখিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উহা ছিল সাধারণ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি যাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, তাহার প্রতি একেবারে উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিতেন। সে হয়ত দিনের পর দিন অন্যের সহিত তাঁহার সামনে বসিয়া আছে। তিনি সেই সকল ব্যক্তির সহিত হয়ত কথা কহিতেছেন বা তাহাদের লইয়া অন্য নানা প্রকারের আনন্দ করিতেছেন, কিন্তু সেই স্নেহভাজনের

দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইতেছেন না। হঠাৎ একদিন তাঁহার সেই দিব্য অমৃতবর্ষী চক্ষু লইয়া তিনি তাহার দিকে তাকাইলেন। তাহার হৃদয় অমনি আনন্দে ভরিয়া গেল। আর দিনভোর সেই আনন্দের রেশ তাহার হৃদয়ে রহিয়া গেল। আর যদি কৃপা করিয়া তিনি তাহাকে একবার স্পর্শ করিতেন তো সে আনন্দ অন্ততঃ তিনদিন তাহার মনে স্থায়ী হইয়া থাকিত।'[১] এই ভালবাসার কণামাত্র যিনি লাভ করতেন তিনি কৃতার্থ হয়ে যেতেন।

১৯১৮, ৩০ জুলাই। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে একটি শোকাবহ তারিখ। ঐদিন কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে স্বামী প্রেমানন্দ দেহরক্ষা করেন। মহারাজ তাঁকে বাবুরামদা বলে ডাকতেন, কারণ বয়সে বাবুরাম মহারাজ দু'বছরের বড় ছিলেন। তাঁর অন্তিম সময়ে মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরের একখানি ফটো অন্তিমপথযাত্রীর মুখের সামনে ধরে বলেন, বাবুরামদা, ঠাকুরকে দেখ। তারপর যখন সব শেষ হয়ে যায় তখন মহারাজ তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করেন ও নিজের ঘরে আসিয়া শিশুর মত ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন: 'স্বামীজি চলে গেলেন, তখন থেকে আমি বাবুরামদাকে অবলম্বন করেছিলাম—হায় হায়!' গুরুভাইদের সঙ্গে মহারাজের সম্পর্ক এমনি মধুর ও নিবিড় ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, রামকৃষ্ণ-সন্তানদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সেই স্বামী অদ্ভুতানন্দ এর দু'বছর পরে মহাপ্রয়াণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চুরানব্বই বছর।

দিন যায়। লীলাসম্বরণের সময় যতই এগিয়ে আসছিল, কথিত আছে, মহারাজের মন ততই যেন অন্তর্মুখী হয়ে উঠতে থাকে। তখন একদিন স্বামী শিবানন্দকে কতকটা আত্মস্থ ভাবেই যেন, বলে ওঠেন,

১ পুণ্য স্মৃতি: স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ।

তারকদা, বেলুড় মঠের মায়া কখনো ত্যাগ করতে পারব না। শরীরটা যদিও যায়, শূন্যে থেকে বেলুড় মঠকে দেখব। এই সময়েই একদিন ('তখন মহারাজ ও বিজ্ঞান মহারাজের তত্ত্বাবধানে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে বিবেকানন্দ-সমাধি মন্দির নির্মিত হচ্ছিল) তিনি বলেছিলেন : স্বামীজিকে কে বুঝেছে, কে বুঝতে পারত ? ১৯২২, জানুআরি একুশ তারিখে মঠে মহারাজের উনষাটতম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হলো। তারপর ১০ এপ্রিল, সোমবার রাত্রি ৮ টা ৪৫ মিনিট সময়ে কলকাতায় বসু-ভবনে তার নিজস্ব কক্ষে, স্বরচিত প্রণামমন্ত্র—যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি, পরং পুরুষং তথান্যে। বিশ্বোদ্‌গতেঃ কারণমীশ্বরম্ব। তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥ —উচ্চারণ করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণের 'ব্রজের রাখাল', বিবেকানন্দের 'রাজা', মহাসমাধি লাভ করলেন। বাইরে পৃথিবী তখন চাঁদের আলোয় পরিপ্লাবিত হয়ে উঠেছে।

স্বামী শিবানন্দ

'এক প্রভু শতেক হৈলা।'

'চৈতন্য-গণোদ্দীপিকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে এই কথা। মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পর তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে যে কয়জন সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের আচার, আচরণ ও উপদেশের ভেতর দিয়েই প্রভু যেন নিজেকে শতরূপে প্রকাশিত করতেন। চৈতন্যলীলায় যা ঘটেছিল, আমাদের কালে, রামকৃষ্ণ-লীলাতেও আমরা ঠিক সেই জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম। ঠাকুর অপ্রকট হলেন বটে, তাঁর স্থূল শরীর ভস্মে বিলীন হয়ে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য যেটা সেটা হলো এই যে, এক রামকৃষ্ণ একাধিক কায়া ধারণ করে ভাস্বররূপে বিদ্যমান ছিলেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ প্রমুখ তাঁর ষোলটি মানস-সন্তানের মধ্যে। রামকৃষ্ণ-লীলায় তাই যবনিকা পতন হয়নি। 'অদ্যাপি সেই লীলা গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।' এ কথা 'যত মত তত পথ'—এই তত্ত্বের উদ্গাতার পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘই তো আজ বিশ্বরূপ ধারণ করে আমাদের সামনে তাঁর লীলার সার্থকতাকে তুলে ধরেছে।

বিশাল রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যিনি 'মহাপুরুষ মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন তিনিই স্বামী শিবানন্দ—ঠাকুরের অন্যতম মানসপুত্র আর গুরুভাইদের তারকদা। গুরুর আদর্শ তাঁর মহিমান্বিত জীবনে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল; সেইজন্য তাঁকে বলা হতো 'A Man of God' বা 'ঈশ্বরের মানুষ'। এই সুন্দর অভিধাটি মহাপুরুষের জীবনে সত্য

হয়েছিল—তাঁর কর্মে, তাঁর চিন্তায় ও তাঁর আচরণে। স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

বারাসতে বাস করতেন মোক্তার রামকানাই ঘোষাল। ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ; শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবীও ছিলেন ধর্মপরায়ণা। এই ব্রাহ্মণ-দম্পতি দীর্ঘকাল পুত্রসন্তানলাভে বঞ্চিত ছিলেন। তখন তারকেশ্বরে ধর্ণা দিলেন বামাসুন্দরী এবং এক বছর কাল ধরে চলতে থাকে যথারীতি পুরশ্চরণ, উপবাস ও প্রার্থনা। অবশেষে তাঁরা একটি সুপুত্রলাভে ধন্য হয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালের ১৬ নভেম্বর রামকানাই ও বামাসুন্দরীর প্রথম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন তারকনাথ ঘোষাল, উত্তরকালে যিনি স্বামী শিবানন্দরূপে ভারতের অন্যতম ধর্মগুরুর স্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং বাংলা তথা ভারতের জনজীবনে এক অসামান্য আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তারপূর্বক রামকৃষ্ণলীলাকে সম্পূর্ণতা দান করেছিলেন। বাবা তারকনাথের 'দোর-ধরা' ছেলে, তাই তাঁর নাম রাখা হয় তারকনাথ।

রামকানাই তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। লক্ষ্মীর কৃপা যেমন তিনি লাভ করেছিলেন, তেমনি দানেও ছিলেন মুক্ত হস্ত। বারাসতে রাণী রাসমণির একটি কাছারী ছিল। রামকানাই ঐ কাছারির আইন পরামর্শদাতা ছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে তাঁকে কখনো কখনো কলকাতায় এসে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হতো। কলকাতায় এলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেবী ভবতারিণীকে দর্শন করতেন। কথিত আছে, গঙ্গা স্নান সেরে, কাষায় বস্ত্র পরিধান করে তিনি যখন মায়ের মন্দিরে বসে ধ্যান করতেন তখন তাঁকে দেখে মনে হতো যেন সাক্ষাৎ ভৈরব। রামকানাই দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। যেমন সুদীর্ঘ তাঁর আকৃতি, তেমনি গৌরবর্ণ। তাঁর সঙ্গে একজন গায়ক থাকত। মন্দিরে দেবী প্রতিমার সামনে বসে তিনি যখন ধ্যান করতেন তখন সেই গায়ক শ্যামাবিষয়ক গান গাইত। সেই গান শুনতে শুনতে ধ্যাননিরত সাধকের দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরত।

দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসার সময় তিনি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পরিচিত হন। ঠাকুরের তখন সাধনা চলছিল। অসহ্য তাঁর গাত্রদাহ। সব শুনে রামকানাই তাঁকে একটি ইষ্টকবচ ধারণ করতে পরামর্শ দেন। সেই কবচ ধারণ করে তাঁর গাত্রদাহ সম্পূর্ণভাবে কমে গিয়েছিল। বামাসুন্দরী দেবীও দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন। পিতামাতার রূপ গ্রহণ আর তাঁদের ধর্মভাব নিয়েই পুত্র তারকনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছিলেন, এই পুত্র ক্ষণজন্মা। আমরা বলব, ইতিহাসের এক সুলগ্নেই তাঁর জন্ম হয়।

প্রিয়দর্শন পুত্রের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল বারাসত মিশনারী স্কুলে। সেখানে কিছুকাল পড়ার পর তারকনাথকে স্থানীয় উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। রামকানাই ঘোষাল ছিলেন ঐ স্কুলের সেক্রেটারি। মেধাবী হলেও লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ ছিল না বালকের। ঐ বয়সেই তিনি ভাবুক প্রকৃতির হয়ে উঠেছিলেন। শুনে শুনে তিনি অনেক ভজন গান শিখেছিলেন। সুকণ্ঠ বালক পিতার সংগীত প্রতিভার যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন। নয় বছর বয়সে তারক মাতৃহীন হন। চোদ্দ বছর বয়সে কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। তখন তিনি প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়তেন। এই সময় পর-পর দুটি পারিবারিক মৃত্যু-ঘটনার ফলে তারকনাথের শুদ্ধ মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। হঠাৎ বাড়ির কাউকে না জানিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর লেখাপড়া এইখানেই শেষ।

স্বাবলম্বী তারকনাথ নিজের পায়ে দাঁড়াতে মনস্থ করলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন পেটে একটু ইংরেজি বিদ্যা থাকলেই রেল বিভাগে চাকরি সহজেই পাওয়া যেত। তিনি রেলওয়েতে চাকরি নিলেন। এই চাকরি উপলক্ষ্যে কয়েক বছর তাঁকে পশ্চিমাঞ্চলে গাজিয়াবাদ, মোগলসরাই প্রভৃতি বহু স্থানে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। গাজিয়াবাদে অবস্থানকালে থাকতেন

উচ্চপদস্থ এক রেলকর্মচারীর বাড়িতে। তাঁর সেই সময়কার মনোভাব সম্পর্কে তারকনাথ নিজেই বলেছেন: 'ছেলেবেলা থেকেই সংসার ভালো লাগত না। প্রাণে ধর্মভাবও ছিল; আর কখনো বিয়ে করে সংসারে বদ্ধ হব না, এ ভাবও হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। দেশ ভ্রমণ করব, নানা তীর্থাদি দেখে বেড়াব—এ ইচ্ছাটাও বোধ হয় জন্মগত ছিল। রেলে চাকরি করতাম আর ভগবানকে ডাকতাম।' রামকৃষ্ণ-লীলাসহচর, চিরমুক্ত এবং বৈরাগ্যবান ও ঈশ্বরপ্রেমিক তারকনাথকে কি ঘটনাচক্রে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়েছিল সেই কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

তিনমাসের একটি শিশুকন্যাকে রেখে বামাসুন্দরী মারা গিয়েছিলেন। বিমাতার স্নেহযত্নে কন্যাটি লালিত-পালিত হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রামকানাই ঘোষালের সংসারে দেখা দিতে থাকে দারুণ অর্থাভাব। অত্যন্ত দানপরায়ণ ছিলেন বলে তিনি অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন নি। মেয়ে যখন বিবাহযোগ্যা হলো তখন ঘোষাল মশাই একরকম কর্পদকহীন বললেই হয়। এই সময়ে প্রবাসে কর্মনিরত তারকনাথ একদিন তাঁর বাবার কাছ থেকে এই মর্মে একটি চিঠি পেলেন: 'বাবা তারক, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও নীরদাকে (তারকনাথের ভগ্নী) পাত্রস্থ করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে চাপে পড়িয়া একটি বিনিময় বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। যে পরিবারে বিবাহ দেওয়া স্থির হইয়াছে, তোমাকে সেই পরিবারের একটি কন্যাকে অবশ্যই বিবাহ করিতে হইবে। আমি নিতান্ত নিরুপায় ও বাধ্য হইয়া অবস্থাচক্রে তোমার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছি।'

আমরা অনুমান করতে পারি যে, পিতার কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে তারকানাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে থাকবেন। কারণ ইতিপূর্বেই তিনি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত তাঁর পিতাকে জানিয়ে রেখেছিলেন। মা-হারা এই বোনটিকে তিনি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন। এখন বাবার প্রস্তাবে রাজী না হলে বোনকে পাত্রস্থ

করা যাবে না, কারণ আর্থিক সঙ্গতি নেই এখন তাঁদের। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের ভাবনা ত্যাগ করলেন। ভগবানের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন। বছর দুই পরে তারকনাথ একটি চিঠিতে তাঁর সম্মতি জানালেন পিতাকে, এবং বারাসতে চলে এলেন। তারপর একদিন ছোটবোনের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও বিয়ে হয়ে গেল বারাসতের কাছাকাছি মহেশ্বরপুর গ্রামের পঞ্চানন চাটুয্যের সুলক্ষণা ছোট মেয়ের সঙ্গে। বধূর নাম নিত্যকালী। কথিত আছে, রামকানাই মেয়েটিকে যখন প্রথম দেখেন নিজ ইষ্টদেবীর ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন এবং নিজে থেকেই তাকে ছেলের বৌ করতে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন।

বিয়ের পর তারকনাথ রেলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা চলে আসেন এবং এখানে অল্প চেষ্টাতেই একটি বিলাতি সওদাগরি অফিসে কাজ পেয়ে যান। কলকাতার এক আত্মীয়ের বাড়ি তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই বাড়ির কাছেই থাকতেন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: 'এখন হইতে তারক নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ও সমাজের উপাসনাদিতে যোগদান করিতেন। ভাবপ্রবণ কেশববাবু উপাসনায় বসিয়া কখন কখন ভগবানের গুণগানে ভাবের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিতেন। ঐ উপাসনা তারকের বেশ ভালই লাগিত। কিন্তু উহা তাঁহার নিকট ততটা গভীর বলিয়া মনে হইত না। তিনি গৃহে ফিরিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইবার জন্য বাড়ির সকলে ঘুমাইয়া পরিলে গভীর রাত্রিতে ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের চরণে কাতর প্রার্থনা জানাইতেন।'

তখন সকলের অজ্ঞাতসারে যুবক তারকনাথের অন্তরে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলে উঠছে। ঠিক সেইসময়ে তাঁর সেই আত্মীয়টি বাসস্থান পরিবর্তন করে, শিমুলিয়া পল্লীতে ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়ির কাছাকাছি একটি বাড়িতে উঠে আসেন। দত্ত মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের

গৃহীভক্তদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং এঁর বাড়িতে ঠাকুরের শুভাগমন প্রায়ই হতো। নরেনকে তো তিনি রামদত্তর বাড়িতেই প্রথম দেখেছিলেন। একদিন তারকনাথ খবর পেলেন যে বিকেলবেলায় ডাক্তারবাবুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ আসবেন। কি যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণ তাঁকে সেখানে টেনে নিয়ে এলো। ঠাকুরের তখন সমাধি অবস্থা। কিছুক্ষণ পরে সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে তিনি আপন মনে সমাধি-তত্ত্ব সম্বন্ধে সহজভাবে দু'চার কথা বললেন। এটাই তো জানবার জন্য সেই সুদূর পশ্চিমে থাকার সময় থেকে তারকনাথ অস্থির হয়েছিলেন। আজ সেই তত্ত্বের বিষয়ে কিছুটা আভাস পেয়ে তাঁর মন আনন্দ ভরে উঠল।

এই স্মরণীয় ঘটনা ১৮৮০ সালের শেষাশেষি অথবা ১৮৮১ সালের গোড়ার দিকের কথা। এই প্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ নিজেই বলেছেন: 'আমার দর্শনের প্রথম দিনেই আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে সমাধিমগ্ন অবস্থায় দেখেছিলাম। তারপর সমাধির ভাব কেটে গেলে তিনি ঐ বিষয়ে নিজস্ব ভাষায় বিশদভাবে আলোচনা করেন। তখন আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভব করেছিলাম যে ঈশ্বরকে যিনি উপলব্ধি করেছেন সেই মানুষ আমার সম্মুখে।'[১] এই প্রথম দর্শন তারকনাথের ওপর এমন গভীর দাগ কেটেছিল যে, পরের শনিবারেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথও ঠিক এইভাবে এসেছিলেন; তবে রামকৃষ্ণকে তাঁর প্রথম দর্শন আর তারপর তাঁর দক্ষিণেশ্বরে আসা—এর মধ্যে বেশ কিছুদিনের ব্যবধান ছিল। শনিবার অফিসের ছুটির পর নৌকাযোগে তারকনাথ দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রথমে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে উঠলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। তখন ধীরপদবিক্ষেপে তিনি কালীবাড়িতে এলেন। ঠাকুর তাঁর ঘরের পশ্চিমদিকের গোল বারান্দায়

১. মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ: স্বামী সদাশিবানন্দ।

২. A MAN OF GOD: Swami Shivananda

গঙ্গার দিকে মুখ করে যেন কার আসার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আচ্ছন্নের মতো ভাব তখন তারকের। এসে ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

—তুমি আগে কোথাও আমাকে দেখেছিলে কি ?

—আজ্ঞে কলকাতায় রামবাবুর বাড়িতে আপনাকে একবার দর্শন করেছি।

—ঘরে এসো।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহমাখা সম্ভাষণে তারক যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যখন ঘরে এলেন তখন তারকের অবস্থা অবর্ণনীয়। দেবমানব তাঁর ছোট খাটটিতে বসে আছেন। তারকের মনে হলো ইনি যেন সাক্ষাৎ 'মা'। মাতৃজ্ঞানেই তাঁর কোলে মাথাটি রেখে আবার প্রণাম করলেন। মায়ের মতো ঠাকুরও তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন যেন কত নিজের লোক। তাঁর দুই চোখে তখন করুণা ঝরছে। ওদিকে মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির মধুর কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠেছে। তক্তপোষ থেকে উঠে আবিষ্টের মতো ঈষৎ স্খলিতপদে রামকৃষ্ণ চলেছেন ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে।

আর তারকনাথ ? তাঁকে যেন ভূতে পেয়েছে তখন। তিনিও চলেছেন ঠাকুরের পিছু পিছু। কে যেন তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরে এসে ঠাকুর প্রণাম করলেন মা কালীকে। প্রথমটায় ব্রাহ্ম-সংস্কারে বাঁধলেও, পরে তারকনাথও শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করেন।

—তুমি সাকার মানো, না নিরাকার ?

—নিরাকারই আমার ভালো লাগে।

—শক্তি মানতে হয়।

এবার বিদায়ের পালা। ঠাকুর বললেন, রাতটা হেথা থেকে যাও। তারকনাথ জানালেন যে, বন্ধুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই হয়ে আছে। আচ্ছা, কাল এসো—এই বলে ঠাকুর

প্রসন্নমুখে তাঁর ভাবী সন্তানটিকে বিদায় দিলেন। পরের দিন ছিল রবিবার। অফিস বন্ধ। সারাটা দিন তাঁর বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়ে, সন্ধ্যার সময়ে তারকনাথ এলেন তার ভাবী ইষ্টদেবতার কাছে। আজকের রাতটা এখানে থাকবে, মায়ের প্রসাদ পাবে—এই কথা যখন তিনি শুনলেন তখন তারকের মনে আনন্দ আর ধরে না। আনন্দে সে রাতে তাঁর ঘুমই এলো না। হঠাৎ মাঝ রাতে দেখেন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঠাকুর পায়চারি করছেন আর নিজের মনে কিসব বলছেন। তারপর রামনাম শোনাতে বললেন। তারক রাম-নাম গাইতে থাকেন। রাত শেষ হলো। বিদায় কালে সেই স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, আবার এসো। একলা এসো।

আসতে তো হবেই। লীলাসহচর তিনি ; না এসে কি উপায় আছে ? এরপর যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন তারকনাথ অকল্পিত কৃপালাভ করলেন ঠাকুরের। সেদিন হঠাৎ তাঁর বুকে পা তুলে দিয়ে দিব্যস্পর্শে তারককে কোন্ এক ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি রাজ্যে নিয়ে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ কাটে বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে। 'সেইদিন আমি ঠিক ঠিক অনুভব করেছিলাম যে আমি শাশ্বত চিরমুক্ত আত্মা আর ঠাকুর সেই সনাতন আদি কারণ ঈশ্বর, জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন।' আমরা অনুমান করতে পারি যে, সেদিন এই ধারণা আর এই বিশ্বাস নিয়েই তাঁর এই সন্তানটি ফিরে এসেছিলেন। সম্ভবত তাঁর তৃতীয় বা চতুর্থ দর্শনের পর রামকৃষ্ণ তাঁর অনন্য রীতি অনুসারে তারকনাথকে দীক্ষা প্রদান করে থাকবেন। তাঁকে পঞ্চবটী তলায় নিয়ে গিয়ে বলেন, জিভ্‌টা একবার বের কর দেখি। হতচকিত তারকনাথ তাই করলেন। তখন ঠাকুর দক্ষিণ হাতের তর্জনী দিয়ে বীজমন্ত্র লিখে দিলেন তারকের জিভের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে যুবক সমাধিপ্রাপ্ত হলেন—চলে গেলেন এক অজানা রাজ্যে। সমস্ত অন্তর এক দিব্যভাবের আবেশে পরম আনন্দে অভিভূত হলো। এসব কথা মহাপুরুষ নিজেই বলেছেন।

দিন যায়। দক্ষিণেশ্বর প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে থাকে তারকনাথকে। এখানকার নির্মল পরিবেশের মধ্যে আসামাত্রই কি এক দিব্যভাবে মন ভরে ওঠে। এখানকার আকাশে বাতাসে আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ সদা বিদ্যমান। ক্রমে ক্রমে তারকের অন্যান্য গুরুভাইরা—নরেন, রাখাল, বাবুরাম, কালীপ্রসাদ, যোগেন, নিরঞ্জন, লাটু, শরৎ, শশী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী ত্যাগী ছেলেরা একে একে দক্ষিণেশ্বরে যুগাবতারের কাছে সমবেত হতে থাকেন। তিনিও তাঁদের প্রত্যেককে প্রয়োজন মতো শিক্ষা দিয়ে তাঁদের ত্যাগী জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। যাঁর যেমন স্বভাব ও সংস্কার সেই অনুযায়ী উপদেশ দিতেন। ধর্ম জগতে এঁরা যুগান্তর আনবেন, সমাজজীবনে তরঙ্গ তুলবেন। সেই কাজের উপযোগী করে তাঁদের গড়ে তোলার জন্য শুধু শক্তি সঞ্চার করেই তিনি নিরস্ত ছিলেন না। অধিকন্তু, সত্য, সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি সবরকম আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁদের ভূষিত করতে তিনি নিরন্তর প্রয়াস পেতেন। তাঁদের তৈরি করার জন্য দেবমানবের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে তাঁরা রীতিমত বিস্মিত হতেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দক্ষিণেশ্বরে কি কঠোর তপস্যাই না তাঁদের প্রত্যেককে করতে হতো। হাতে হাতে এর ফলও তাঁরা পেতেন—নানা দেবদেবীর দিব্য দর্শন ও নানা প্রকার অনুভূতি লাভ হতো তাঁদের। তখন থেকেই এঁদের মধ্যে নিঃশব্দে গড়ে উঠেছিল একটা নিবিড় ভ্রাতৃভাব। উত্তরকালে একেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বিশাল সৌধ। এই সঙ্ঘের মাধ্যমেই তো আজ বিকশিত হয়ে উঠেছে যুগাবতারের বিশ্বরূপ।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গে কথামৃতকার লিখেছেন : 'বেলঘোরের তারক একজন বন্ধুসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। মাস্টার ও দুই একটি ভক্তও বসিয়া আছেন। তারক বিবাহ করিয়াছেন। বাপ মা

ঠাকুরের কাছে আসিতে দেন না। কলিকাতায় বৌবাজারের কাছে বাসা আছে, সেইখানেই আজকাল তারক প্রায়ই থাকেন। তারককে ঠাকুর বড় ভালবাসেন। তারক আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর তারককে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। আর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা কহিতেছেন। তারক অনেক কথা-বার্তার পর বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের প্রতি)—সাধু সাবধান! কামিনী-কাঞ্চন থেকে সাবধান! মেয়েমানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার জো নাই। বিশালাক্ষীর দং যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না! আর এখানে এক একবার আসবি।

'তারক—বাড়িতে আসতে দেয় না।

'শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখি তোর হাত দেখি।

'এই বলিয়া ঠাকুর তারকের হাত কত ভারী দেখিতেছেন। একটু পরে বলিতেছেন, একটু আড় আছে—কিন্তু ওটুকু যাবে। তাঁকে একটু প্রার্থনা করিস, আর এখানে এক-একবার আসিস। ওটুকু যাবে!

'তারক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।'[১]

ক্রমে রামকৃষ্ণের প্রতি তারকনাথের আকর্ষণটা তীব্র ও ঘনীভূত হয়ে উঠল। তাঁর শিক্ষায় ইতিমধ্যেই তিনি সন্ন্যাস-জীবনের কঠোরতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সংসারবন্ধন থেকে ভগবান তাঁকে বিনির্মুক্ত করবেন—এই ছিল তখন তারকনাথের দিবারাত্রির চিন্তা ও প্রার্থনা। অন্তর্মুখিনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম বন্ধন ছিন্ন হয় নিত্যকালীর মৃত্যুতে। স্ত্রীর পারলৌকিক ক্রিয়া যথারীতি

১. কথামৃত (৩য়)

সম্পন্ন করলেন। তারপর চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন। সম্ভবত ১৮৮৩ সালের শেষভাগে স্ত্রীবিয়োগের পর তারকনাথ চাকরি ত্যাগ করেন ও বারাসতে গিয়ে পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চলে যান। কথিত আছে, রামকানাই ছেলের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন: 'তোমার ভগবান লাভ হোক।' সাধক পিতার এই আশীর্বাদ তাঁর পুত্রের জীবনে নিস্ফল হয়নি। তখন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত তারকনাথ, তাঁর অন্যান্য গুরুভাইদের মতো, ইষ্টদেবের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁর শিক্ষার ফলে অধ্যাত্ম জীবনের পথে অনেকখানি অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'ঠাকুরের স্পর্শ ও ইচ্ছায় তাঁর জীবিতকালেই আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তিন-তিনবার সমাধির অভিজ্ঞতা লাভ করার।'—এই কথা মহাপুরুষ নিজেই বলেছেন।

চিকিৎসার জন্য রামকৃষ্ণদেবকে যখন কলকাতার শ্যামপুকুর থেকে কাশীপুর বাগান বাড়িতে আনা হয় তখন তাঁর সেবা-শুশ্রূষার কাজে নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, কালীপ্রসাদ প্রমুখ অনেকেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন ও তাঁরা ঘর-সংসার ছেড়ে এখানেই অবস্থান করতেন। তারকনাথ মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখে যেতেন, কারণ আর সকলের মতো হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে কাশীপুরের বাগানে এসে থাকার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ঠাকুরের মনের কিন্তু ইচ্ছা তিনিও এখানে থাকেন, তবে মুখ ফুটে বলেন নি। লীলা সম্বরণ আসন্ন জেনেই, সন্তানদের প্রত্যেককে তিনি তাঁর কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অবগত হয়ে নরেন্দ্রনাথ একদিন মহাপুরুষকে বলেছিলেন: 'তারকদা, আর কেন? এখানে এসে ঠাকুরের সেবায় জীবন সার্থক করুন।' নরেন্দ্রনাথের কথা তিনি এড়াতে পারেন নি।

১৮৮৬, আগস্ট মাস। রামকৃষ্ণ লীলা সংবরণ করলেন। তখন

থেকে তারকনাথের জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। শাস্ত্র সম্মত সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নবজন্ম হলো স্বামী শিবানন্দরূপে। শিবের বরে তাঁর জন্ম, স্বভাবটা ছিল শিবের মতো—তাই বুঝি নতুন নামকরণ হলো শিবানন্দ। নরেন্দ্রনাথ ও রাখালচন্দ্রের মতো শুরু হয় তাঁর পরিব্রাজক জীবন। কিছুকাল বরাহনগর মঠে বাসের পর রামকৃষ্ণ-সন্তানদের অনেকেই এদিকে-সেদিকে তীর্থভ্রমণে বের হতে থাকেন। হিন্দু ভারতের যুগযুগান্তরের ইতিহাসে সে এক নতুন দৃশ্য। রামকৃষ্ণনামের পতাকাধারী একদল শিক্ষিত বাঙালী যুবক ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। সাধুসন্তের সমাজে তাঁদের আবির্ভাব একটা নতুন তরঙ্গ তুলেছিল; সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তো এই গৈরিকধারী নবীন সন্ন্যাসীদের আচরণ দেখে, তাঁদের মুখের কথা শুনে, তাঁদের ধর্মালোচনার ভঙ্গি দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়।

মহাপুরুষের প্রথম পর্যায়ের তীর্থভ্রমণ ছিল উত্তরাখণ্ড-কেদারবদরী। কথিত আছে, কেদারনাথে শ্রীবিগ্রহদর্শনে ভাবে বিহ্বল মহাপুরুষ দু'হাতে দিয়ে বিগ্রহকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই এই অপূর্ব দৃশ্য সন্দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন। অতঃপর ১৮৯১ সালের শেষভাগে তিনি দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলি একে একে পরিভ্রমণ করেন। তিনি যখন তীর্থভ্রমণ শেষ করে প্রত্যাবর্তন করেন তখন মঠ বরাহনগর থেকে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফিরে এসে তাঁর পিতার মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে একবার জন্মস্থানে গেলেন; সেখানে পিতার শ্মশানে গড়াগড়ি দিয়ে অশ্রুজলে শেষ তর্পণ করলেন। দুটি তীর্থস্থান—কামারপুকুর ও জয়রামবাটি—দর্শন করা তখনো বাকী ছিল। গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মহাপুরুষ প্রথমে শ্রীমায়ের জন্মস্থান সন্দর্শনে গেলেন। এখানে তাঁরা একদিন রেঁধে মাকে খাওয়ালেন; সারদাদেবী সেদিন তাঁর

সন্তানের হাতে অন্নগ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হলেন। সেখান থেকে কামারপুকুর দর্শনান্তে তাঁরা আলমবাজার মঠে ফিরে এলেন। এরপর তিনি আরো তিনবার—১৮৯২, ১৮৯৩ ও ১৮৯৫—তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। বস্তুত গুরুভাইদের মধ্যে মহাপুরুষের মতো আর কারো তীর্থদর্শনের এমন প্রবল বাসনা ছিল না, আর তাঁর মতো এত অধিক সংখ্যক তীর্থদর্শনও কেউ বড় একটা করেন নি।

তীর্থ ভ্রমণের সঙ্গে চলতো তাঁর তপস্যা। সে তপস্যা ছিল একাগ্র ও ঐকান্তিক। 'এমন অনেক সময় গেছে যখন একখানা কাপড়ের বেশী সঙ্গে থাকত না। কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুয়ে।' একথা তিনি নিজেই বলেছেন। সুগঠিত দেহ আর অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই তীর্থভ্রমণের ক্লেশ তাঁকে কখনো দমাতে পারত না। স্বচ্ছন্দে কত পাহাড়-পর্বত ঘুরে বেড়িয়েছেন, কত কঠোরতা করেছেন। এসব কথা আজ যখন আমরা চিন্তা করি তখন বুঝতে পারি রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ কী ধাতু দিয়ে তৈরী ছিলেন। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই তপস্যা ও তীর্থ-ভ্রমণের সঙ্গে ছিল আড়ম্বরহীন প্রচার, যার প্রশংসায় আমেরিকা থেকে একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন : 'তারকদা চমৎকার কাজ করিতেছেন—সাবাস! এইতো চাই।'[১]

পাশ্চাত্য দেশ জয় করে স্বামীজি স্বদেশে ফিরবেন। মঠের গুরুভাইদের প্রাণে জেগেছে বিপুল আনন্দ। কিন্তু একজনের মধ্যে আনন্দের মাত্রাটা একটু বেশী দেখা গিয়েছিল। তিনি স্বামী শিবানন্দ। তাঁর প্রিয়তম গুরুভ্রাতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি এতদূর অস্থির হয়েছিলেন যে তিনি মাদুরায় গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেখান থেকে দুজনে একসঙ্গে কলকাতায় ফিরলেন। সিংহলে প্রচার কার্যের দরকার। তখন স্বামীজির নির্দেশে মহাপুরুষ সিংহলে চলে গেলেন বেদান্ত প্রচার করতে। সাত-আট মাস সেখানে

১. পত্রাবলী (১৪)

সাফল্যের সঙ্গে বেদান্ত প্রচার করে এবং বেদান্তের একটি কেন্দ্র স্থাপন করে তিনি যখন ফিরলেন মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জির বাগানে উঠে এসেছে। অতঃপর (১৯০২, জুন মাস) স্বামীজির নির্দেশে মহাপুরুষ এলেন কাশীতে বেদান্ত প্রচার করতে। এখানে তাঁর অক্ষয়কীর্তি: 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম'। যেদিন আশ্রমটি স্থাপিত হয় সেই দিনটি—সেই ৪ জুলাই—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ। ঐ দিন বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধিলাভ করেন। পরের দিন তারযোগে মহাপুরুষ পেলেন সেই মর্মন্তুদ সংবাদ। হৃদয় শোকে ভারাক্রান্ত হলেও নেতার নির্দেশ পালন করতে তিনি কাশীতে থেকে গেলেন।

১৯১০, ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টোর পত্নী লেডি মিণ্টো বেলুড়মঠ দর্শনে এসেছেন। মঠের পক্ষ থেকে শিবানন্দ অভ্যর্থনা করলেন। কথা প্রসঙ্গে লেডি মিণ্টো জিজ্ঞাসা করেন, এই সঙ্ঘ কি প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপন করেন? অমনি শিবানন্দ সংশোধন করে, লাট-পত্নীকে বলেছিলেন: 'No, it is not Swamiji or any other disciple who is responsible for it. It is Sri Ramakrishna himself who initiated the Order during his last illness at Cossipore'. এই ঘটনাটি উল্লেখ করার একটি কারণ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলার পূর্ণ তাৎপর্য একমাত্র বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। স্বামী শিবানন্দও যে এই বিষয়ে অনেকখানি অবহিত ছিলেন, সেটি আমরা তাঁর এই উক্তিটি থেকে বুঝতে পারি।

১৯০২ থেকে পরবর্তী সাত বৎসর তিনি কাশীতেই ছিলেন এবং এই সময়টি ছিল মহাপুরুষের জীবনের একটি গৌরবময় অধ্যায়। কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম একটি আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই শিবানন্দের আধ্যাত্মিক-ভাবে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হন এবং তাঁর কাছে যাওয়া-

আসা করতে থাকেন। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তিনি একটি কথাও বলতেন না। সর্বদা নীরব, নিস্তব্ধ সেই আশ্রমের পরিবেশ দিনরাত যেন ধ্যানমগ্ন ও ভাবতন্ময়। ১৯১০ সালের আগস্ট মাসে তিনি মঠের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হন। তখন তাঁকে কাশী ত্যাগ করে বেলুড়ে চলে আসতে হয়। আলমোড়াতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন এর পাঁচ বছর পরের ঘটনা। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাপ্রয়াণের পর, ১৯২২, ২রা মে তিনি মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। শুরু হয় তাঁর জীবনে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। সঙ্ঘনেতা হিসাবে শিবানন্দের জীবনের পরিধি ছিল বারো বছর।

প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত হওয়ার পর ১৯২৪ সালে তিনি দীর্ঘ দশ-মাসের অধিককাল অক্লান্তভাবে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন আদর্শ ও বাণী যেভাবে প্রচার করেছিলেন সঙ্ঘের ইতিহাসে তা একটি উজ্জ্বল অধ্যায় বললেই হয়। এই সময়ে তিনি উটকামণ্ড, বোম্বাই ও নাগপুর—এই তিনটি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত তিনটি নতুন আশ্রমের শিলান্যাস করেন। মাদ্রাজে মিশন পরিকল্পিত একটি শিল্পবিদ্যালয়েরও শিলান্যাস করেন। মিশনের বাঙ্গালোর কেন্দ্রটি স্বামী ব্রহ্মানন্দ থাকতেই স্থাপিত হয়েছিল। মহাপুরুষ প্রায় সাড়ে চার মাস কাল এখানকার আশ্রমে অবস্থান করেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে বহু নরনারী তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে ধর্মোপদেশ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণালাভে প্রকৃত ধর্মের যথার্থ সন্ধান পেয়ে জীবন ধন্য করেছিলেন। সর্বত্রই এই দেব-মানবের প্রশান্ত ভাব-তন্ময় সৌম্য মূর্তি দর্শনে সকলের প্রাণে ধর্মভাব ও প্রেরণা জাগিয়ে দিত। তেমনি যুবকদের ত্যাগের মন্ত্রে আর গৃহীভক্তদের ভক্তিভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন তিনি। তিনি যখন মাদ্রাজে তখন সেখানে ভীষণ বন্যা দেখা দিয়েছিল। কাবেরী নদীর জল অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়ার ফলেই এই বন্যার উদ্ভব হয়। বন্যার সংবাদে মহাপুরুষের অন্তর করুণায় বিগলিত হলো।

অমনি তাঁর নির্দেশে অবিলম্বে রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ কেন্দ্র থেকে বন্যার্তদের জন্য শুরু হয় রিলিফের কাজ। দক্ষিণ ভারতে মিশনের ঐ জাতীয় আর্তত্রাণ সেবা কাজ প্রথম। শিবজ্ঞানে জীব সেবা দক্ষিণভারতের প্রতিটি মানুষের অন্তরে সেদিন একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করেছিল।[১]

তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজে বৃত হইয়াও শিবানন্দ বলিতেন, ভরত যেমন বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজকার্য পরিচালনা করিতেন, তিনিও সেইরূপ রাজা মহারাজের পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া সঙ্ঘের সকল কার্য পরিচালনা করিতেছেন। কি অদ্ভুত নিরভিমানিতা! কি আশ্চর্য শ্রদ্ধা ও প্রীতি! প্রশান্ত চিত্ত, শান্তরজো বৃত্তি, আত্মরতি, নিষ্পাপ, সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি সম্পন্ন, জীবন্মুক্ত যোগী শিবানন্দ তাঁহার সংঘ পরিচালনাকার্য বিস্ময়করভাবে শুরু করিলেন।'[২]

তাঁর জীবনের শেষ বারো বছরের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করা অসম্ভব। সাধক শিবানন্দ সংঘ নেতারূপে এক নতুন মূর্তিতে মঠের সকলের কাছে প্রতিভাত হতেন। সেই বয়সে (তখন তাঁর বয়স আটষট্টি বছর) তাঁর যৌবনসুলভ কর্মোদ্যম দেখে সকলে অবাক হতো। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্টরূপে তাঁকে সেই বয়সে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়েছে, বিভিন্ন কেন্দ্রের কাজের তত্ত্বাবধান করতে হয়েছে, আবার অনেক নতুন কেন্দ্র তাঁর শুভ প্রেরণায় আরম্ভ হয়েছিল। একরকম শ্রান্তিহীনভাবেই তাঁকে এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হতো। সর্বত্রই বহু লোকের সংস্পর্শে এসে তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতেন। বস্তুত স্বামী ব্রহ্মানন্দের আপ্রাণ চেষ্টায় যে সংঘজীবন সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও

---

১. A MAN OF GOD : Swami Vividishananda.

২. মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ : সদাশিবানন্দ।

দৃঢ়মূল হয়েছিল তা মহাপুরুষের ঐকান্তিক প্রয়াসে শুধু যে প্রসারিত হয়েছিল তা নয়, স্বামীজির জননারায়ণের অশেষ কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছিল।

মঠাধ্যক্ষ হিসাবে মহাপুরুষের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজের পরিচয় এখানে দেওয়া হলো। ১৯২৪, ২৮ জানুআরি বেলুড়মঠে সর্বজনসমক্ষে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সমাধিস্থলে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেন এবং ৭ ফেব্রুআরি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সমাধি-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৯২৫, জানুআরি মাসে বোম্বাই শহরে নিজস্ব ভূমিতে রামকৃষ্ণ আশ্রমের শিলান্যাস করেন। প্রত্যাবর্তনকালে নাগপুরে অনুরূপ একটি আশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিতে শিলান্যাস করেন। ১৯২৬ সালে দেওঘরে রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের নবনির্মিত ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই বছরটি মিশনের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বভারতীয় সম্মেলনের (All India Convention) জন্য। এই জাতীয় অনুষ্ঠান সেই প্রথম। তিনি এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ; বেলুড় মঠের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনেই এই মহাসম্মেলন হয়েছিল।

শেষের ছয় বছর মহাপুরুষ তাঁর শরীরকে যুগধর্মপ্রচারের যন্ত্র-স্বরূপ করেছিলেন। অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ তাঁর শেষ কয়টি বছর বড়ই মধুর। সকলের মনে বিশ্বাসের পূর্ণঘট স্থাপন করে সর্বদা বলতেন : 'প্রভুর তৈরি এই সংঘ ; এর কাজ বহু শতাব্দী ধরে চলবে।' ১৯২৯, ১৩ মার্চ রামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথিতে তাঁর দুজন গুরুভ্রাতার (স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) অনুপস্থিতিতে নতুন বেলুড় মন্দিরের শিলান্যাস করেন। জীবনের প্রথম আটষট্টি বছর ঈশ্বরানুসন্ধান, তীর্থভ্রমণ, ত্যাগবৈরাগ্য ও কঠোর তপস্যায় এবং অশেষ অধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধিতে কেটেছিল তাঁর। শেষ বারো বছর সংঘের যোগ্য সর্বাধিনায়ক রূপে কাটিয়েছিলেন তিনি।

ভক্তি, কর্ম, যোগ ও জ্ঞান সমন্বয়ের আলোকবর্তিকা দ্বারা সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন তিনি. আর সর্বক্ষণ নিখিল মানবের কল্যান চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। ১৯৩৪, ১৫ ফেব্রুআরি ঠাকুরের তিথিপূজা সম্পন্ন হলো। এর পাঁচদিন পরে (২০ ফেব্রুআরি) অপরাহ্নে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহাপ্রয়াণ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায় যে, মহাসমাধিলাভের সেই দিব্য মুহূর্তে তাঁর মুখখানি এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। বিশাল রামকৃষ্ণ সংঘের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিৎভাবেই সেই জ্যোতির আলোয় ভাস্বর হয়ে থাকবে।

স্বামী সারদানন্দ

'চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।'

তেমনি রামকৃষ্ণলীলার ব্যাস হলেন তাঁর অন্যতম মানস সন্তান শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, উত্তর কালে যিনি সঙ্ঘে স্বামী সারদানন্দ নামে পূজিত হয়েছেন। আবার তিনিই ছিলেন সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর গণেশ। উমার গণেশের মতো তিনি সর্বদা মায়ের কাছে কাছে থাকতেন; মায়ের সেবাতেই তিনি নিজ দেহ মনপ্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। এই জন্যই স্বামীজি মায়ের নামে তাঁর এই গুরুভ্রাতার নাম রেখেছিলেন 'সারদানন্দ'। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, 'শশী আর শরৎকে দেখেছিলাম ঋষি কৃষ্ণের দলে।'[১] ঠাকুর যীশুখ্রীষ্টকে ঋষি কৃষ্ণ বলে উল্লেখ করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'আদর্শপুরুষ তিনিই যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন।...যানবাহন-মুখরিত মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার মন শান্ত থাকে, যেন তিনি নিঃশব্দ গুহায় রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার মন তীব্রভাবে কর্ম করিতেছে; ইহাই কর্মযোগের আদর্শ।'[২]

এই কর্মযোগীর আদর্শ সারদানন্দের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। শত কাজ ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও দেখা যেত তিনি ধীরস্থির ও শান্ত, কর্মকোলাহলপূর্ণ এই মহানগরীর বাগবাজার পল্লীতে অবস্থান

১. কথামৃত (৩য়)

২. কর্মযোগ: স্বামী বিবেকানন্দ।

করলেও মনে হতো সত্যিই তিনি মরুভূমির অন্তহীন নিস্তব্ধতা উপভোগ করছেন, আবার যখন কর্মবিরত অবস্থায় শান্তভাবে বসে থাকতেন উদ্বোধনের একতলার সেই ঘরটিতে তখনো মনে হতো শুধু মঠ-মিশন কেন, তিনি বুঝি বহুজনের কল্যাণ চিন্তায় নিমগ্ন। গীতায় কর্মযোগীর যে চিত্র আমরা পাই, স্বামী সারদানন্দের মধ্যে ঠিক সেইরূপ একজন কর্মযোগীকে দেখা যেত। ব্রহ্মানন্দ ও শিবানন্দের জীবিতকালেই মঠ-মিশনের সকল কাজই তাঁকে দেখতে হতো। অনলস ও অতন্দ্র কর্মীরূপে তিনি সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেন। বস্তুত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে স্বামী সারদানন্দের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের ঘোরে সহসা এক যুবকের কোলে কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে যান। পরে তিনি এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে ভক্তদের বলতেন, আমি পরীক্ষা করে দেখছিলাম ও কতখানি ভার সইতে পারে। এই যুবক আর কেউ নন, শরৎচন্দ্র। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেক্রেটারিরূপে তাঁকে যে বিরাট বোঝা বহন করতে হয়েছিল সেজন্য অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল। তাঁর ইষ্টদেবের ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস আর ছিল সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মানসিক প্রশান্তি। তাই তো সব সময় তাঁকে বলতে শোনা যেত, ঠাকুরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা একটু ধৈর্য ধরো। এই ছিল তাঁর জীবন ব্রত। এক-আধ বছর নয়, জীবনের সুদীর্ঘ ত্রিশটি বছর তিনি এই ভার বহন করে এই ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। যখন বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়, তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, শরৎ, মঠের ভার তুমি বহন করবে, তোমার ওপর আমার এই আদেশ রইল।

সেই আদেশ স্বামী সারদানন্দ কিভাবে পালন করেছিলেন তা মিশনের ইতিহাসে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সারদানন্দের

জীবন সত্যিই এক নিরলস কর্মীর জীবন। কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে এক বিত্তবান গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও শাক্ত পরিবারে ১৮৬৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। শনিবারের সন্ধ্যায় তাঁর জন্ম; নবজাতকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাই পরিবারের অনেকের মনে একটা আশঙ্কা জেগেছিল। শনিবারের বারবেলায় জন্মেছে, কে জানে, ছেলেটার মতিগতি কি হয়। তাঁর এক কাকা ছিলেন জ্যোতিষী; শিশুর জন্মপত্রিকা গণনা করে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এই জাতক বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। তিনটি মেয়ের পরে শরৎচন্দ্র তাঁর পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্রের পিতামহ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন; পিতা গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী একটি ওষুধের দোকানের অংশীদার ছিলেন। বহু অর্থ উপার্জন করেন। তিনি যেমন ধার্মিক তেমনি নিষ্ঠাবান ছিলেন। নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনা, পূজা-পাঠ ও জপধ্যানে তাঁর একটি দিনের জন্যও অবহেলা দেখা যেত না। শরৎচন্দ্রের মা নীলমণি দেবীও ধর্মপ্রাণা ও ভক্তিমতী ছিলেন। এমন ধর্মপরায়ণ দম্পতির সংসারে যে একটি ধার্মিক পুত্রের আবির্ভাব ঘটবে, এটাই তো শাস্ত্রের চিরন্তন বিধান। এইখানে উল্লেখ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ষোলটি মানসপুত্রের মধ্যে শরৎ ও শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ছিলেন এক পরিবারের না হলেও একই বংশের দুই ভাই। শরৎচন্দ্রের পিতা ও শশীর পিতা দুজনে খুড়তুতো সহোদর ছিলেন। শরৎ শশীর চেয়ে বয়সে একটু ছোট ছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই শরতের প্রকৃতি খুব শান্ত ছিল—তাঁর মধ্যে শৈশব-চাপল্য কোনোদিন পরিলক্ষিত হয় নি। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: 'স্বগৃহে শান্ত স্বভাব ও ধর্মপ্রাণতা একত্রে মিলিত হইয়া শরৎচন্দ্রের বাল্যকালকে বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। জননী যখন গৃহদেবতার পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন, কিশোর শরৎ তখন পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত

দেব-দেবীর স্তোত্রাদি তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিতেন। পূজাপাঠে সন্তানের আগ্রহ দর্শনে স্নেহময়ী জননী তাঁহাকে পূজার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শরৎ ঐ সমস্ত পাইয়া ক্রীড়া ভুলিয়া দেবারাধনায় নিবৃত হইলেন। অবশেষে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে উপনয়নের পর যখন গৃহদেবতার অর্চনার অধিকার পাইলেন, তখন তিনি অতি আগ্রহ সহকারে বিধিপূর্বক নিয়মিত পূজাপাঠ ও জপ ধ্যানে মগ্ন হইলেন।'[১]

পাঠশালার পড়া শেষ হলে তাঁকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। খুব মেধাবী ও মনোযোগী ছাত্র ছিলেন তিনি; প্রায় পরীক্ষাতে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। স্কুলের 'ডিবেটিং' (আলোচনা) সভায় যোগদান করতেন এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তেমনি ব্যায়ামে ছিল তাঁর বিশেষ অনুরক্তি এবং এর ফলে তিনি সুগঠিত দেহের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ—তাঁর সকল গুরুভ্রাতাই সুগঠিত দেহের অধিকারী ছিলেন এবং শরীরচর্চাকে তাঁরা অধ্যাত্মজীবনের পথে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করতেন। 'শরীরমাদ্যংখলু ধর্মসাধনং' —এই শাস্ত্রবাক্য তাঁরা বিশ্বাস করতেন।

বাল্যকালে শরতের মধ্যে পরোপকার বৃত্তি লক্ষ্য করে তাঁর অভিভাবক এবং প্রতিবেশিরা মুগ্ধ হতেন। গরীব-দুখীর জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদত। পাঠশালার পয়সা বাঁচিয়ে তিনি গরীব ছাত্রদের সাহায্য করতেন। সেবার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই তাঁর জন্ম। এই বিষয়ে তাঁর শৈশবজীবনের একটি ঘটনা তাঁর এক জীবনীকার এইভাবে উল্লেখ করেছেন: 'একদা জনৈক প্রতিবেশীর বাটিতে একটি পরিচারিকা কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। তখন গৃহকর্তা পরিবারের অন্যান্যদের নিরাপত্তার জন্য উক্ত পরিচারিকাটিকে বাটির আনাবৃত ছাদের এক ধারে বিনা চিকিৎসায় রাখিয়া দেন। ইহা শুনিবামাত্র

---

১. ভক্তমালিকা: স্বামী সারদানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ।

কোমলচিত্ত কিশোর শরৎচন্দ্র এক বন্ধুর সাহায্যে রোগিনীর সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাহার প্রাণরক্ষা হইল না। গৃহকর্তা সংকারের কোন ব্যবস্থা করিলেন না। তাঁর এই নিষ্ঠুরতা দেখিয়া তিনি যারপরনাই ব্যথিত হইয়াছিলেন। কয়েকজন পেশাদার শবদাহকারীকে ডাকিয়া আনিলেন ও চাঁদা তুলিয়া মৃতসংকারের সকল রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।'[১] তাঁর শৈশবজীবনে এমন ঘটনা অনেক আছে। উত্তরকালে আর্ত ও দরিদ্রের সেবায় যিনি আত্মনিয়োগ করে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন, তার সূচনা তাঁর জীবনপ্রভাতেই দেখা গিয়েছিল।

১৮৮২। শরৎচন্দ্র হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে কলা-বিভাগে ভর্তি হলেন। কলেজের অধ্যক্ষ নবাগত ছাত্র শরৎচন্দ্রের ধর্মভাব লক্ষ্য করে তাঁকে যত্নের সঙ্গে বাইবেল পড়াতে থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন দেশের তরুণচিত্তে ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের বিলক্ষণ প্রভাব। মহানগরীর শিক্ষিত যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া-আসা করতেন। এককথায় তখন চলছিল ব্রাহ্মসমাজের যুগ। বাইবেল-পড়া আর সমাজে যাওয়া-আসা দুটোকেই আমরা যুগপ্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল বলে গণ্য করতে পারি। এই যুগপ্রভাবটা তাঁর গুরুভাই বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও শিবানন্দের জীবনেও আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু বাঙালী সৌভাগ্যক্রমে বাইবেল পড়ে এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেও এঁদের কেউই স্বধর্মে আস্থাশূন্য হননি। আমরা বলতে পারি, তাঁদের স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাব এই ক্ষেত্রে পরোক্ষে সহায়ক হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবন ও বাগ্মীতা এঁদের প্রত্যেকের জীবনেই রেখাপাত করেছিল।

১. স্বামী সারদানন্দ : দ্রঃ অক্ষয়চৈতন্য

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতার ধর্মানুরাগী ও শিক্ষিত যুবকগণ যখন দক্ষিণেশ্বর বা রামকৃষ্ণের নাম বিশেষ জানত না, তখন নব জীবনবেদের উদ্‌গাতা কেশবচন্দ্রই জনসমাজে এই মহাপুরুষের কথা জনসাধরণের কাছে প্রথম প্রচার করেছিলেন। ঊনবিংশের শেষভাগে বাংলার তরুণদের সামনে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্তটা যদি না থাকত আর সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং'-এই ধ্বনি তরুণদের হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হয়ে যদি ধর্মভাব জাগ্রত না করত, তাহলে নবজাগরণ কতটা সার্থক হতো তা বলা যায় না। অন্যের কথা থাক, স্বয়ং রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন এবং তাঁর গৃহে এসে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক উত্তাপের স্পর্শটা রামকৃষ্ণ-সন্তানদের কয়েকজনের জীবনে বৃথা হয়নি—এই কথা আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই বলতে পারি।

কলেজে পড়ার সময় শরৎ অন্যান্য জনহিতকর কাজেও উৎসাহ দেখাতেন। কয়েকজন সহপাঠীকে নিয়ে তিনি পাড়ায় একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন। ধর্ম-চর্চা, দরিদ্র-সেবা আর শরীরচর্চা —এই ছিল সমিতির কাজ। সমিতির নেতা ছিলেন তিনি এবং এর যাবতীয় কাজকর্ম তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত হতো। কথিত আছে, সমিতির প্রথম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হওয়ার পর শরৎচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখন ঘটনাক্রমে তিনি ঐখানে রামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেন। কিন্তু সে শুধু দর্শনই, তার বেশি কিছু ছিল না। তখন তাঁর ভাবী ইষ্টদেবের মহিমার কথা তাঁর কিছুই জানা ছিল না, তাই ঐ দর্শন রামকৃষ্ণের এই ভাবী সন্তানটির মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে নি।

১৮৮৩। অক্টোবর মাসের কোন একদিনের ঘটনা। শরৎচন্দ্র তাঁর ভাই শশী ও কয়েকজন সমবয়স্কের সঙ্গে এলেন দক্ষিণেশ্বরে যুগাবতারের সমীপে। তিনি ছেলেদের বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে

কিছু উপদেশ প্রদান করলেন। তাঁরা কৃতার্থ হলেন। আমরা অনুমান করতে পারি, সেই অমৃত বাণী সমাগত ঐ ছেলেদের, বিশেষ করে শশী ও শরতের—মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। দুই ভাইয়ের ধর্মজীবনে এলো পরিবর্তন। এ পরিবর্তন ছিল ইতিহাসেরই অভিপ্রেত। সাপুড়িয়া যেমন বাঁশী বাজিয়ে আর মন্ত্রবলে দূরবর্তী স্থান থেকে সাপদের টেনে নিয়ে আসে তার কাছে, দক্ষিণেশ্বরের মহান্ সাপুড়িয়াটিও তেমনি তাঁর ভাবী সন্তানদের একে একে টেনে এনেছিলেন তাঁর কাছে। রামকৃষ্ণের সপ্রেম ব্যবহারটা শশী ও শরতের ক্ষেত্রে যেন মন্ত্রবৎ কার্য করেছিল। দুই ভাই দুই বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ছিলেন ; কাজেই তাঁদের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার সুযোগটা ঠিক একই সময়ে হতো না। তাই দুজন পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই ওখানে যাওয়া আসা করতে আরম্ভ করে দিলেন। শরতের কলেজ প্রতি বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকত। কাজেই বিশেষ কোন বাধা না এলে তিনি ঐ দিনই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন।

দিন যায়। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আসা করেন শরৎ অবসর পেলেই। তাঁর সকল চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু তখন হয়ে উঠেছেন রামকৃষ্ণ। তাঁর জগৎ হয়ে উঠেছে রামকৃষ্ণময়। এখানকার আকাশ-বাতাসে যেন সর্বক্ষণ আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গ বইছে। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর কাছে পবিত্র বলে গণ্য। যখন ঠাকুরের ঘরে তাঁর পায়ের তলায় বসে থাকেন তখন ভক্ত-পরিবৃত রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে যেসব উপদেশামৃত অনর্গল বেরিয়ে আসত তা তিনি বিমুগ্ধচিত্তে পান করতেন। কখনো কখনো ভাবাবিষ্ট হয়ে যা বলতেন তার সব যে বুঝতেন, তা নয়। তবে প্রতিটি কথা যেন হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যেত। দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে, রাত্রিবেলায় ঘুমোবার আগে তিনি একটু অন্তর্মুখীন হয়ে ঠাকুরের কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে নতুন করে আলোচনা করতেন :

'ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়।'

'তাঁর ওপর ভালবাসা এলে পাপ টাপ সব পালিয়ে যায়, সূর্যের তাপে যেমন মেঠো পুকুরের জল শুকিয়ে যায়।'

'সত্ত্বগুণই কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়া, ধর্ম, ভক্তি এসব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ ; তারপরেই ছাদ।'

'মানুষের স্বধাম হচ্ছে পর ব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।'

'সব দেখছি কলাইয়ের ডালের খদ্দের। কামিনীকাঞ্চন ছাড়তে চায়না। লোকে ঐশ্বর্য দেখলে ভুলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপ দর্শন করলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়।'

'ঈশ্বর দর্শনই মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য।'

এই সব উপদেশ আলোচনা করতে করতে কখন যে শরৎচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়তেন তা তিনি জানতে পরেতেন না। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘুমের মধ্যেও ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীগুলি যেন তাঁর অবচেতন মনে জ্বল্ জ্বল্ করতো। তারপর সকালবেলায় যখন তিনি ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তাঁর চারদিকের পরিবেশ চৈতন্যময় হয়ে উঠতো ; তিনি রামকৃষ্ণকে স্মরণ করে এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব করতেন।

একদিন। সেদিন কলেজ বন্ধ ছিল। খুব সকাল-সকাল এসেছেন শরৎ। পরদিনও কলেজ বন্ধ। এতদিন যাতায়াত করছেন, একবারও রাত্রিবাস হয়নি তাঁর এই তীর্থে। সেদিন তিনি মনের মধ্যে এই ইচ্ছা নিয়েই এসেছিলেন। ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করতেই তিনি প্রসন্ন মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ রাতটা এখানে থেকে যা। রাতে লুচি-সন্দেশ প্রসাদ পাবি। এই কথা শুনে শরৎচন্দ্রের মনে আনন্দ আর ধরে না। ঠাকুর কি অন্তর্যামী? তিনি যেন আকাশের চাঁদ পেলেন হাতে। পশ্চিমের বারান্দার এককোণে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো। রাত তখন

গভীর। ঘুমিয়ে আছেন শরৎ। কে যেন কাছে এসে গায়ে ঠেলা দিয়ে বলছেন: যা, পঞ্চবটী, বেলতলা বা মায়ের নাট মন্দিরে গিয়ে একটু ধ্যান করগে। শরৎ কৃতার্থ মনে করলেন নিজেকে তাঁর প্রতি ঠাকুরের এই অহেতুক কৃপা দেখে। সুযোগ পেয়ে বললেন: ধ্যান করব কি, মনটা যে কিছুতেই স্থির হয় না।

—স্থির হয় না?

তৎক্ষণাৎ ডান হাতের তর্জনীর নখ দিয়ে আঘাত করলেন ঠাকুর তাঁর ভাবী সন্তানের ভ্রূদুটির মধ্যে। বললেন: এইখানে মনকে ধারণ করবি। সেই পুণ্যস্পর্শে অঘটন ঘটে গেল—মুহূর্তমধ্যে শরতের ভ্রূদ্বটির মাঝখানে তাঁর মন অচঞ্চল দীপশিখার মতো স্থির হয়ে গেল। তাঁর জীবনে সে এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা।

কিছুদিন পরের কথা। একদিন বিকালবেলায় হেদুয়ার ধারে নিরিবিলি একটি স্থানে বসে দুই ভাইয়ের মধ্যে এই রকম কথোপ-কথন হচ্ছিল। দুজনেই কলেজের ছুটির পরে এসেছেন। প্রায়ই তাঁরা আসেন এখানে, তবে দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎটা ক্বচিৎ ঘটতো। যখন সেটা ঘটতো তখন তাঁদের মধ্যে আলোচনার বিষয় থাকত একটিই—দক্ষিণেশ্বর ও রামকৃষ্ণ। সেদিনও এর ব্যতিক্রম হলো না।

শরৎ। শশীদা, দক্ষিণেশ্বর জায়গাটা তোমার যেন কেমন মনে হয়?

শশী। সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতুল্য স্থান।

শরৎ। আর শ্রীরামকৃষ্ণকে কি মনে হয়?

শশী। নরশরীরে মূর্ত বেদ, বেদান্ত ও তন্ত্র। তিনি প্রেম-স্বরূপ। সেখান থেকে আমি নতুন জীবন, নতুন আলো আর নতুন ভাব নিয়ে ফিরে এসেছি। এইবার ওখানকার সম্বন্ধে বলো তোমার অভিজ্ঞতার কথা।

শরৎ। আমার তো এর মধ্যে ওখানে তিন-চার রাত্রি বাস করা হয়ে গেছে। উনিই কৃপা করে রাত্রিবাসের কথা বলেছিলেন।

শশী। এই রাত্রিবাসের ফল কিছু পেয়েছ?

শরৎ। হ্যাঁ। আগে যখন ঈশ্বরচিন্তায় বসতাম তখন কিছুতেই মনটাকে স্থির করতে পারতাম না। গীতায় অর্জুনের সেই আক্ষেপ—চঞ্চলো হি মনোকৃষ্ণ—আমার জীবনে বিলক্ষণ ছিল। এখন ওঁর কৃপায় জপ করতে বসলেই মন স্থির হয়।

শশী। তখন কি করো?

শরৎ। যতক্ষণ মনটা বহির্মুখে আসবার জন্য উদ্যত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ভাবঘন মূর্তিকে ধ্যান করি।

শশী। ওখানে একজনকে দেখেছ—নরেন দত্তকে? শিমুলিয়ার বিখ্যাত এ্যাটর্ণি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে। জেনারেল য়্যাসেমব্লির ছাত্র তিনি।

শরৎ। হ্যাঁ। তবে এখনো পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় তেমন হয় নি। ঠাকুরের কাছে যখন আসেন, দেখেছি, তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি কেমন যেন হয়ে যান; আর কত তার প্রশংসা করেন। মনে হয় নরেন ওঁর খুব আপনজন।

কথাবার্তা শেষে যে যার গৃহে ফিরলেন।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন শরৎ। দক্ষিণেশ্বরে নানা লোকের মধ্যে সে সুযোগ কোথায়? সেই সুযোগ এসেছিল তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। এসে দেখেন সে যেন কার জন্য অপেক্ষা করেছিল। 'এমন সময় জনৈক যুবক অতি পরিচিতের মতো সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক আপন মনে গুণ গুণ স্বরে একটি হিন্দী গান গাহিতে লাগিল। যুবকের ব্যবহারাদি শরতের মনঃপূত হয় নাই; আবার বন্ধুটি তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া যুবকটির সহিত আলোচনায় রত হইলে বিরক্তির কারণও ঘটিল।' সেদিন কিন্তু শরৎচন্দ্র জানতে পারেন নি যে এই যুবকই নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বন্ধুটি কিছুই বলেনি।

মাস কয়েক পরের কথা। দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন শরৎচন্দ্র। রামকৃষ্ণ নিজমুখে নরেন্দ্রনাথের কত প্রশংসা করলেন। তোর সঙ্গে নরেনের আলাপ হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, একটিবার তার বাড়িতে গিয়ে আলাপ করে আসিস। সিমলের দত্তবাড়ি গেলেই দেখা হবে। এলেন একদিন সেই বাড়িতে। ঘরে ঢুকে দেখলেন, এই তো সেই যুবক যাঁকে তিনি তাঁর বন্ধুর বাড়িতে দেখেছিলেন। সামনা-সামনি সেই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত থেকেই দুজনে নরেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র দুজনের বন্ধু হয়েছিলেন। এই বন্ধুত্ব এই সৌহার্দ্য ইতিহাসেরই অভিপ্রেত ছিল। ভবিষ্যতের ভাবী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যাঁরা নেতৃস্থানীয় হয়েছিলেন—সেই বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ তাঁরা সকলেই দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে মিলিত হয়েছিল। তাঁর প্রত্যেকটি চিহ্নিত সন্তানকে তিনি এইখানেই আকর্ষণ করে এনেছিলেন। শুধু তাই নয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যের ভাবটা যাতে সুনিবিড় হয়, পাকা গৃহিনীর মতো তিনি সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর লীলা সহচরদের মধ্যে গাঁট ছড়াটা তিনিই বেঁধে দিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে মিলনটা কিভাবে গানের ভেতর দিয়ে সুনিবিড় হয়ে উঠেছিল সেই কাহিনী কম চিত্তাকর্ষক নয়। দ্বিতীয় বার এসেই শরৎচন্দ্র গান গাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি শুনেছিলেন, নরেন্দ্রনাথ গান-বাজনা খুব ভাল জানেন। শুনেছিলেন রাম ডাক্তারের বাড়িতে তাঁর মুখের গান শুনে ঠাকুরের সমাধি হয়েছিল। 'নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তানপুরায় সুর বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, তুই বাঁয়াটা নে। শরৎ জানাইলেন, তিনি ঐ বিদ্যায় পারদর্শী নহেন। খুব সোজা বলিয়া নরেন্দ্রনাথ মুখে বোল বলিতে বলিতে হাতে বাজাইয়া তাঁহাকে কয়েকটি ঠেকা শিখাইয়া দিলেন এবং তারপর গান ও বাদ্য চলিতে লাগিল। শুধু গান অবলম্বনেই যে উভয়ের মিলন হইত তাহা নহে; অনেক ক্ষেত্রে

উচ্চ বিষয়ের আলোচনায় তাঁহারা এতই মগ্ন হইতেন যে, স্থানকাল ভুলিয়া যাইতেন।'

এরপর শশীর সঙ্গেও নরেন্দ্রনাথের আলাপ-পরিচয় হয়। তখন থেকে দুই ভাই অনেকদিন কলেজের অবসরে দুপুরবেলায় নরেনের বাড়ি আসতেন। রামকৃষ্ণের এই তিনটি ভাবী সন্তানের মধ্যে একটা নিবিড় সৌহার্দ্যের ভাব গড়ে উঠেছিল—এ অনুমান আমরা সঙ্গতভাবেই করতে পারি। সেদিন মধ্যাহ্ন কালে তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিলেন রামকৃষ্ণ। শশী ও শরৎ দুজনেই এতদিন যাবৎ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলে ধারণা করেছিলেন। সেই কথা শুনে, নরেন্দ্রনাথ তাদের বলেছিলেন, সিদ্ধ মহাপুরুষ কি বলছিস? উনি সিদ্ধের সিদ্ধ—উনি অবতার। তারপর যখন তিনি প্রত্যয়দীপ্ত ভাষায় তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা তাঁদের দুজনকে শোনালেন, তখন শশী ও শরতের হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল। [৩]

১৮৮৫। শরৎচন্দ্র এম. এ. পাস করলেন। গিরিশচন্দ্র ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবেন ঠিক করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শরৎ একদিন শুনেছিলেন যে, রামকৃষ্ণ ডাক্তার আর উকিলের অন্ন অস্পৃশ্য মনে করতেন। তাই তাঁর বাবা যখন তাঁকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করতে চাইলেন তখন তিনি বন্ধু নরেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি করবেন। কি আবার করবি? বাবা যা বলছেন তাই করবি, ডাক্তারি পড়বি—এই পরামর্শ শরৎ গ্রহণ করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, তখন থেকেই নরেন্দ্রনাথকে তিনি নেতার আসনে বসিয়েছিলেন। শুধু তিনি নন, উত্তরকালে রাখাল, তারক, কালী প্রভৃতি সকলেই নরেন্দ্রনাথকে নেতার আসনে বসিয়ে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ গঠনে তাঁর সহায়ক হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ঠাকুর স্বয়ং তাঁর মহাপ্রয়াণের পূর্বে একদিন নরেন্দ্রনাথকে, 'তুই এদের দেখবি'— এই বলে তাঁকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন।

চিকিৎসার জন্য ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগান বাড়িতে এসেছেন। প্রথম প্রথম দু'তিন জন (কালীপ্রসাদ ও লাটু মহারাজ) তাঁর সেবা-সুশ্রূষা করতেন আর শ্রীমা অন্তরালে থেকে পথ্য রান্না করতেন। ঘর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, বাজার করা—কত কাজ। এক-একজন এক-একটা কাজের ভার নিলেন। ক্রমে ঠাকুরের সেবা-সুশ্রূষার জন্য বেশি সেবকের দরকার হলো। তখন সেবা কার্যে সহায়তা করবার জন্য নরেন, রাখাল, যোগেনের সঙ্গে শশী ও শরৎচন্দ্র কাশীপুরে আসেন। এঁরা সকলেই তখন এখানে অবস্থান করে একাগ্রচিত্তে ঠাকুরের সেবা করতে থাকেন। প্রথম প্রথম শরৎচন্দ্র সর্বদা থাকতে পারতেন না। দিন যায়। আরোগ্য লাভ তো দূরের কথা, অসুখ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। তখন থেকে শরৎ দিন রাত এখানেই কাটাতেন।

এই সময়ে পুত্রের মতিগতি লক্ষ্য করে, উদ্বিগ্নচিত্তে গিরিশচন্দ্র একদিন কাশীপুরে এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। সেই পণ্ডিতকে দিয়ে তিনি যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ সত্যিই একজন সদগুরু কিনা। রোগশয্যায় শায়িত সেই দেবমানবের আধ্যাত্মিক প্রভাব উপলব্ধি করে সেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যারপর নাই মুগ্ধ হলেন। তারপর তিনি গোপনে গিরিশচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন যে, পূর্বজন্মের বহু সুকৃতির ফলে তাঁর ছেলের ভাগ্যে এমন সদগুরু লাভ হয়েছে। আর একদিন গিরিশচন্দ্র এসে রামকৃষ্ণকে বললেন: আপনি একটু বললেই শরৎ বিয়ে করবে। কথাটা হয়েছিল পুত্রের সাক্ষাতেই। অমনি শরৎচন্দ্র বলে ওঠেন, ঠাকুর বললেও আমি বিয়ে করব না। এই কথা শুনে রামকৃষ্ণ শরতের বাবাকে বলেছিলেন: ছেলের কথা শুনলে? আমি আর কি করব?

কাশীপুর বাগানের আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। ১৮৮৩। ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে রামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়ে, অর্ধবাহ্যদশায়

তাঁর ভক্ত ও সন্তানদের মধ্যে যে যা চাইছিল তাই অকাতরে দিচ্ছিলেন। দুজন সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন শরৎ ও লাটু মহারাজ। তাঁরা তখন ঠাকুরের বিছানাপত্র রৌদ্রে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নীচের থেকে আনন্দ কোলাহল কানে আসছে, তবু হাতের কাজ শেষ না করে যাওয়া চলে না। পরে একজন তাঁকে বলেছিলেন, কতজনে কত কি পেলো। তুমিও কিছু পেতে যদি যেতে।

—পাওয়ার ইচ্ছা তো মনেই আসে নি। তাছাড়া তিনি আমাদেরই ছিলেন।

এই উত্তর নিঃসন্দেহে রামকৃষ্ণ-সন্তানের যোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধি লাভ করলেন। শরৎচন্দ্র ঘরে ফিরলেন এবং পিতার আদেশে আগের মতো ডাক্তারী পড়তে থাকেন। গিরিশচন্দ্র পুত্রের এই মতিগতি দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। ইতিমধ্যে কাশীপুর বাগান বাড়ি ত্যাগ করে সন্তানদের উঠে আসতে হয়েছে বরাহনগরের একটি জীর্ণ বাড়িতে। ভাবী বেলুড়মঠের সূচনা এইখানেই হয়েছিল। নরেন, রাখাল, তারক, কালী—সবাই এখানে। শরৎচন্দ্র তখন গৃহে একরকম আবদ্ধ হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে তাঁর গুরুভাইদের কেউ আসেন তাঁর কাছে। একদিন নরেন্দ্রনাথ এসে তাঁকে বললেন, শরৎ, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, ঠাকুর তাঁর সন্তানদের কাছে অনেক কিছু আশা করেন। এইটুকু ইঙ্গিত যথেষ্ট ছিল। শরৎচন্দ্র একদিন চিরকালের মতো সংসারের বন্ধন কেটে মঠে চলে এলেন। কথিত আছে, এই সময়ে একদিন তাঁর পিতামাতা বরাহনগরে এসে, তাঁর নবজীবনে সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করেছিলেন। যে এগারটি সন্তানকে, মহাপ্রয়াণের পূর্বে, রামকৃষ্ণ স্বহস্তে সন্ন্যাস দিয়ে গিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। মঠে আসার পর যখন সকলে মিলে শাস্ত্রসম্মত সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন তখন তাঁর নতুন নাম হয় সারদানন্দ। এই নামের মধ্যেই তাঁর নবজন্ম লাভ হয়েছিল।

শুরু হয় শরৎচন্দ্রের জীবনে এক নতুন অধ্যায়। সঙ্ঘের অন্যতম সন্ন্যাসী, স্বামী সারদানন্দরূপে তাঁর জীবনের এই পর্বটি যেমন গৌরবময় তেমনি ঘটনাবহুল। প্রথমে পরিব্রাজক সারদানন্দের কথা বলি। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯১—এই চার বৎসরকাল তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পর্যটন করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসীদের প্রায় প্রত্যেকের মনের মধ্যে তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। সম্ভবত এটি তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁদের ইস্টদেবের কাছ থেকে পেয়ে থাকবেন। প্রথমে তিনি গুরুভ্রাতা প্রেমানন্দ ও অভেদানন্দের সঙ্গে পায়ে হেঁটে শ্রীক্ষেত্র গিয়েছিলেন। তারপর শুরু হয় তাঁর উত্তর ভারত পরিক্রমা। গয়া, কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থস্থান দেখে, ১৮৮৯ সালের শেষে তিনি হরিদ্বার হয়ে হৃষীকেশে উপনীত হন। এই পর্যটন কালে তিনি তুরীয়ানন্দের সঙ্গে একসময়ে দুর্গম তীর্থ নীলকণ্ঠেশ্বর দেখতে গিয়েছিলেন। পরবৎসর তিনি গঙ্গোত্রী, এবং কেদার-বদরী যাত্রা করেন; সঙ্গী ছিলেন তুরীয়ানন্দ। সন্ন্যাসীর অবলম্বন ভিক্ষাবৃত্তি; কিন্তু নির্জন ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অনেক সময়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে তাঁকে রিক্ত হস্তে ফিরতে হতো। তথাপি তীর্থদর্শনের আনন্দে কোনো ক্লেশই তাঁর ক্লেশ বলে মনে হতো না। মনোরম স্থান পেলে তপস্যায় বসে যেতেন সেখানে। কেদার-বদরী ভ্রমণ শেষ করে, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তিনি হিমালয় ভ্রমণে বেরুলেন। দিল্লীতে এসে স্বামীজি নিঃসঙ্গ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাঁর আমেরিকা যাওয়ার আগে প্রিয় গুরুভ্রাতার সঙ্গে সেই শেষ দেখা।

তীর্থপর্যটন করে ফিরে এসে সারদানন্দ জয়রামবাটী এলেন। এইখানে তাঁর ম্যালেরিয়া হয়। মঠে ফিরে এলেন; দীর্ঘকাল তাঁকে ভুগতে হয়েছিল। মঠ তখন আলমবাজারে উঠে এসেছে। এরপর তিনি শেষবারের মতো তীর্থদর্শনে বেরিয়ে রাজপুতানা ও সৌরাষ্ট্র দর্শন করে ফিরে আসেন। তখন আমেরিকায় প্রচার কাজ শেষ

করে স্বামীজি রয়েছেন লণ্ডনে। সেখান থেকে একদিন মঠে চিঠি এলো : এখানে প্রচারকের প্রয়োজন ; তারককে পাঠিয়ে দাও। ১৮৯৬, এপ্রিলের প্রথমেই স্বামী সারদানন্দ এলেন লণ্ডনে। স্বামীজি তখন আমেরিকায় ফিরে গেছেন। এর অল্পকাল পরেই স্বামীজি দ্বিতীয়বার লণ্ডনে এলেন ; তখন থেকেই বিদেশে আরম্ভ হয় সারদানন্দের প্রকৃত কর্মজীবন। কোনো দিন তিনি বক্তৃতা করেন নি ; কিন্তু স্বামীজির শিক্ষাগুণে তিনি রীতিমতো তৈরী হয়ে উঠে-ছিলেন। লণ্ডনে তিনি যে কয়টি বক্তৃতা করেছিলেন সেগুলি হৃদয়-গ্রাহী হয়েছিল। লণ্ডনে তাঁর প্রয়োজন শেষ হলে, স্বামীজি তাঁকে গুডউইনের সঙ্গে বেদান্ত প্রচারের জন্য নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দিলেন। গুডউইন ছিলেন স্বামীজির বিশ্বস্ত একান্ত সচিব। তাঁর বক্তৃতাগুলির 'নোট' ইনিই নিতেন। বিদেশে তাঁর বক্তৃতার ভাণ্ডারী ছিলেন ইনি।

আমেরিকায় সারদানন্দের প্রচার কার্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু এই কাজে সুনাম ও সাফল্য অর্জন করলেও তিনি বেশিদিন ওদেশে থাকেন নি। স্বামীজি প্রথমবারে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ মিশন। গুরুর নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তিনি শরৎ মহারাজকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে তিনি মিশনের সম্পাদক (Secretary) পদে নিযুক্ত করেন। ত্রিশ বছরকাল তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এই গুরু দায়িত্ব পালন করে তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার যে পরিচয় রেখেছিলেন তার ফলে মিশনের কাজের যথেষ্ট প্রসার ঘটতে থাকে। অকাল মৃত্যুর ফলে স্বামীজি সেটা দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ প্রমুখ তাঁর অন্যান্য গুরুভাইরা সারদানন্দের পরিচালনা ক্ষমতা পেয়ে বিস্মিত হতেন। বস্তুত স্বীয় কর্মক্ষমতার ফলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে স্বামী সারদানন্দ নিজনামে মুদ্রাঙ্কিত করে দিতে সক্ষম

---

1. THE MAN OF GOD.

হয়েছিলেন। মহাপুরুষ একবার বলেছিলেন, 'শরৎ শক্ত হাতে যেভাবে মঠের হাল ধরে রেখেছেন তা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আজ তিনি যে আসনে বসেছেন সেখানে তিনি ভিন্ন আর কাউকে মানাত না।', এ বড়ো কম প্রশংসার কথা নয়।

এই প্রসঙ্গে সারদানন্দের এক জীবনীকার যথার্থই লিখেছেন : 'মঠ ও মিশনের প্রথম অবস্থায় সঙ্ঘের অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রবাহিত হইত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সমাহিত চিত্তে সংস্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ-গোমুখী হইতে। সেই ভাব সমষ্টিকে মঠ ও মিশনের বিশাল ক্ষেত্রে বিচিত্র প্রণালীতে পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন তাঁহার গুরু ভ্রাতারা। ইহাদের মধ্যে আবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রধানত সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। আর স্বামী সারদানন্দের দৃষ্টি থাকিত সেই ভাবরাশিকে নির্দিষ্ট কার্যধারার পরিচালনের প্রতি।' মিশনের প্রথম সেক্রেটারীরূপে স্বামী সারদানন্দকে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতো এবং সেটা তিনি করতেন তাঁর স্বভাবসুলভ সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহকারে।

তাঁর কর্মের পরিধি ছিল বিশাল। মঠে তিনি যেন তাঁর চার-পাশে একটা প্রচণ্ড কর্মের আবর্ত রচনা করেছিলেন। নবাগত সাধুদের ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। তাঁর সময় থেকেই নিয়মিত সাধন ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি শুরু হয়। ঠাকুরঘরে পালা-ক্রমে সাধুদের সারারাত জপধ্যান করার নিয়ম তিনিই প্রবর্তন করেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনার চক্র বসাতেন তিনি। এই চক্রে বহিরাগত ও ভিন্ন সম্প্রদায়যুক্ত সাধুরাও যোগ দিতেন। বেলুড়মঠ যে তথাকথিত একটা আখড়া নয়, বরং এটা যে অধ্যাত্ম-সাধনায় একটি কেন্দ্র—এই ভাবমূর্তি ছিল সারদানন্দেরই রচনা। এ ছাড়া স্থানে স্থানে বক্তৃতা দেওয়া, বিশিষ্ট ভক্ত পরিবারে উপদেশ প্রদান, পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ এবং চিঠিপত্র লেখাতেও তাঁর

অনেক সময় ব্যয়িত হতো। তাঁর উপর মিশনের সেক্রেটারীর কার্যভার ন্যস্ত থাকায় মিশনের জনকল্যাণকর স্থায়ী সেবাকর্মাদির ও সাময়িক বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ত্রাণকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হয়। যদিও মঠের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের সকল দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল স্বামী প্রেমানন্দের ওপর, তথাপি সকল বিভাগের কাজের তত্ত্বাবধান তিনিই করতেন। একটি সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা ছিল তাঁর। উদ্বোধনের বাঁ-হাতে নীচের ঘরটিতে বসে, বিশাল সঙ্ঘের যাবতীয় কার্য দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন।

কিন্তু সারদানন্দের সবচেয়ে বড়ো কাজ ছিল শ্রীমায়ের তত্ত্বাবধান করা। ১৮৯৯ সালে গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর, মায়ের সেবাধিকার পেয়ে যেভাবে তিনি সেই কর্তব্যপালন করে-ছিলেন, তা মিশনের ইতিহাস এক নতুন অধ্যায় রচনা করে দিয়েছে বললেই হয়। ঠাকুর অপ্রকট হবার পর কলকাতায় থাকার জন্য মায়ের নিজস্ব কোনো আস্তানা ছিল না। সেই জন্য দীর্ঘকাল তাঁকে জয়রামবাটীতে থাকতে হয়েছিল নানা অভাব-অনটনের মধ্যে। মাতৃভক্ত সন্তানগণ শ্রীমাকে সুখে স্বাচ্ছন্দে রাখার জন্য সর্বদাই তৎপর ছিলেন। এই বিষয়ে স্বামীজি স্বয়ং যে নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন একমাত্র স্বামী সারদানন্দের চেষ্টাতেই তা রূপায়িত হয়েছিল। কলকাতায় বাগবাজারে মায়ের নিজস্ব বাটী নির্মাণ তাঁরই সময়কার ঘটনা। এই দ্বিতল গৃহ আজ 'উদ্বোধন' নামে পরিচিত। ১৯০৯ সালের ২৩ মে তারিখে শুভদিনে, নতুন বাড়িতে এসে সারদাদেবী তাঁর একান্ত শরণাগত সন্তান সারদানন্দকে তাঁর অন্তর উজার করে আশীর্বাদ করেছিলেন। 'আমি মায়ের সেবক ও দ্বাররক্ষক'—এই-কথা সব সময় বলতেন স্বামী সারদানন্দ। মা থাকতেন দোতলায়। আর মায়ের সেবক সারদানন্দ একতলায়। মায়ের সেবার জন্যই তিনি এখানে অবস্থান করতেন।

মায়ের বাটী নির্মাণ ব্যাপারে তাঁকে প্রচুর ঋণ করতে হয়েছিল।

সেই ঋণ কেমন করে পরিশোধ করবেন এটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা। 'অতঃপর ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' লিখিতে আরম্ভ করেন।' এই অমূল্য গ্রন্থ 'লীলাপ্রসঙ্গ' সারদানন্দের অক্ষয়কীর্তি। একদিকে এই প্রামাণ্য গ্রন্থটি বাংলার ধর্মীয় সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি এটি রামকৃষ্ণ-জীবন অনুধ্যানের সহায়ক হয়ে উঠেছে। 'জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ তাঁর নিপুণ লেখনীতে পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া পঞ্চমখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থখানিকে ধর্মজীবনের পঞ্চামৃততুল্য করিয়াছে। এই পীযূষপানে তাই পাঠক অমরত্বলাভ করেছেন।' দুঃখের বিষয়, এই জীবনীগ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। তাঁর কর্মপ্রেরণার উৎস মাতাঠাকুরাণীর দেহত্যাগে তাঁর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। 'ভারতে শক্তিপূজা' নামে সারদানন্দের আর একখানি সুন্দর বই আছে। এই গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

সারদানন্দ-জীবন পরিক্রমা শেষ হলো। এইবার এই রামকৃষ্ণ সন্তানের চরিত্র সম্পর্কে দু'একটি কথা বলব। নানা আশ্চর্যগুণের সমাবেশ ঘটেছিল এই সিদ্ধকাম সন্ন্যাসীর জীবনে। শিষ্য ও ভক্ত যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবের আধারভূত, আদর্শ মাতৃভক্ত, গণপতিতুল্য শরৎ মহারাজের হৃদয়ে স্নেহের সমুদ্র স্বরূপিণী জগজ্জননী নিত্য বিরাজিতা থাকায় তাঁর দয়া, ভালবাসা, স্নেহ সকলের প্রতি সমভাবে অতুলনীয় ছিল। অনাসক্তির ভাব তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবেচনায় তিনি ছিলেন একজন স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ এবং এইজন্যই তাঁর সকল কাজ সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠত। আর সুনিয়ন্ত্রিত ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী। তিনি ছিলেন নিরভিমান; রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তুল্য সর্বভারতীয় সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান শুধু ভারতে নয়,

সারা পৃথিবীতেই দুর্লভ। সেই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ছিলেন তিনি—এক আধ বছর নয়, তিন দশক কাল এই গৌরবজনক পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই পদগৌরবের দ্বারা তিনি কখনো অন্যের মনুষ্যত্বকে অবমানিত করতেন না। তাঁর অকৃত্রিম হৃদয়বত্তা এবং আশ্রিত বাৎসল্যের তুলনা ছিল না। জিজ্ঞাসুকে প্রসন্নমুখে উত্তর দিতেন। সাধুসন্ন্যাসীর চরিত্র সাধারণের পক্ষে দুরধিগম্য। কর্মব্যস্ত জীবনে বিশ্রামের অবসর তাঁর ভাগ্যে ছিল না বললেই হয়। একবার তাঁর এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মহারাজ, আপনার কর্ম সাফল্যের রহস্যটা কি?

—মঠের প্রত্যেক কর্মীকে স্বাধীনতা দান, তাদের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস ও তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়াই আমার কর্মসাফল্যের রহস্য। ঠাকুর আমাদের শিখিয়ে গেছেন, ক্রোধ নয়, বিরক্তি নয়, শুধু প্রেমের দ্বারা সবাইকে বশে রাখতে হবে। সেই উপদেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

শেষ বয়সে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। বাতব্যাধিতে প্রায়ই ভুগতেন। সেই সঙ্গে মূত্রাশয়ের পীড়া হয়। পাছে কেউ বিব্রত হয় সেজন্য রোগের সকল যন্ত্রণা তিনি নিঃশব্দে সহ্য করতেন। ১৯০০, ২১ ফেব্রুআরি, শ্রীমা স্ব স্বরূপে লীন হয়ে গেলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহরক্ষা করলে মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীদের অনেকেই তখন স্বামী সারদানন্দকে সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। 'স্বামীজি আমাকে মঠের সেক্রেটারী করে গেছেন, আমি সে পদ ত্যাগ করব না'—এই ছিল সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উত্তর। ১৯২৭, ১৯ আগস্ট গভীর রাত্রিতে মঠের অন্যতম স্তম্ভ, মায়ের একনিষ্ঠ সেবক ও আদর্শ সন্তান, স্বামী সারদানন্দ মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন।

স্বামী অভেদানন্দ
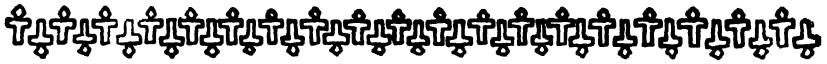
'আমার মন দক্ষিণেশ্বরে রাণীরাসমণির কালীবাড়িতে পরমহংস-দেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে এক-দিন রবিবার প্রাতঃকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথের পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে কালীবাড়ির উত্তরদিকের ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং বেলতলা ও পঞ্চবটীর পাশ দিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। সেখানকার কোন কর্মচারীকে পরমহংসদেদের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি ঐ কালীবাড়িতে একটি ঘরে থাকেন। কিন্তু সেইদিন তিনি কলিকাতা গিয়াছেন এবং তাঁহার ঘর তালাবন্ধ রহিয়াছে। তখন বেলা প্রায় ১১টা এবং প্রখর রৌদ্রতাপে প্রাতঃকাল হইতে নগ্নপদে ভ্রমণ করিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। পরমহংসদেব নাই শুনিয়া হতাশ হইয়া ঘরের উত্তর দিকে সিঁড়িতে বসিয়া পড়িলাম।....অতঃপর শান্ত মনে আমি পরমহংসদেবের দর্শনাভিলাষে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।'[১]

এই কথা লিখেছেন স্বামী অভেদানন্দ তাঁর আত্মচরিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন প্রসঙ্গে। তিনি তখন ওরিয়েণ্টাল সেমি-নারির দশম শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময়ে তাঁর মনে জেগেছিল যোগ-সাধনের প্রবল ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছিল দক্ষিণেশ্বরে। পরবর্তী কাহিনী তাঁর নিজের কথাতেই বলি।

১ আমার জীবনকথা : স্বামী অভেদানন্দ।

কলিকাতা হইতে ঠাকুর যথাসময়ে ফিরিলেন। আমি ভয়ে ও ভক্তিতে নির্বাক হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি। মনে কোন প্রকার প্রশ্নই উঠিতেছে না, অথচ কত কিছু ভাবিয়া চলিয়াছি। এমন সময়ে রামলাল দাদা, আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, পরমহংসদেব তোমায় ডাকছেন। অগত্যা ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, ও পরমহংসদেবের শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলাম। শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া যেন পরম শান্তির স্রোতে ভরিয়া গেল। পরমহংসদেব সস্নেহে মাদুরের উপর বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বাড়ি কোথায়? নাম কি? তুমি কিজন্য এত কষ্ট করে এখানে এসেছ? কি চাও? ইত্যাদি। আমি বলিলাম, আমার যোগ শিক্ষা করার ইচ্ছা। আপনি কি আমায় যোগসাধনা শিক্ষা দেবেন? পরমহংসদেব এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বললেন, তোমার এই অল্প বয়সে যোগসাধন করার ইচ্ছা হয়েছে—এটি খুব ভাল লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে এক বড় যোগী ছিলে। একটু বাকী ছিল। এই তোমার শেষ জন্ম। হ্যাঁ, আমি তোমায় যোগ শিক্ষা দেব। আজ রাতটা বিশ্রাম কর, কাল সকালে আবার এসো।...

'সমস্ত রাত্রি নানা প্রকার চিন্তায় অভিভূত হইয়া নিস্তব্ধে রাত্রি-যাপন করিলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি প্রাতঃকৃত সমাপণ করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্তে পরমহংসদেবের বিষয় ধ্যান করিতে লাগিলাম এবং কখন তাঁহার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে তাহা ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে রামলালদাদা আমায় পরমহংসদেবের ঘরে যাইতে বলিলেন। আমি প্রবেশ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম এবং তাঁহার আদেশে মাদুরে উপবেশন করিলাম। পরম-হংসদেব আমার দিকে চাহিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কতদূর পড়েছ? আমি বলিলাম, আজ্ঞে এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়ছি। পরমহংসদেব তুমি সংস্কৃত জান? কোন্ কোন্ শাস্ত্র পড়েছ? আমি

রঘুবংশ, কুমারসম্ভবাদি কাব্য এবং ভাগবদ্গীতা, পাতঞ্জল দর্শন, শিব সংহিতা প্রভৃতি পড়েছি।

'পরমহংসদেব বেশ, বেশ বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পরে আমাকে ঘরের উত্তরদিকের বারান্দায় লইয়া গেলেন। সেখানে একটি তক্তপোষ পাতা ছিল। তিনি তাহার উপর আমায় সস্নেহে বসিতে আদেশ করিলেন। আমি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলে পরমহংসদেব আমায় জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। আমি জিহ্বা বাহির করিলে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা জিহ্বায় একটি মূলমন্ত্র লিখিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থলে উর্ধ্বদিকে শক্তি আকর্ষণ করিয়া মা কালীর ধ্যান করিতে বলিলেন।...করুণাময় পরমহংসদেব এইরূপে আমায় দিব্য-ভাবের দীক্ষা দান করিলেন।'[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সহচরদের মধ্যে একমাত্র স্বামী অভেদানন্দেরই প্রথম দর্শনে দীক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন সকলের শেষে আর দীক্ষালাভ করেন প্রথম দিনেই যা তাঁর কোন গুরুভাইদের জীবনে ঘটে নি। তাঁকে দেখে ঠাকুর পরে একদিন বলেছিলেন, তোর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন সেদিন তিনি তাঁর অন্যতম গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনিও সেদিন, কলেজ বন্ধ থাকায়, ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়ে থাকবেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী অভেদানন্দের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এঁর পূর্বাশ্রমে নামছিল কালীপ্রসাদ। তিনি 'কালীতপস্বী' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে তিনি সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কাল আমেরিকাতে বেদান্ত প্রচার কার্যে

১ শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মা কালীর পূজারী

নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবন ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। কলকাতার আহিরীটোলার এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। পিতা রসিকলাল চন্দ্র; মাতা নয়নতারা দেবী। নয়নতারা তাঁর স্বামীর দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন। তাঁদের নয়টি পুত্রসন্তানের মধ্যে পাঁচটির অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। বাকী চারটির মধ্যে কালীপ্রসাদ ছিলেন তার পিতামাতার মধ্যম পুত্র। কথিত আছে, তাঁর জন্মগ্রহণের অনেক আগে থেকে তাঁর ধর্মপ্রাণা মা কালীঘাটে গিয়ে মা কালীর কাছে একটি ধার্মিক যোগীসন্তান কামনা করে ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করেছিলেন। বিশ্ব-জননী তাঁর এই প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। ইংরেজি ১৮৬৬, ২ অক্টোবর (বাংলা ১২৭৩, ১৭ আশ্বিন, মঙ্গলবার) রাত দশটার সময় জন্মযোগী কালীপ্রসাদ জন্ম গ্রহণ করেন। তখন বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গাদেবীর বোধন আরম্ভ হয়েছে। 'সেই শুভ দিনে ও শুভ মুহূর্তে কলিকাতা নগরীতে ২২নং নিমু গোস্বামী লেনে পৈতৃক ভবনে আমার জন্ম হয়। শ্রীশ্রীমাকালীর প্রসাদে আমার মাতা সন্তান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার নাম রাখিয়া-ছিলেন কালীপ্রসাদ।'

রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। শিক্ষক হিসাবে যেমন তাঁর খ্যাতি ছিল, তেমনি ছিল তাঁর সত্যনিষ্ঠ ধার্মিক জীবনের প্রশংসা। কালীপ্রসাদের জন্মের ঠিক তিন বছর নয় মাস আগে জন্মেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত,—পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ। সেদিন কেউ কি ভেবেছিল যে, উত্তরকালে আহিরীটোলার এই কালীপ্রসাদ বা স্বামী অভেদানন্দের হাত ধরে স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন-বিজয় সম্পূর্ণ হবে? ভারতের জয়যাত্রার ইতিহাসের দুই শুভলগ্নে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন দুজন ক্ষণজন্মা আচার্য—বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ। ১৮৬৬ কালীপ্রসাদের জন্মবৎসর। তাঁর সমকাল থেকে 'ভারতসভা' সংস্থাপন পর্যন্ত সামান্য কয়েকটি বছর মাত্র।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ভারতের এবং বিশেষ করে বাংলার নিদ্রিত আত্মা জেগে উঠেছিল। বলতে গেলে ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মার্কিন-বিজয়ী বীর বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ।

তাঁর আত্মচরিত পাঠে আমরা জানতে পারি যে, সতেরো বছর বয়সে স্কুল-জীবনেই কালীপ্রসাদ বাড়িতে গীতা পড়ে শেষ করেছিলেন। পড়া নয়, রীতিমত অধ্যয়ন বললেই হয়। কারণ তাঁর জীবনের পরবর্তীকালে গীতার অপূর্ব কাবসমন্বয় মূর্ত হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অদ্ভুত মানসিক শক্তির পরিচয় দিতেন। গৃহে নির্মল চরিত্র পিতা আর ভক্তিমতী মায়ের দৃষ্টান্ত পুত্রের সামনে সর্বদা ছিল। সেইজন্য ধর্মভাবই তখন থেকেই সেই বালকের মনে প্রবল ছিল। জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে ধর্মপুস্তক কেনা ও পড়া, কালীপ্রসাদের কিশোর জীবনেই পরিলক্ষিত হতো। তিনি যখন স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র তখন কলকাতায় এখানে-ওখানে বক্তৃতার আসর বসত—সুরেন বাঁড়ুয্যে ও লালমোহন ঘোষের বক্তৃতা, কেশব সেনের বক্তৃতা, শশধর তর্ক চূড়ামণির বক্তৃতা। এঁরা প্রত্যেকেই বড় বাগ্মী ছিলেন। এঁদের বক্তৃতা হবে শুনলেই কালীপ্রসাদ সকলের আগে সভাস্থলে ছুটতেন। উত্তরকালে তাঁকে স্বদেশে ও বিদেশে কতই না বক্তৃতা করতে হয়েছে। এইসব বক্তাদের ভাষণ শুনতে শুনতে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। বক্তৃতা দেবার যে অসাধারণ শক্তি তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল, তা ক্রমে ক্রমে এইভাবে জাগ্রত হচ্ছিল।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই কালীপ্রসাদ সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। স্কুলের চিরাচরিত শিক্ষাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি হাতিবাগান টোলে হেরম্ব পণ্ডিতের কাছে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন। সংস্কৃত পড়ার তাঁর অনুরাগ দেখে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক তাঁকে একখানি 'ছন্দোমঞ্জরী' পড়তে দেন। তিনি

এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। উত্তরকালে তিনি যে অনেক সুললিত সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করতে পেরেছিলেন তার উৎস ছিল 'ছন্দোমঞ্জরী'। আবার স্কুল-জীবনেই শঙ্করাচার্যের দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে কিশোর কালীপ্রসাদের মনে পণ্ডিত ও দার্শনিক হবার ইচ্ছা জেগেছিল। কালীবর বেদান্ত বাগীশের যোগশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করার পর থেকেই তাঁর মনে যোগী হওয়ার প্রবল আকাংখা জেগে থাকবে। এই আকাংখাই তাঁকে ১৮৮৪ সালের মাঝামাঝি একদিন দক্ষিণেশ্বরে টেনে এনেছিল।

প্রথম দর্শনের পর, বিদায়ের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ কিশোর কালীপ্রসাদকে মিষ্টি প্রসাদ দিয়ে বলেছিলেন, 'আবার এসো। যদি পয়সা যোগাড় না হয়, তবে এখান থেকে দেওয়া হবে।' 'আবার এসো'—কী করুণাভরা কথা। আমরা অনুমান করতে পারি যে, সেদিন সেই কিশোরের মন ভরে উঠেছিল এই স্নেহমাখা কথায়। বাড়ি ফিরে এলেন বটে, কিন্তু এক নতুন মানুষ হয়ে ফিরলেন। প্রত্যহ সকালে ও রাতে ধ্যানে বসা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল তাঁর। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়াটাও হতে লাগল ঘন ঘন। ফলে পড়াশুনায় এলো অমনোযোগ। তাঁর এই মতিগতি অভিভাবকদের মনঃপূত হয় না; তাঁরা দিতে থাকেন বাধা। কিন্তু কালীপ্রসাদকে নিবৃত্ত করা গেল না—না সাধনা থেকে, না তাঁর দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া থেকে। এখানে ঘন ঘন আসার ফলে নরেন, রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন তিনি আর রামকৃষ্ণের সেবার সুযোগ পেয়ে হলেন ধন্য। কলকাতায় ভক্ত গৃহেও ঠাকুর দর্শনে তিনি যেতেন। কথিত আছে, এই সময়ের মধ্যে তাঁর ইস্ট দেবতার কাছ থেকে অনেক উচ্চ তত্ত্ব শুনবার এবং শিক্ষা করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। অনেক সময় তিনি প্রশ্ন করেও জেনে নিতেন।

'যিনি নিরাকার, তিনিই আকার, ঈশ্বরের সাকার রূপকেও জানতে হবে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাকার নিরাকার হয়ে যায়।'

'যারই নিত্য তারই লীলা। নিত্য সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তিনি নির্গুণ আবার সগুণ দুইই। তিনিই নিত্য ও লীলা।'

'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না থাকলে জগৎ মিথ্যা মনে হয়। আদ্যাশক্তি আছেন বলেই জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।'

'সত্য কথাই কলির তপস্যা। যারা নিত্যসিদ্ধ তারা সংসারে বদ্ধ হয় না।'

'ভগবান অবতার হয়ে জীবকে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন।

আমরা অনুমান করতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের মুখে এইসব সুন্দর সুন্দর তত্ত্ব কথা শুনবার পর থেকেই আহিরীটোলার সেই কিশোরটির মনের গতি ও জীবনের ধারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সেই পরিবর্তন তাঁকে শেষ পর্যন্ত সংসারত্যাগী করে, যুগাবতারের চরণে টেনে এনেছিল।

১৮৮৫। আশ্বিন মাস। শ্রীরামকৃষ্ণের তখন গলার অসুখ। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় শ্যামপুকুরে আনা হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে গাড়ি করে যেদিন ৫৫ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে তাঁকে নিয়ে আসা হয় সেদিন গাড়িতে ছিলেন রাখতুরাম লাটু মহারাজা আর কালীপ্রসাদ। শ্যামপুকুরে যখন গলরোগের উপশম হলো না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয় কাশীপুরে। 'সেবকরূপে আমরা, শ্রীমা ও গোলাপ মা তাঁহার সঙ্গে কাশীপুরের বাগানবাটীতে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর আমাকে ও উপস্থিত সকল সন্তানকে একদিন বলিলেন : ছাখ আমার এই গলার অসুখ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এই কারণে তোরা সকলে একত্র হয়েছিস।'[১]

কাশীপুর কালীপ্রসাদের জীবনে চিরস্মরণীয় এইজন্য যে, এখান থেকেই তিনি নরেন্দ্রনাথের আজ্ঞাবহ গুরুভ্রাতা হয়েছিলেন।

১. আমার জীবনকথা : স্বামী অভেদানন্দ।

এইখানে দুইজনে হয়ে উঠেছিলেন হরিহরাত্মা কিন্তু একে অন্যের ছায়া নয়। দেব যাদুকর ছিলেন রামকৃষ্ণ. সেইজন্যই তিনি এই দুই মনীষির মধ্যে অপূর্ব মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন।

আর সকলের মতো কালীপ্রসাদও ইস্টদেবের সেবা-শুশ্রূষায় তাঁর প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যয়ন চর্চাটি তাঁর সমানভাবেই বিদ্যমান ছিল। কাশীপুরের বাগানে থাকার সময়ে কালীপ্রসাদ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য ন্যায় ও দর্শন প্রভৃতি পড়তেন। কাশীপুরের বাগান তখন যুগপৎ তপোক্ষেত্র ও তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে এখানে আসেন কত জ্ঞানীগুণী অসুস্থ রামকৃষ্ণকে দেখতে। এইখানেই একদিন কথা প্রসঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণি যখন ঠাকুরকে বলেছিলেন, আপনি যদি শরীরের দিকে একটু মন দেন তাহলে আপনার গলার অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে। এর উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, যে মন একবার ভগবানকে দিয়েছি, তা এই রক্ত-মাংসের শরীরের দিকে আবার কেমন করে দিতে পারি? সেদিন ইষ্টদেবতার মুখে এই কথা শুনে কালীপ্রসাদ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। এইখানেই তাঁর মহাপ্রয়াণের কিছুদিন আগে, ঠাকুর যে এগারটি সন্তানকে নিজের হাতে গৈরিক বস্ত্র দিয়ে তাঁদের ভাবী জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কালীপ্রসাদ ছিলেন সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন।

১৮৮৬, ১৬ আগষ্ট; রবিবার। শ্রাবণী পূর্ণিমার আলোকিত রাত্রি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করলেন। অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে কালীপ্রসাদও সেই লীলাবসান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কাশীপুরের বাড়ি ছেড়ে দিতে হলো। ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে সন্তানগণ উঠে এলেন বরাহনগরে প্রামাণিক ঘাট রোডে অবস্থিত একটি জীর্ণ ও পরিত্যক্ত বাড়িতে। ঠাকুরের নাম নিয়ে ও তাঁর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করে ত্যাগ পরিশুদ্ধ জীবনযাপন করবেন—এই ছিল নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রামকৃষ্ণ সন্তানদের ইচ্ছা।

তাঁরা কেউ আর বাড়িতে ফিরে যাবেন না। ফিরবার রাস্তা ঠাকুর নিজেই বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের হাতে গেরুয়া দিয়ে। এইখানেই ভাবী মঠের ভিত্তিপত্তন হয়; একদিন নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সন্তানগণ শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পাদুকার সামনে বসে, শিখা সূত্র ও নামগোত্র বিসর্জন দিয়ে শাস্ত্র মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিধিমত এই যে, তাঁদের সন্ন্যাস —এটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র কালীপ্রসাদের জন্যই। শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস নিতে হলে বিরজাহোম করতে হয়। সেই হোমের মন্ত্র, কালীপ্রসাদ সংগ্রহ করেছিলেন বরাবর পাহাড়ে যাবার সময় দশনামী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে।[১] 'আমি অভেদজ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ ও চরমজ্ঞান বলিয়া মানিতাম বলিয়া নরেন্দ্রনাথ আমার নাম রাখিল অভেদানন্দ।'

•

এইবার পরিব্রাজক অভেদানন্দের কথা। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণের প্রায় সকল সন্তানই পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করেছিলেন। সেইসময় চলতো তাঁদের তীব্র তপস্যা আর শাস্ত্র-অধ্যয়ন। বিবেকানন্দ শুধু তীর্থ পর্যটনই করতেন না; ভারতের সমাজজীবনের স্তরে স্তরে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেশের বর্তমান পরিচয়ও গ্রহণ করতেন। অভেদানন্দও তাই করতেন। তাঁর পরিব্রাজক জীবনের পরিধিকাল ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত। এই দীর্ঘকাল তিনি কিভাবে পর্যটন করেছিলেন তা তিনি নিজমুখে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: 'I travelled through the length and breadth of India, barefooted, without touching money,

---

১. কাশীপুরে থাকতেই নরেন্দ্রনাথ, তারকনাথ ও কালীপ্রসাদ একদিন কাউকে না বলে বুদ্ধগয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তারপর এক সিদ্ধ হঠযোগীকে দেখবার জন্য কালীপ্রসাদ সঙ্গীহীন অবস্থায় বরাবর পাহাড়ে গিয়েছিলেন।

without thinking of the morrow and with one garment as my bed and garment.' এমন দুঃসাহসিক পর্যটন একমাত্র রামকৃষ্ণ-সন্তানদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। স্বামী অভেদানন্দের পরিব্রাজক জীবন বহু বিচিত্র ঘটনায় সমাকীর্ণ; তার সবিস্তার উল্লেখ অসম্ভব। মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করছি এখানে।

অভেদানন্দ গাজীপুরে এসেছেন। সেইখানে তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা হরিমহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) P. W. D. ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। 'হরিপ্রসন্ন একদিন গাজীপুরের সেই সময়কার একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সেই পণ্ডিত ছিলেন দ্বৈতবাদী, সুতরাং অদ্বৈতবাদের বিশেষ বিরোধী। হরিপ্রসন্ন জানিত আমি একান্তপক্ষে অদ্বৈতবাদী। সেই দ্বৈতবাদী পণ্ডিতকে আমার সহিত বিচারে ভিড়াইয়া দিল। পণ্ডিতজী দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানান যুক্তি ও তর্কজাল উপস্থাপন করিলেন এবং আচার্য শঙ্করের মতবাদ স্থাপন করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যাসদেবকৃত বেদান্তসূত্রকে শঙ্করাচার্য বিকৃত করিয়া ব্যাখা করিয়াছেন বলিয়া আপত্তি করিলেন। আমি আচার্য শঙ্করের অখণ্ডনীয় উপনিষদ ও বেদান্তসূত্রভাষ্যের প্রামাণিকতা ও যুক্তি-যুক্ততা প্রমাণ করিয়া অনর্গল তাঁহার সহিত সংস্কৃত বিচার করিতে লাগিলাম এবং পণ্ডিতজীর সকল আপত্তিই নিরঙ্কুশভাবে খণ্ডন করিলাম। প্রায় একঘণ্টা বিচারের পর তিনি পরাভব স্বীকার করিলেন।'[১] এই ঘটনাটি থেকে আমরা স্বামী অভেদানন্দের অশেষ শাস্ত্র জ্ঞান ও তর্কপটুতার পরিচয় পাই। এরই বলে তিনি মার্কিন দেশে অদ্বৈত বেদান্তের পতাকা সগৌরবে উড্ডীন করেছিলেন।

১৮৯৬। স্বামী অভেদানন্দের জীবনে আরম্ভ হয় এক নতুন

১. আমার জীবনকথা : স্বামী অভেদানন্দ।

পর্ব। অতঃপর তাঁকে আমরা দেখতে পাব প্রচারকের ভূমিকায়। দীর্ঘ সাধনার ফলে তিনি যে শক্তি অর্জন করেছিলেন, আজ তার বিকাশের সময় এলো। বিদেশে বেদান্ত প্রচার করবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি ঐ বছর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি লণ্ডন যাত্রা করেন। প্রচারক অভেদানন্দকে বুঝতে হলে তাঁর প্রাক্-প্রচারক জীবনে লেখা 'The Hindu Preacher' নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করতে হয়। এইটিই তাঁর প্রথম রচনা। মনে হয় এটি বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয়কে লক্ষ্য করেই লেখা হয়েছিল। এটি মাদ্রাজের ইংরেজি 'ব্রহ্মবাদীন্'[১] পত্রিকার, ১৮৯৫ সালের ২৩ নভেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখেছেন :

'অনেকের ধারণা হিন্দুধর্ম প্রচারমূলক ধর্ম ছিল না, কখনও তা হতে পারে না এবং এই ধর্ম-বিস্তারের প্রতিটি প্রচেষ্টাই এর মূলনীতির বিরোধী। যাঁরা এই রকম অদ্ভুত ধারণা পোষণ করেন তাঁদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জীবনীশক্তিবিহীন জীবন যেমন মূল্যহীন, প্রচারবিহীন ধর্মও সেইরূপ অর্থহীন। প্রচার প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কর্ম কখনও অধঃপতন ও দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে না কিংবা নৈতিক অবনতির অগ্রগতি থেকে বাধা পেতে পারে না। স্মরণাতীত কাল থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুধর্মের প্রাণশক্তি অবতারকল্প ঋষিদের দ্বারাই সংরক্ষিত হয়ে আসছে। এইসব ঋষিরাই এবং তাঁদের মনোনীত শিষ্যরাই সনাতন ধর্মের শাশ্বত সত্যের প্রকৃত প্রচারক ছিলেন। এইসব শাশ্বত উপদেশগুলির এই জাতীয় প্রচার ও জনপ্রিয়তার জন্যই হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে এবং এ অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবে—যদি এর সার সত্য বিস্তৃত-ভাবে প্রচার করা হয়।'

১. স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে যাঁর উদ্যোগ-আয়োজন সহায়ক হয়েছিল সেই এম. সি. আলাসিঙ্গাপেরুমল এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন।

এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটির উপসংহারে তিনি যথার্থই লিখেছেন : 'সাম্প্রতিককালে উপযুক্ত প্রচারকের অভাবে হিন্দুধর্ম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যদিও পূর্বে সন্ন্যাসীরাই ভারতে প্রকৃত ধর্ম প্রচারক ছিলেন, কিন্তু অধুনা তাঁরা নিরক্ষর ও বিলাসী হয়ে উঠেছেন।[১] ধর্মশিক্ষা, প্রচার ও ত্যাগব্রতের অভ্যাসই যে তাঁদের দৈনন্দিন কর্তব্য একথা তাঁর বিস্মৃত হয়েছেন। এক্ষণে সুশিক্ষিত, যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ, কঠোর সংযমী এবং পরহিতব্রতী সন্ন্যাসীগণের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। যাঁরা ধর্মজীবন যাপন করে জনসাধারণের ধর্মপথনির্দেশকরূপে তাদের উপযোগী শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারকার্য নির্বাহ করবেন।'

একদিন আলামবাজার মঠে লণ্ডন থেকে একটি তারবার্তা এলো স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের (শশী মহারাজ) নামে। স্বামীজির জরুরী তলব : 'Send kali immediately London to assist me in my work here. Am arranging his passage.' এই তারবার্তার পটভূমিকাটি জানা দরকার। বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আসেন তখন তাঁর কাজে সহায়তা করবার জন্য তাঁরই নির্দেশক্রমে এখান থেকে প্রবাসে স্বামী সারদানন্দ প্রেরিত হয়েছিলেন (এপ্রিল ১৮৯৬)। জুন মাসের শেষভাগে স্বামীজি তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন। তখন আহ্বান এলো স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনে পাঠাবার জন্য। লণ্ডনে আসার একমাস পরের কথা। হঠাৎ স্বামীজি একদিন তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতাকে জানালেন ; 'কালী, খ্রীস্ট-থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে।'

—কিন্তু তোমারই তো সেখানে বক্তৃতা দেবার কথা, নরেন।

১. লেখকের এই মন্তব্য ১৮৯৫ সালের সাধারণ সন্ন্যাসী-সমাজের কথা। রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত সন্ন্যাসীসঙ্ঘের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক গুরুত্বটা বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দই সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন।

—আমি ভাই বড় ক্লান্ত। আমার বদলে তোমার নামটা প্রস্তাব করেছি। প্রধান বক্তা হিসাবে তোমার নাম ছাপা হয়ে গেছে।

—কিন্তু আমি তো কখনো বক্তৃতা দিইনি। আমার পক্ষে এ অসম্ভব।

—আমি যখন চিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলাম তখন কি আমি জানতাম কেমন করে বক্তৃতা করতে হয়? ঠাকুরের কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস রাখো—তোমার কণ্ঠ আশ্রয় করে তিনিই বলবেন।

অভেদানন্দ আর তর্ক করলেন না।

১৮৯৭, ২৭ অক্টোবর। তাঁর জীবনে প্রথম বক্তৃতা দিলেন তিনি। বক্তৃতার বিষয় ছিল: পঞ্চদশীর দর্শন[১]। ব্লুমসবারি স্কোয়ারে একটি ক্লাবে বিদগ্ধ শ্রোতাদের সামনে এই বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। সভাস্থলে স্বামীজি উপস্থিত ছিলেন। সেই বক্তৃতা শুনে ও গুরুভ্রাতার কৃতকার্যতা দেখে, স্বামীজি এতদূর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি সেই নবীন প্রচারককে উৎসাহ দিয়ে এই সুন্দর উক্তিটি করেছিলেন: 'Even if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it.' প্রচারক অভেদানন্দের পরবর্তী জীবন অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করেছিল যে স্বামীজির এই ভবিষ্যদ্বাণী নিরর্থক হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দের সর্বপ্রধান জীবন-চরিতে লণ্ডনে স্বামী অভেদানন্দের এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

'At the Club in Bloomsbury Square, which invites and gives reception to the preachers of

১. বেদান্তদর্শনের বিবরণশাখার উপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ পঞ্চদশী।

২. LIFE OF SWAMI VIVEKANANDA : By His Eastern and Western Disciples.

differant creeds and hears what they have to say, Swami Abhedananda appeared. His countenace lacked naturally that expression of interrogation which is often inseparable from the faces of the clerics of the West ; an embodiment of calm, of sagacity, of assured attainment, and certainly enwrapped him garment-wise. One had, in his presence, a sense that he knew. Of his smile one retains glad remembrance. It had in it a kindly radiance, a love deep and steadfast, a something so subtly exquisite that no word can be found for it.'

স্বামী অভেদানন্দের বয়স তখন ত্রিশ বছর যখন লণ্ডনে তিনি তাঁর প্রচারক জীবনের স্মরণীয় বক্তৃতাটি প্রদান করেছিলেন। স্মরণীয় বলছি এই কারণে যে তাঁর সেই বক্তৃতাটির শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তাঁরই অগ্রজতুল্য এবং বিশ্ববিজয়ী গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর ভাবী প্রচারক জীবন যে খুবই সমুজ্জ্বল সে বিষয়ে কারো তিলমাত্র সন্দেহ রইল না। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে এসে যে তিন মাস স্বামীজি অবস্থান করেছিলেন সেই সময় তিনি তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতাটিকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে তৈরি করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের এটাই ছিল প্রস্তুতি পর্ব। এই সময়ে তিনি ম্যাক্সমূলার, ডয়সন্ প্রমুখ মনীষিদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং লণ্ডন ও লণ্ডনের শহরগুলিতে আরো কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা মার্কিনে গিয়ে তাঁর প্রচারব্রতের কাজে খুবই সহায়ক হয়েছিল। লণ্ডনে তিনি বেদান্তের নিয়মিত বক্তৃতা ও ক্লাস আরম্ভ করেছিলেন।

কিন্তু লণ্ডনের কাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হলো না। আমেরিকা থেকে আহ্বান এলো। বিবেকানন্দ তখন ভারতে। তিনি নির্দেশ দিলেন যে অভেদানন্দ যেন অবিলম্বে নিউ ইয়র্ক যাত্রা করেন। স্বামী সারদানন্দ তখন আমেরিকায় ছিলেন। অভেদানন্দ এখানে আসার কিছুকাল পরে তিনি স্বামীজির নির্দেশে ভারতে ফিরে আসেন ও মঠের কাজে যোগদান করেন।

১৮৯৭, ৯ আগস্ট। স্বামী অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কে উপনীত হলেন এবং এখানকার বেদান্ত সমিতির সম্পাদিকা মিস্ মেরী ফিলিপসের বাড়িতে উঠলেন। এক পক্ষকাল বাদে বেদান্ত সমিতির পক্ষ থেকে তিনি অভিনন্দিত হলেন। আমেরিকায় এই সমিতিটি বিবেকানন্দ স্থাপন করে গিয়েছিলেন। উত্তরকালে এই সমিতিকে কেন্দ্র করে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারের যে বিরাট ও ব্যাপক ব্যবস্থা করেছিলেন তা রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হয়ে আছে। আমেরিকায় এসে গোড়া থেকেই অভেদানন্দ নিজের কার্যক্ষেত্রকে একই স্থানে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বত্র বিস্তার করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরই ঐকান্তিক যত্ন ও প্রতিভায় নিউ ইয়র্কে বেদান্তপ্রচারের কাজ স্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করেছিল। ১৮৯৯ সালে বিবেকানন্দ আমেরিকায় এসে বেদান্ত প্রচারে স্বীয় গুরুভ্রাতার সাফল্য দর্শনে খুবই আনন্দিত হন।

আমেরিকায় তাঁর বেদান্ত প্রচারের প্রথম পর্যায় হলো ১৮৯৭, আগস্ট থেকে ১৯০৬, ১৬ মে পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রচার কার্য আরম্ভ হয়েছিল ১৯০৭ থেকে ১৯২১ সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত। হিসাব করলে দেখা যাবে যে মোট চব্বিশ বছর। এর মধ্যে তাঁকে কয়েকবার ইংলণ্ডে যেতে হয়েছিল। সেইসময় তিনি কনটি-নেণ্টের কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, স্বামী অভেদানন্দের প্রচার প্রণালী শুধু বক্তৃতা বা ক্লাস করাতেই আবদ্ধ ছিল না; তিনি বহু ক্ষেত্রে বন্ধুদের বাড়িতে

অবস্থান পূর্বক তাঁদের প্রীতির সম্বন্ধকে আরো নিবিড়তর করে তুলতেন। ঘরোয়া বৈঠক ছিল তাঁর প্রচারকাজের আর একটি সাফল্যমণ্ডিত রীতি। বক্তৃতা যে কতো দিয়েছিলেন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—গীর্জা থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত—তার সীমা-সংখ্যা নেই। তিনি অপরিমিত স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তাইতো চব্বিশ বছর অমন অক্লান্তভাবে একদিকে বেদান্ত ও অন্য-দিকে রামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন আদর্শ প্রচার করে আমেরিকাবাসীর চিত্ত জয় করেছিলেন এবং তাঁরই প্রচারক জীবনে 'Hindu conquest of America' একটি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল। স্বামী অভেদানন্দের কৃতিত্ব এইখানেই।

স্বামী অভেদানন্দের দিগন্ত প্রসারিত ধর্মপ্রচারের কাহিনী আজো সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। তাঁর বক্তৃতা বক্তৃতা মাত্র ছিল না—তা ছিল দেবতার নিঃশ্বাস, এই মন্তব্যটি করেছিলেন আটলান্টা সাইকোলজিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী। আর তাঁর হিন্দুর ধর্মভাব শীর্ষক বক্তৃতাটি শুনে বিখ্যাত ইউনিটেরিয়ান ধর্মযাজক ডক্টর কার্টার বলেছিলেন, স্বামীজি, 'আমি জানি না আমি আপনাকে একজন সত্যকার ভাল হিন্দু করতে পেরেছি কিনা, কিন্তু ইহা সত্য যে, আপনার এই বক্তৃতার দ্বারা আপনি আমাকে একজন ভাল খ্রীস্টান করে তুলেছেন।' যে বাধা একদিন বিবেকানন্দের আমেরিকা বিজয়ের পথকে নানাভাবে রোধ করে দাঁড়িয়ে তাঁকে তাঁর অভীষ্ট সফলতা লাভ করতে দেয়নি, সেই বাধা অভেদানন্দকেও প্রথমাবধি ভাল করে যাচাই বাছাই করে শেষে অবনতশিরে প্রণাম করে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। তিনি অখ্রীস্টান হয়েও খ্রীষ্টানের গীর্জায় রবিবাসরীয় উপাসনা কালে আচার্যের বেদীতে বসবার গৌরব লাভ করেছিলেন। অভেদানন্দের প্রচারে তেজ ছিল, কিন্তু তাপ ছিল না; প্রাণ ছিল, মত্ততা ছিল না, বাস্তবের প্রত্যক্ষতা ছিল, স্বপ্নের কুহেলী ছিল না। ইতিহাস, ন্যায়, দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান পর্যন্ত তাঁকে ভারে ভারে

উপঢৌকন এনে অর্ঘ্য দিয়েছে। সেই অর্ঘ্যসম্ভার তিনি মুঠো মুঠো ছড়িয়ে প্রতিকূলকে অনুকূল করেছিলেন এবং অনুকূলকে শ্রদ্ধাবনত ভক্তে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু মানের ও যশের পূজা পেয়েও, কোথাও তিনি ভারত-নিন্দুককে ক্ষমা করেন নি। বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ দুজনেই ছিলেন ভারতমন্ত্রে সিদ্ধ সন্ন্যাসী, তাঁদের অক্লান্ত প্রচারব্রত দ্বারা ভারতের জাতীয় মহিমাই উচ্চকণ্ঠে, অসংশয়িত-ভাবে বিঘোষিত হয়েছে। সেদিন এর খুব প্রয়োজন ছিল—অন্তত ইতিহাসের দিক দিক দিয়ে।[১]

এইভাবে দীর্ঘকাল দক্ষতার সঙ্গে বেদান্ত প্রচার কাজ চালিয়ে, কর্মক্লান্ত সন্ন্যাসী স্বদেশে ফিরলেন ১৯২১ সালের শেষ ভাগে। তারপর তিনি আঠার বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। আমেরিকা থেকে সদ্য প্রত্যাগত প্রথিতযশা শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ তখন বাংলা তথা ভারতবর্ষের বহুজনের অন্বেষিত পুরুষ হয়ে উঠেছেন। যখন যেখানে যেতেন সেইখানেই জনসাধারণ উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে উঠত। এই মহানগরীর প্রতি রামকৃষ্ণ বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন। সেইজন্য তিনি মনে করলেন কলকাতায় একটি বেদান্তকেন্দ্র স্থাপন অত্যাবশ্যক। এরই ফলশ্রুতি রামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত বেদান্ত মঠ। ১৯২৫ সালে এটি স্থাপিত হয়। কলিকাতা ও দার্জিলিঙ এই দুই স্থানেই বেদান্তমঠ আছে। এই সময় ভারতীয় জীবনের সঙ্গে নতুন করে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়েছে; তিনি অবহিত হলেন জনসাধারণের প্রয়োজন সম্বন্ধে—বেদান্ত প্রচারের সঙ্গে সংযুক্ত হয় শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা। দেশের তরুণদের তিনি এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান করলেন।

১৯৩৭। রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক উৎসব' টাউন হলের সভায়

১. এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের লেখক প্রণীত SWAMI ABHEDANANDA : A SPIRITUAL BIOGRAPHY গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। অভেদানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী (১৯৬৬) উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠ কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়।

অভেদানন্দ সভাপতিত্ব করলেন। এই উপলক্ষে বেলুড়ে নতুন মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্মরণীয় উৎসবে তিনি ও তাঁর গুরু-ভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানদের মধ্যে সেদিন এই দুজনই জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষ দু'বছর তিনি শয্যাগত ছিলেন এবং সকল কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তবে সমাগত কাউকে তিনি ফিরিয়ে দিতেন না; বিছানায় শুয়ে শুয়েই সকলকে অমায়িক ব্যবহার ও আলাপ আপ্যায়িত করতেন। সকলকেই বলতেন: 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' ১৯৩৯, ৮ সেপ্টেম্বর সকালে স্বামী অভেদানন্দ—সংঘের সর্বজন প্রিয় 'কালীতপস্বী', বা 'কালী বেদান্তী'—সমাধিযোগে মহা-প্রয়াণ করেন। কাশীপুরের শ্মশানে তাঁর ইষ্টদেবতার সমাধির উত্তরদিকে তাঁর চিতাশয্যা রচিত হয়। গুরুর উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি, এই জন্মযোগীর চরিত্রকে একটি দিব্য মহিমায় মণ্ডিত করেছে। সেই মহিমা একান্তভাবেই আমাদের অনুভবের বিষয়, আলোচনার নয়।

এইবার অভেদানন্দ-মানসের কথা। এই মানসের অভিব্যক্তি আছে স্বামী অভেদানন্দের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে। ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা এই দার্শনিকপ্রবর ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, বেদান্ত একাধারে দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা; জ্ঞানবৃক্ষের পুষ্প হচ্ছে দর্শন এবং ফল অধ্যাত্ম-বিদ্যা বা ধর্ম। ধর্মের তাত্ত্বিক দিক হলো দর্শন আর দর্শনের প্রয়োগ হলো ধর্মে বা অধ্যাত্মবিদ্যায়। ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়ের উপর তিনি খুব বেশি জোর দিয়েছিলেন বলেই না তিনি, তাঁর ইস্টদেব কথিত অভিমতের প্রতিধ্বনি করে, মায়াকে ঈশ্বরের শক্তি বলে অভিহিত করেছেন এবং দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর খুব বেশি প্রাধান্য দিতেন। এই জন্যই অভেদানন্দ বার বার বলেছেন: বিচার-বিতর্কের সাহায্যে সত্যের স্বরূপকে জানা যায় না। 'সত্যকে জানা

মানে সত্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়া', তাঁর এই উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।

বেদান্তের সূত্র অনুসরণ করে অভেদানন্দ দেখিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভই হচ্ছে মানুষের জীবনের লক্ষ্য। এই পরিপূর্ণতা লাভ করলেই মানুষ অমর হয়। ভাগবত জীবনের সঙ্গে সে অভিন্ন হয়। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে যে বলিষ্ঠ ও মৌলিক দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে তার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন আজো হয়নি। তাঁর বাণী, এবং চিন্তাপ্রদীপ্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করলে এই রামকৃষ্ণ-সন্তানের ব্যক্তিত্ব, জীবন-চেতনা ও অসাধারণ মনীষার কথা আমরা জানতে পারি। একদিকে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত মনীষা, অপরদিকে বোধিদীপ্ত দিব্য-অনুভূতি—এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত যে অভেদানন্দ-মানস তার স্রষ্টা ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সেই দিব্য সাধক যিনি কিশোর কালী-প্রসাদকে দীক্ষার প্রথমেই উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন :

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘর শুবি।
দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি ॥

স্বামী যোগানন্দ

'আমাদের মধ্যে যদি সর্বতোভাবে কেউ কামজিৎ থাকে তো সে যোগীন।' এই উক্তিটি স্বামী বিবেকানন্দের, তাঁরই অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী যোগানন্দ সম্পর্কে।

'যোগীন আমাদের মাথার মণি।' এই কথা বলতেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

বিশাল রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যিনি যোগীন মহারাজ নামে পরিচিত তিনি ছিলেন শুকদেবতুল্য পবিত্র, ঈশ্বরকোটির একজন। তাঁর সম্পর্কে 'লীলাপ্রসঙ্গ'কার লিখেছেন: 'প্রথম আগমনদিবসে ঠাকুর ইহাকে দেখিয়া এবং ইহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট ধর্মলাভ করিতে আসিবে বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে বহুপূর্বে দেখাইয়াছিলেন, যোগীন কেবলমাত্র তাঁহাদের অন্যতম নহেন, কিন্তু যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া জগদম্বার কৃপায় তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগেরও অন্যতম।'

এই 'ঈশ্বরকোটি' অভিধাটির তাৎপর্য জানা দরকার। দক্ষিণেশ্বরে যখন অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তদের সমাগম হতো তখন নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন রামকৃষ্ণ। সেই আলোচনার মধ্যে বহুল ব্যবহৃত কথা দুটির একটি হলো 'জীবকোটি', অপরটি 'ঈশ্বরকোটি'। এটি একটি নিগূঢ় তত্ত্ব। এই তত্ত্ব একদিন ঠাকুরের পা টিপতে টিপতে জানতে চেয়েছিলেন কালীপ্রসাদ। 'তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন: ব্রহ্ম সকলের মধ্যে আছেন

সত্য, কিন্তু সবার শক্তি প্রকাশে তারতম্য আছে। এই প্রকাশের তারতম্যেই ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি হয়। জীবকোটি নিজে মুক্তি পান, অপরকে মুক্তি দিতে বা উদ্ধার করতে পারেন না। কিন্তু যিনি নিজে উদ্ধারলাভ করে অপরকেও উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরকোটি। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির মধ্যে এই প্রভেদ। কেউ কেউ আবার ঐ শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন।'[১]

স্বামী যোগানন্দ, শ্রীমায়ের সেবক ও সন্তান, এই শক্তি নিয়েই রামকৃষ্ণ-লীলার অন্যতম সহচররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনন্য-সাধারণ মহাপুরুষ। দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশে ১৮৬১, ৪ঠা মার্চ তাঁর জন্ম। কথিত আছে, এঁদের প্রতাপে সেকালে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খেতো। এঁরা লোকের জাত নিতে এবং দিতে পারতেন। নিষ্ঠাবান্ ধর্মপরায়ণ এই ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই রামকৃষ্ণ-লীলাসহচর। পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন বটে, কিন্তু বিষয়-বিমুখ মানুষ ছিলেন তিনি। তাই তাঁকে দারিদ্র্যগ্রস্ত হতে হয়। যোগীন তখনো কৈশোর অবস্থা অতিক্রম করেন নি। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুর আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন ; চৌধুরীবাড়ির পূজা-পার্বণে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। মন্দিরের খুব কাছেই ছিল তাঁদের বাড়ি। যোগীন প্রায়ই রানি রাসমণির বাগানে আসতেন ফুল তুলতে। তাঁর বয়স যখন পনর কি ষোল তখন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের লেখা পড়ে তিনি রামকৃষ্ণদেবের কথা জেনেছিলেন। কিন্তু তাঁর আভিজাত্য আর গ্রাম্য সংস্কার, কেশব সেন কথিত দক্ষিণেশ্বরের এই সাধুটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ হয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একদিন। সকালবেলা। যোগীন বাগানে এসেছেন ফুলের জন্য। তাঁর পাশ দিয়ে খালি গায়ে ও সাজি হাতে একজনকে

১. আমার জীবন কথা : স্বামী অভেদানন্দ।

দেখতে পেয়ে, তাকে বাগানের মালি বলে মনে হয়েছিল। তাই সরল মনে তাকে তাঁর ঈপ্সিত ফুলটি তুলে দিতে বললেন। 'মালি' তুলে দিলেন। কিশোর খুশি মনে ফিরে এলেন। আর একদিন। যোগীন এসেছেন রামকৃষ্ণ-দর্শনে। দেখেন ঘরের মধ্যে একটি তক্তপোষের ওপর বসে রয়েছেন সেই ব্যক্তি যাঁকে তিনি মালি বলে মনে করেছিলেন। ঘরের মধ্যে কয়েকজন লোক—তাঁরা চুপ করে বসে শুনছেন মালি যা বলছেন। উপদেষ্টা অবিরাম তত্ত্বকথা বলে যাচ্ছেন। তবে কি ইনিই রামকৃষ্ণ? ঘরের বাইরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যোগীন এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন। লজ্জিতও হলেন একটু। এঁকেই তিনি ফুল তুলে দিতে বলেছিলেন! ভেতরে ঢুকতে তাঁর সাহস হচ্ছিল না। একজন ভক্তকে রামকৃষ্ণ বলছেন, বাইরে যারা রয়েছে তাদের সবাইকে ভিতরে আসতে বলো। বাইরে কিন্তু তখন একজনই ছিলেন। তিনি যোগীন। যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী। ভক্তটি তাঁকে ভেতরে নিয়ে এলেন। একটি আসন দিলেন বসবার জন্য। ভক্তরা সব একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ঘরের মধ্যে রইলেন শুধু দুজন—ঠাকুর আর যোগীন। সস্নেহে তাকে কাছে ডাকলেন, নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলেন। গায়ে হাত দিয়ে বলেন, তুমি তো এখানকার। মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তুমি ঈশ্বরকোটি। সময় পেলেই আসবে। এই বলে ঘরের কুলুঙ্গীতে রাখা মায়ের প্রসাদী একটা সন্দেশ নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন। এক গেলাস জলও দিলেন। কিশোর বিস্মিত—এ কি করুণা!

অঙ্ক কষে দেখতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত ষোলটি সন্তানদের মধ্যে তাঁর কাছে প্রথম এসেছিলেন যোগানন্দ। ১৮৭৬ থেকেই তিনি আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে তাঁর ছিল আশৈশব সম্বন্ধ। ঈশ্বরলাভের দিব্য সহজাত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তাঁর জন্ম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠতে থাকে

তাঁর মনের মধ্যে। তাঁর শৈশবস্মৃতি প্রসঙ্গে যোগানন্দ নিজেই বলেছেন: 'খুব ছেলেবেলায় এক অভাবনীয় ভাবনায় আমি বিভোর থাকতাম। আমার বয়স তখন পাঁচ কি ছয় বছর হবে। খেলাধুলা করতে করতে হঠাৎ অনন্তের ডাক এসে আমাকে অন্যমনস্ক করে তুলত। আমি তখন উদাস প্রাণে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, এ কোথায় এসেছি? আমি তো এখানকার লোক নই। মনে হতো, সুদূরের ঐ নক্ষত্ররাজির মধ্যে আমি যেন গলায় তারার মালা পরে বসে আছি। মনে হতো, আমার খেলার সাথী ঐ ওখানে আছে, এখানে নয়। মাঝে মাঝে সেই জ্যোতির্ময় দেশে যাবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হতো।'[১]

এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের এই সন্তানটি একজন ক্ষণজন্মা ছিলেন। গীতায় বলা হয়েছে, এই জাতীয় মহাপুরুষ মাত্রে 'শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে' অর্থাৎ সুপবিত্র সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই এটা সম্ভব হয়ে থাকে। চৈতন্য-লীলার পার্ষদগণের জীবনে আমরা দেখেছি তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন সদ্বংশ জাত এবং প্রত্যেকের পিতামাতা ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও ধর্মপ্রাণা। মহাকাল অর্থাৎ ইতিহাস আগে থেকেই এঁদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, পরিবেশ রচনা করে রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণ-লীলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি—প্রত্যেকটি লীলাসহচর জন্মেছিলেন উচ্চবংশে এবং এক ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে। কোনো যুগাবতারের আবির্ভাবের আগেই তাঁর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম ও ধারা। তিনি আবির্ভূত হয়ে সেই ক্ষেত্রে বীজ বপন করলেই সময়ে নানা মহীরুহের জন্ম হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় তখন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই শুভ বার্তা সংবাদপত্রে প্রথম জানালেন কেশবচন্দ্র। তখন

---

১. APOSTLES OF RAMAKRISHNA : Swami Gambhirananda.

তাঁকে দেখবার জন্য লোকে দলে দলে দক্ষিণেশ্বরে যেতে আরম্ভ করেছিল। সমকালীন বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সেই সময় শহর কলকাতায় এবং তার চারপাশে ধর্মের একটা স্রোত বইতে আরম্ভ করেছিল। ইতিহাসের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতেই বাঙালি তখন ভগবানের কৃপা এবং আশীর্বাদ লাভ করবার জন্য সচেষ্ট হচ্ছিল। কত সদনুষ্ঠান, কত ধর্মান্দোলন আর হরিনাম-কীর্তনের পাশাপাশি উত্থিত হতো ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে ব্রাহ্মো কৃপাহি কেবলং-এর পবিত্র ধ্বনি। দেশের বাতাস তখন কিছু ফিরতে আরম্ভ করেছিল—রামকৃষ্ণ নিজেই তা বলে গিয়েছেন।

ইতিহাসের এক শুভক্ষণে দক্ষিণেশ্বর থেকে উঠেছিল শঙ্খনিনাদ: 'ভগবান কারো একার নন। তিনি সকলেরই সেই চাঁদা মামা। পথের সন্ধানে কেন কালক্ষয় করবে? জেনো—যত মত তত পথ।' উদ্যতফণা নরেন্দ্রনাথ দত্ত সেই পূজারীর পায়ে মাথা বিক্রী করলেন, সাকার মানলেন—মানলেন তিনি কালী। একে একে যাঁরা এসে-ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে সকলেরই সেই একই অনুভূতি। যে যেমন মন নিয়ে তাঁর কাছে এলো, ফিরে যাবার সময় দেখল যে, তাতেই রঙ্ লেগে গিয়েছে। দেহ দক্ষিণেশ্বর থেকে দূরে চলে যায়। কিন্তু মন পড়ে থাকে সেইখানেই, সেই অদ্ভুত ঠাকুরের চরণতলায়। এই দেব-মানবের চরণরেণু থেকে যে-কয়েকটি কণা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল তারই একটি ছিলেন স্বামী যোগানন্দ। সরল মহাত্যাগী, কঠোর তপস্বী এবং শুকদেবের মতোই পরম পবিত্র এই রামকৃষ্ণ-সন্তানের জন্ম শুধু সদ্বংশে হয়নি, ধর্মভাবের অনুকূল এক দিব্য পরি-বেশের মধ্যেও বটে। চৌধুরীবাড়ি সর্বদাই ভাগবত পাঠ ও কীর্তন-গানে মুখরিত থাকত। কিন্তু এহো বাহ্য। যুগাবতারের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সীমার মধ্যেই ছিল চৌধুরীদের বাসস্থান। সেইজন্য যোগীন্দ্রনাথের শৈশব জীবন এক দিব্য পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর লীলা সহচরদের মধ্যে আর কারো জীবনে এমন

দুর্লভ সৌভাগ্যলাভ ঘটেনি। আবার এই চৌধুরীবাড়ির ধূলো তাঁরই চরণস্পর্শে পবিত্র ছিল।

তাই তো প্রথম দর্শনে ঠাকুর তাঁর এই সন্তানের পরিচয় পেয়ে আনন্দের সঙ্গে তাঁকে বলেছিলেন : 'তবে তো তুমি আমাদের চেনা ঘর গো! তোমাদের বাড়িতে আমি তখন কত যেতুম, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি শুনতাম—তোমাদের বাড়ির কর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বড় যত্ন করতেন। ভক্তিমানও সব খুব ছিলেন। জানা-শোনা হলো। বেশ হলো—এখানে যাওয়া-আসা করো। মহদ্বংশে জন্ম—তোমার লক্ষণ বেশ সব আছে। বেশ আধার খুব (ভগবদ্ভক্তি) হবে।'[১]

আট বছর বয়স হোল। নবীনচন্দ্র পুত্রের উপনয়নের ব্যবস্থা করলেন। এই বংশে সকল ছেলেরই আট বছর বয়সে পৈতা দেওয়া রীতি। যোগীনের ক্ষেত্রে সেই চিরাচরিত রীতির কোনো ব্যতিক্রম হলো না। পৈতে হবে, বালকের সে কি আনন্দ। উপবীত ধারণ করে তিনি দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হবেন। ব্রাহ্মণ হবেন—এই কথা মনে হতেই কি একটা দিব্যভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে বালকের চিত্ত। পৈতা হওয়ার পর ঠাকুরঘরে প্রবেশ করবার অধিকার পেলেন—পুজো করার, ধ্যান করার সুযোগ মিলল। প্রাণে তৃপ্তি পেলেন। পূজা ও ধ্যানের মাত্রাটা এখন যেন একটু বেড়ে গেল। যথাসময়ে নবীনচন্দ্র ছেলেকে আগড়পাড়া মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সকাল সন্ধ্যায় রাসমণির বাগানে বেড়ানো যোগীনের অভ্যাস ছিল। তখন থেকেই তিনি পরমহংসদেবের নাম শুনেছিলেন এবং তাঁকে দেখবার ইচ্ছাও মনের মধ্যে পোষণ করতেন। কিন্তু বাধা দিত স্বাভাবিক সঙ্কোচ। তাছাড়া, তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, দক্ষিণেশ্বরের এই পাগল ঠাকুরটি সম্বন্ধে তেমন উঁচু

১. লীলাপ্রসঙ্গ : স্বামী সারদানন্দ।

ধারণার আভাস কিছু পাননি। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, 'প্রদীপের ঠিক নিম্নস্থলে অন্ধকার থাকার ন্যায় যুগাবতারের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে তখন বিরুদ্ধ সমালোচনাই হইত।'

তারপর কেশবচন্দ্র সেন তাঁর বিষয়ে কাগজে লিখলেন এবং রামকৃষ্ণকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত করে দিলেন। সেই লেখা পড়েই তো মিশনারী স্কুলের ছাত্র যোগীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য অস্থির হলেন। কিন্তু পরিচয় করিয়ে দেবে কে? কিভাবে তাঁর মনের এই অভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল সে ঘটনা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সেই থেকে তিনি ঘন ঘন ঠাকুরের কাছে আসতে থাকেন। আসতেন তিনি গোপনে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে। এর একটা কারণ ছিল। কেশব সেনের প্রচার সত্বেও, দক্ষিণেশ্বরের অধিবাসীদের চোখে রামকৃষ্ণ একজন পাগল। 'লোকটার জাতবিচার নেই'—এমন অপবাদও লোকের মুখে মুখে তখন ফিরত। তাই যোগীনকে লুকিয়ে আসতে হতো। কারণ তিনি বড় বংশের ছেলে, একটা পাগলের কাছে যাওয়া আসা করছেন, এটা জানাজানি হলে অনর্থ বাধতে পারে ; আপত্তি তো উঠবেই। কিন্তু সত্য চাপা থাকে না। তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা করেন শুনে তাঁর সমবয়স্ক সঙ্গীদের সে কি ঠাট্টা বিদ্রূপ। 'যোগীন রামকেষ্টর চেলা বনে গেছে'—স্কুলের সহপাঠীরা পর্যন্ত তাঁকে এইভাবে ঠাট্টা করতে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, 'পিতা ও মাতা সব শুনিয়াও বাধা দিলেন না, কারণ তাঁহারা জানিতেন, সে বাধা নিষ্ফল হইবে।'

জানাজানির পরেও দক্ষিণেশ্বরেশ্বর তাঁকে যেন প্রবলভাবে টানতে থাকেন। এমনিতেই যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন একটু নির্জনতাপ্রিয়—হৈ হল্লা বা গোলমাল থেকে তিনি সর্বদাই দূরে দূরে থাকবার চেষ্টা করতেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরটি তখন তাঁর মনোরাজ্য অধিকার করে বসেছেন। কখন তাঁর কাছে আসতেন, কখনই বা ফিরে যেতেন, কেউ তা জানতে পারত না—ঠাকুরের যাঁরা নিয়ত সঙ্গ

করতেন তাঁরা পর্যন্ত নন। এর অনিবার্য ফল যা হবার তাই হলো —তাঁর মনে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হলো। বৈরাগ্যের পঞ্চাগ্নি যেন সর্বক্ষণ তাঁর চারদিকে একটা পরিমণ্ডল রচনা করে রাখতো।

যথাসময়ে যোগীন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করলেন। পিতার ইচ্ছা তিনি পড়াশুনা করেন, কিন্তু ছেলের পড়াতে আর মন বসল না। কি করেই বা লেখাপড়া করবেন? ঠাকুর যে তাঁকে এখন অন্য ভাবের ভাবুক করেছেন—সেই ভাবের সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষার সামঞ্জস্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন হলো। ঠাকুরকে একদিন একান্তে পেয়ে যোগীন জিজ্ঞাসা করলেন: কেমন করে ঈশ্বরলাভ হয়?

—কাম-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে ঈশ্বরলাভ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই উত্তর সেদিন, আমরা অনুমান করতে পারি, যোগীনের মনের গতি পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন: বিয়ে করবেন না, সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। কিন্তু সংসারের অনটন তাঁকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। তিনি বাড়ির বড় ছেলে, পিতা বৃদ্ধ। আবার একদিন এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন: সংসার-জীবনে কর্তব্য কি?

উত্তর পেলেন: পিতামাতার সেবা।

—তা হলে তো অর্থোপার্জন করতে হয়।

—হ্যাঁ, যতটুকু প্রয়োজন আর যত দিন প্রয়োজন।

অতঃপর যোগীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন, বিয়ে না করে, সংসারে লিপ্ত না হয়েও তিনি চাকরি করবেন এবং পরিজনদের ভরণপোষণ করবেন। তবে অবসর কালটা তিনি সাধন-ভজনেই কাটাবেন। একদিন সব কথা তাঁর বাবাকে বললেন এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে, চাকরির সন্ধানে তিনি কানপুর চলে গেলেন। সেখানে তাঁর এক মেসোমশাই থাকতেন। এ ঘটনা ১৮৮৪ সালের। কিন্তু তাঁর ভাগ্য প্রসন্ন ছিল না; অনেক চেষ্টা করেও কোন কাজ জুটল না।

তখন তাঁর মেসো একদিন তাঁকে বললেন : তোর হাতটা একবার দেখি। ডান হাতটা খুলে দেখালেন তাঁকে। তিনি কিন্তু হস্ত রেখাবিদ্‌ ছিলেন না। কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে হাতের রেখাগুলি পরীক্ষা করতে করতে বলেন : তোর অদৃষ্টে চাকরিযোগ নেই দেখছি।

—অন্য কোনো যোগ আছে কিনা দেখুন।

—হাঁ একটা যোগ আছে দেখছি।

কি ?

—ধ্যানযোগ।

এই বলে মেসোমশাই হেসে ফেললেন। আসল কথা, কানপুরে আসার পর যোগীনের মতিগতি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, এই ছেলে দিনরাত যে রকম ধ্যান-জপ নিয়ে থাকে, তাতে তার চাকরি হওয়া কঠিন ; হলেও চাকরিতে তার মন ঠিক বসবে কিনা, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যোগীনের মাসীমাও তাঁর স্বামীর এই অভিমত সমর্থন করেছিলেন। উপরন্তু তিনি বলেছিলেন : বাড়িতে চিঠি লিখে দাও ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করতে।

চাকরি হোল না। শাপে বর হলো। যোগীন্দ্রনাথ 'দীর্ঘ অবসর বৃথা নষ্ট না করিয়া ধ্যান-জপের সময় বাড়াইয়া দিলেন। তিনি যতই অন্তররাজ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন, বাহিরে ততই তাঁহার গাম্ভীর্য ও উদাসভাব স্পষ্টতর হইতে লাগিল।' বলা বাহুল্য, তাঁর মেসো এটা লক্ষ্য করলেন। তাঁরা ঘোরতর সংসারী মানুষ ; এই রকম উচ্চ জীবনের সঙ্গে তাঁদের কোনো পরিচয় ছিল না। সংসারী মানুষের দৃষ্টিতে যোগীনের এই ভাবটাকে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ মনে করলেন। কলকাতায় যোগীনের পিতার কাছে চিঠি গেল : ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে দেওয়া দরকার। নতুবা বিপথগামী হয়ে যেতে পারে।

চিঠি পেয়ে চৌধুরী মশাই চিন্তিত হলেন। অবিলম্বে বিয়ের

সমস্ত আয়োজন ঠিক করলেন। ছেলের স্বভাব তিনি বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন। তাই বিয়ের কথা উল্লেখ না করে তিনি কানপুরে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন: যোগীনকে পত্রপাঠ মাত্র এখানে পাঠিয়ে দাও; বাড়িতে অসুখ। খবরটা পেয়ে যোগীন ভাবলেন, হয়ত মায়ের অসুখ। কিছুমাত্র বিলম্ব না করে তিনি কলকাতায় এলেন। বাড়িতে পদার্পণ করে সোজা তাঁর মায়ের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। পরের ঘটনা রীতিমত নাটকীয়।

কোথায় অসুখ? কার অসুখ? সবাই তো সুস্থ রয়েছেন। উপরন্তু গৃহের পরিবেশটার মধ্যে তিনি একটি প্রচ্ছন্ন উৎসবের আভাস পেলেন। কারো মুখে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের ছায়া নেই। ব্যাপার কি? তখন নবীনচন্দ্র ছেলেকে সব কথা খুলে বললেন। তোমার বিয়ে ঠিক করেছি—পিতার মুখে এই কথা তিনি যখন শুনলেন তখন পুত্রের মনে হলো কে যেন তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত করল, অথবা কে যেন তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল। হতবুদ্ধি যোগীন্দ্রনাথ তাঁর বাবাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন: আমি বিয়ে করব না।

—বিয়ে পাকা হয়ে গেছে। পরশু তোমার বিয়ে।

—আমাকে না জানিয়ে—

—তোমাকে জানাবার দরকার ছিল না।

—বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হব না, এই আমার জীবনের সংকল্প, বাবা।

—তুমি কি আমাকে সমাজের কাছে অপদস্থ করতে চাও?

—আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।

—আমিও অবাধ্য ছেলের মুখদর্শন করব না।

পিতা-পুত্রের এই কথা কাটাকাটির মধ্যে যোগীনের মা এসে ছেলের হাত দুটি ধরে কেঁদে বললেন: আমার কথা রাখ, বাবা। অমত করিস না। কর্তার মুখ রাখ। তিনি মেয়ের বাবাকে কথা দিয়ে ফেলছেন।

—সবই তো বুঝলাম মা। কিন্তু—

—কিন্তু নয় বাবা। ইচ্ছে না থাকলেও আমার জন্য বিয়ে কর।

একদিকে ক্রুদ্ধ পিতা, অন্যদিকে ক্রন্দনরতা জননী। মায়ের চোখের জল তাঁর সংকল্পের ভিৎ টলিয়ে দিল। তারপর? 'মাতৃভক্তির বেদীতে স্বীয় সংকল্পকে বলি দিয়া যোগীন বিবাহে সম্মত হইলেন। যথাসময়ে নবপরিণীতা বধূ গৃহে আসিলেন; কিন্তু যোগীনের বৈরাগ্য অটুট রহিল—বাসরগৃহে প্রবেশকালে তাঁহার বিষাদ-গম্ভীর হৃদয় মথিত করিয়া অস্ফুট ধ্বনি উঠিল, হরিবোল, হরিবোল।'

আজ, এই সুদূর কালের ব্যবধানে, এই দৃশ্য কল্পনা করতেও আমাদের মনে শিহরণ জাগে।

দিন যায়। মনের শান্তি হারালেন যোগীন্দ্রনাথ। ভগবানের এ কি পরিহাস? বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করব না—এই সংকল্প করে-ছিলাম। সে সংকল্পচ্যুত হতে হলো আমাকে। কোথায় গেল আমার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা, আমার উচ্চ চিন্তা? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে। ঠাকুরের কাছে কি করে মুখ দেখাব? তিনি কি আর আমাকে ভালবাসবেন? কাম-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি আমাকে। সে উপদেশ বৃথা হলো। কি হবে আর তাঁর কাছে গিয়ে? এই রকম নানা চিন্তার পর তিনি ঠিক করলেন যে, আর ঠাকুরের কাছে যাবেন না।

এইবার যোগীন্দ্রনাথের জীবনের এই নাটকীয় ঘটনার শেষ দৃশ্য আমরা দেখব। অন্য সূত্রে তাঁর বিয়ের খবরটা রামকৃষ্ণের কাছে পৌঁছেছিল। স্বভাবতই তিনি তাঁর চিহ্নিত সন্তানটিকে দেখবার জন্য অস্থির হলেন। লোক দিয়ে বার বার খবর পাঠালেন। তবু যোগীন এলেন না। অবশেষে ঠাকুর কৌশল করে তাঁর সন্তানটিকে আনালেন। সেই ঘটনাটি তাঁর এক জীবনীকার এইভাবে বর্ণনা

করেছেন: 'যোগীন ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বর বাগানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠাকুরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তিনি ছোট চৌকির উপর বিবস্ত্র হইয়া বসিয়া আছেন; তাঁহাকে দেখিয়াই ছোট ছেলের মতো কাপড়খানি বগলে ফেলিয়া কাছে আসিলেন। বহুদিন বাঞ্ছিত নিধিকে আজ একবারে সম্মুখে পাইয়া ভাবময় পুরুষের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল। কি যেন এক অদ্ভুত শক্তি আজ তাঁহার সমস্ত দেহমনকে চকিত করিয়া তুলিল। হাত ধরিয়াই বলিলেন, বে করেছিস—তা কি হয়েছে? এই যে আমি বে করেছি। বে করেছিস, তা ভয় কি? (নিজের বক্ষে হস্ত রাখিয়া) এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না।'[১]

'বে করেছিস তা কি হয়েছে?'

সেই পুণ্যপুরুষের মুখে এমন অভিনব কথা,—এমন আশার বাণী শুনে যোগীন্দ্রনাথের মন এক অব্যক্তভাবে পূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর মন থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল। শান্ত মনে তিনি সেদিন বাড়ি ফিরলেন। সেই থেকে মন্দিরে আবার যাওয়া-আসা করতে থাকেন এবং দিনের বেশির ভাগ সময় তাঁর ইষ্টদেবতার কাছেই অতিবাহিত হতো। ক্রমে তিনি সংসার সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়ে ওঠেন। এমন কি, তিনি যে বিবাহিত, সে কথাও বিস্মৃত হলেন। গৃহ-পরিজন সম্পর্কে ছেলের এই নির্লিপ্তভাব তাঁর মা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। একদিন মাতা ও পুত্রের মধ্যে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো। যোগীনের সরল মনে আঘাত লাগে। বৈরাগ্য তীব্রতর হয়ে ওঠে। এরপর তিনি ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে রাত কাটাতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রত্যেকটি সন্তানকে তাদের নিজ নিজ ভাব-অনুসারে গড়ে তুলতেন—কারো ভাব ক্ষুণ্ণ করতেন না। নিষ্ঠাবান

১. ভক্তমালিকা: স্বামী গম্ভীরানন্দ।

যোগীন কারো বাড়িতে কিছু খাওয়া দূরে থাক, জলগ্রহণ পর্যন্ত করতেন না। ঠাকুর এটা জানতেন। 'একদিন তিনি যোগীনের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরিয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময় বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। যোগীনের সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই—মাত্র জলযোগ করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন। ঠাকুরও তাঁহার আচারনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া কোথাও আহারাদির বিষয় উত্থাপন করেন নাই। সেইজন্য বলরামবাবুর বাড়িতে আসিয়াই তাহাদিগকে বলিলেন, ওগো, এর আজ খাওয়া হয়নি, একে কিছু খেতে দাও। বলরামবাবু ঠাকুরের কথায় যোগীনকে সাদরে জলযোগ করাইলেন। বলরামের প্রদত্ত দ্রব্যাদিকে ঠাকুর পবিত্র মনে করিতেন বলিয়া যোগীনের মনেও বলরামের গৃহ ও স্বয়ং বলরামের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল; তাই সেদিন নির্বিবাদে আহার করিতে পারিলেন।'[১]

সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাঁর এই সন্তানটির উপর রামকৃষ্ণ বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং নানাভাবে তাঁকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করেছিলেন। তাঁর কথাই ছিল, 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?' নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে তিনি সুন্দরভাবে কত শিক্ষাই না দিতেন। ব্যবহারিক জীবনে সেসব শিক্ষার বিশেষ মূল্য ছিল। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ এখানে করছি। তাঁর এই ভাবুক ও শান্ত প্রকৃতির সন্তানটি মূর্তিমান সাত্ত্বিক ছিলেন। সাধকের জীবনে সাত্ত্বিকতা ভাল, কিন্তু মিথ্যা সাত্ত্বিকতার মোহ ভাল নয়। ঠাকুর সময় বুঝে যোগীন্দ্রনাথকে একদিন এই বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি ছিল এই: ঠাকুরের কাপড়চোপড় যে বাক্সটির মধ্যে থাকত তার মধ্যে আরসুলা দেখতে পেয়ে তিনি যোগীনকে বললেন, এটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেল। যোগীন আরসুলাটিকে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন বটে, কিন্তু তাঁর সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে বাধল। না মেরেই

১. তদেব

সেটিকে ছেড়ে দিলেন। কেন অকারণ জীবহত্যা করব?—এই ছিল তাঁর মনের কথা। তিনি ফিরে আসতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, কিরে ওটাকে মেরে ফেলেছিস তো?

—না মশায় ছেড়ে দিয়েছি।

—আমি তোকে মেরে ফেলতে বললুম—তুই কিনা সেটাকে ছেড়ে দিলি!

—ভাবলাম, খামকা মারব কেন?

—তোর সাত্ত্বিকীভাব রেখে দে, যেমনটি করতে বলব, ঠিক তেমনটি করবি। নিজের মতে কখনো চলবি না, পস্তাতে হবে।

তাঁর ইস্টদেবের এই শিক্ষাটি যোগীন্দ্রনাথ আর কোনদিন বিস্মৃত হননি।

চিকিৎসার জন্য রামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরের বাগান বাড়িতে আছেন। অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে যোগীনও সেখানে থাকতেন সেবাপরিচর্যার জন্য। শ্যামপুকুরের বাসায় যখন ঠাকুরকে প্রথম নিয়ে আসা হয় তখন বাড়ি থেকে যোগীন সেখানে যেতেন। নরেন, রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়টা তাঁর শ্যামপুকুর ও কাশীপুরেই সংসাধিত হয়েছিল। শ্যামপুকুরের বাসায় রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুরের কালীপূজার অনুষ্ঠান দেখে যোগীন্দ্রনাথ রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই পূজা হয়েছিল শাস্ত্রোক্ত পঞ্চোপচারে। ঠাকুর নিজের হাতে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দান করলেন এবং তারপর পূজার দ্রব্যাদি নিজের মধ্যে বিরাজমানা জগন্মাতাকে নিবেদন করলেন। তারপর উত্তরাস্য হয়ে বসে সমাধিস্থ হলেন; হাতদুটিতে বরাভয়মুদ্রা। এই অপূর্ব দৃশ্য যোগীনের স্মৃতিপটে চিরকাল বিরাজমান ছিল—উপস্থিত সকলের স্মৃতিপটেও ছিল।

ঠাকুরকে কাশীপুরে নিয়ে আসা হলো। সেবক সন্তানগণ পালা করে সেবা-শুশ্রূষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁরা যেন এক

পরিবারের সন্তান—কেউ ঘর পরিষ্কার করেন, কেউ বাসন মাজেন, কেউ বাজার করেন—ঐভাবে তাঁরা কাজ ভাগ করে নিয়েছিলেন। এখন তাই সন্তানদের এখানেই থাকতে হয়। তাঁদের ইষ্টদেবের সেবা-পরিচর্যায় প্রত্যেকেই প্রাণমন ঢেলে দিয়েছিলেন। সেবা-শুশ্রূষার সঙ্গে চলতে থাকে তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন জপ, ধ্যান ও সাধন-ভজন। কাশীপুর সেদিন হয়ে উঠেছিল একটি নিবিড় তপস্যার ক্ষেত্র। সেই তপস্যার ইতিহাস আজো সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। এখানেই নরেন, রাখাল, তারক প্রভৃতির দৃষ্টি যোগীনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। শান্ত, ধীর, স্থির এবং মধুর ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির এই তরুণ সাধকের মুখমণ্ডলে যেন সর্বদা একটা দিব্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে থাকত। এইখানেই তাঁর ধ্যানের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। 'কাশীপুরে একসঙ্গে ছিলুম; যোগীন খুব ধ্যান করতো।' এই সাক্ষ্য দিয়েছেন মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ।

কাশীপুরে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদানের বিরাম ছিল না। অসুখ দিন দিন বৃদ্ধির পথে, গলায় ব্যথা, তবু, লীলাবসান আসন্ন জেনে, তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের শিক্ষাদানে তৎপর ছিলেন। এই দেখে যোগীন একদিন নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, এ নিশ্চয়ই দেবদেহ। নতুবা এইরকম অসুস্থ অবস্থায় এইভাবে আমাদের অনর্গল উপদেশ দেওয়া, একি সোজা কথা। উত্তরে নরেন বলেছিলেন, জানো যোগিন, উনি যে যুগাবতার—এই বিশ্বাস আমার সেদিন হয়েছিল যেদিন দক্ষিণেশ্বরে আমার সকল সংশয় দূর করে, উনি আমার নাস্তিকতার অজ্ঞানাবরণ চিরদিনের মতো অপসারিত করে দিয়েছিলেন।

পৌষ সংক্রান্তির দেরী নেই। গঙ্গাসাগরে মেলা হবে। এই উপলক্ষে শহরের জগন্নাথ ঘাটে অনেক সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হয়। বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) সাধুদের শীতবস্ত্র দেবার জন্য বারোখানা কাপড় কিনে এনেছিলেন এবং গেরু-মাটি দিয়ে সেগুলি

রঙ করছিলেন। বারোটা রুদ্রাক্ষের মালাও সাধুদেরকে দান করবার জন্য তিনি কিনে এনেছেন। তখন লীলাময়ের মনে একটি ইচ্ছা জাগল: সন্তানদের তিনি নিজের হাতে সন্ন্যাস দিয়ে যাবেন। তখন তিনি গোপালচন্দ্রকে ডেকে বললেন: 'জগন্নাথঘাটের সাধুদের গেরুয়া কাপড় দিলে যে ফল হবে, তার হাজার গুণ বেশী ফল হবে যদি এগুলো আমার ছেলেদের দিস। এদের এক একজন হাজার সাধুর সমান।'

গোপালচন্দ্র তাই করলেন। তারপর ঠাকুর সেই বারোখানি গেরুয়া বস্ত্র এবং রুদ্রাক্ষের মালা স্পর্শ ও মন্ত্রপূত করে দিলেন। কাশীপুর বাগানবাড়িতে উপস্থিত তাঁর এগারজন সেবক-সন্তানকে এক-একখানা গেরুয়া কাপড় ও একটি রুদ্রাক্ষের মালা দান করবার জন্য বুড়ো গোপালকে আদেশ করলেন এবং তাঁকেও নিতে বললেন। তিনি সেই গৈরিক বস্ত্রগুলি ও রুদ্রাক্ষের মালা ঠাকুরের সামনে যোগীন্দ্রনাথ প্রমুখ গুরুভাইদের পরিয়ে দিলেন। গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে এবং রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে ধারণ করে সন্তানগণ যখন এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন তখন মনে হলো যেন কয়েকটি বালসূর্য এসে উদিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরম পুলকিত হয়ে তাঁদেরকে আশীর্বাদ করলেন। অবশিষ্ট বস্ত্রখানি বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্য রেখে দিতে বললেন।

ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে আমরা যদি এই ঘটনাটি দেখি এবং বিচার করি তা হলে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ত্যাগী সন্তানগণ যেদিন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, সে দিনটি ছিল শুধু বাংলার নয়, শুধু ভারতেরও নয়, বৃহত্তর ভারতের এবং তারো পারে নানা দেশ-মহাদেশের ইতিহাসে

রামকৃষ্ণসংঘে ইনি 'বুড়ো গোপাল' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর গুরু-ভ্রাতাদের মধ্যে তো বটেই, এমন কি ঠাকুরের অপেক্ষাও ইনি বয়সে কয়েক বছরের বড় ছিলেন।

একটি শুভদিন। সেদিন এই তরুণ তাপসবৃন্দের হৃদয়ে সকলের অলক্ষ্যে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ যে পবিত্র হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, কিছুকাল পরেই তার দক্ষিণাবর্ত শিখাগুলির স্পর্শে ধর্মের নামে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের আবর্জনাগুলি ভস্মসাৎ হতে আরম্ভ হয় এবং বেদান্তের পাঞ্চজন্যনিনাদে সংবর্ধিত হয়ে ভারত-সংস্কৃতির বিজয়-বৈজয়ন্তী দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করলেন।

এর এক পক্ষ কাল পরেই শ্রীমা বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। সঙ্গে গেলেন যোগীন, লাটু, কালী, গোলাপ-মা প্রভৃতি। পথে ট্রেনে তাঁর ভীষণ জ্বর হয়। ঠাকুরের কৃপায় সে যাত্রায় তিনি বসন্তরোগ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। 'বৃন্দাবনে ঠাকুর একদিন মাকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যোগেনকে এই মন্ত্র দাও। প্রথম দিন মা ঐ দর্শন মাথার গোলমালে হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনেও ঐরূপ দেখিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। তৃতীয় দিন ঐ দর্শন আবার উপস্থিত হইলে মা ঠাকুরকে বলেন, আমি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কই না, কি করে মন্ত্র দিই? ঠাকুর বলিলেন, তুমি মেয়ে-যোগেনকে (যোগেন-মা) বলো, সে থাকবে। মা আমার দ্বারা যোগানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার মন্ত্র হইয়াছে কি না। যোগানন্দ স্বামী বলিলেন, না, মা, বিশেষ কোন ইষ্টমন্ত্র ঠাকুর আমাকে দেন নি। আমি নিজের রুচি মত একটি নাম জপ করি। ঐ কথা জানিয়া মা তাঁহাকে একদিন মন্ত্র দিলেন। ঠাকুরের ছবি ও দেহাবশেষ-রক্ষিত কৌটা সম্মুখে রাখিয়া মা পূজা করিতেছিলেন। তিনি যোগানন্দস্বামীকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন। পূজা করিতে করিতে মায়ের ভাবাবেশ হইল, সেই ভাবাবেশেই মা মন্ত্র দিলেন। এমন জোরে মন্ত্র বলিলেন যে পাশের ঘর হইতে আমি উহা শুনিতে পাইলাম।'[১]

১. যোগেন-মার স্মৃতিচারণ : শ্রীশ্রীমায়ের কথা (প্রথম ভাগ)

বৃন্দাবন থেকে ফিরে বরাহনগর মঠে আর সব গুরুভাইদের মতো যোগীন্দ্রনাথ সন্ন্যাস নিয়ে 'স্বামী যোগানন্দ' নামে পরিচিত হন। অতঃপর তিনি তীর্থদর্শনে বের হন। কিন্তু তাঁর পক্ষে বেশি দিন বাইরে থাকা সম্ভব হয় নি। কারণ, ১৮৮৮ সালের মাঝামাঝি শ্রীমা কামারপুকুর থেকে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জির বাগানে বাস করতে থাকেন। সেই সময়ে যোগীন মহারাজ সেখানে এসে মায়ের সেবা-ভার গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি আবার তীর্থদর্শনে বেরুলেন এবং প্রয়াগে এসে বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। সংবাদ পেয়ে স্বামীজি প্রভৃতি গুরুভাইরা তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে রামকৃষ্ণ অপ্রকট হওয়ার পর, তাঁর যোলটি সন্তানদের মধ্যে যে অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব দেখা গিয়েছিল তা দেখে তাঁদের সকলকে এক পরিবার-ভুক্ত সন্তান বলেই মনে হতো। যাঁর যখনই অসুখ করেছে তখনই তাঁর সেবা-পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের জন্য কেউ না কেউ ছুটে গেছেন। এরকম দৃষ্টান্ত এঁদের প্রত্যেকের জীবনে অনেক আছে।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে স্বামী যোগানন্দের ভূমিকাটি কম গৌরবের ছিল না। তাঁর ললাটে একটি মাত্র পরিচয়ই লেখা থাকত—তিনি সারদাদেবীর সেবক। তাঁর মতো শ্রীমায়ের সেবায় আর কেউ আত্মসমর্পণ করেন নি। ১৮৯০ থেকে মহাপ্রয়াণের সময় পর্যন্ত তিনি মায়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং ছায়ার মতো তাঁর অনুসরণ করতেন। স্বামী যোগানন্দের তপঃশুদ্ধ জীবনের এই পর্বটির আনু-পূর্বিক বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মাতৃগতপ্রাণ যোগানন্দের মাতৃসেবা সত্যিই অতুলনীয় ছিল। তিনি যে 'এতখানি মনপ্রাণ ঢালিয়া মায়ের সেবা করিতে পারিতেন, ইহা শুধু তিনি মাকে দীক্ষাগুরুরূপে পাইয়াছিলেন বলিয়াই নহে। দীক্ষার পূর্বেও এই সেবা বিবিধরূপে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ থাকিত। ঠাকুরের লীলাসংবরণের পূর্বেও শ্রীমা যোগীনের

উপর গৃহস্থালির অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতেন।'[১] মোট কথা, যোগীন মহারাজ শ্রীমাকে বিশ্বজননীরূপে পেয়েছিলেন বলেই না তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করে দিতে পেরেছিলেন। সেই আত্মনিবেদনের ইতিহাসই এই রামকৃষ্ণ-সন্তানের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বামী সারদানন্দ তাঁর এই গুরুভ্রাতার মাতৃসেবার দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়েই মায়ের সেবাধিকার পেয়েছিলেন এবং সেই সুযোগে মাতৃসেবার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে চিরস্মরণীয় হয়েছিলেন। স্বামী যোগানন্দের জীবনের প্রকৃত সার্থকতা এইখানেই।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে স্বামী যোগানন্দের একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। ঠাকুরের এই দুই সন্তানের পারস্পরিক সহজ বাক্যালাপ ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার দেখবার জিনিস ছিল। একটি দিনের ঘটনা বলি। একদিন দুজনে বলরাম বসুর বাড়িতে এসেছেন। স্বামীজি তখন আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। সারা দেশ তখন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে যোগীন মহারাজ বললেন, ছাখো নরেন, লোকে যতই বাহবা দিক তোমাকে, মিশনারীদের ঢঙে তোমার এই প্রচার কাজটা আমার ভালো লাগে না।

—কেন বলো তো, যোগীন।

—ঠাকুরের কি এইরকম উপদেশ ছিল?

—তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের অভিপ্রেত নয়? তোরা বুঝি তাঁকে তোদের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে দিয়ে, পৃথিবীময় তাঁর ভাব ছড়িয়ে দিয়ে যাব। এই হলো আমার জীবনব্রত।

যোগানন্দ নিরস্ত হলেন। বিবেকানন্দ কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে প্রচার করতেন না। এজন্য তাঁর এই গুরুভ্রাতাটির

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

মনে একটা ক্ষোভ ছিল। একদিন স্পষ্টভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীজিকে: নরেন, তুমি কি ঠাকুরকে অবতার বলে মানো না?

—অবতার! বলিস কি যোগা? অবতার তো ছোট কথা, ঠাকুর যে সাক্ষাৎ বেদমূর্তি। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ তৈরি হতে পারে।

বিবেকানন্দের মুখে এই কথা শুনে তাঁর গুরুভক্তি আর গুরুর প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে যোগানন্দ সেদিন বুঝেছিলেন, তাঁদের নরেন যথার্থ নর-ঋষির অবতার। কী সৌহার্দ্য আর প্রীতির সূত্রে রামকৃষ্ণের এই ষোলটি সন্তান যে পরস্পরের প্রতি আবদ্ধ ছিলেন। সেটা ঠিকমতো বুঝতে না পারলে রামকৃষ্ণ ও তাঁর নামাঙ্কিত মিশনের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভব নয়। এই সৌহার্দ্যের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। ১৮৯৭ সালে স্বামীজি আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করলে স্বামী যোগানন্দই অগ্রণী হয়ে তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারো আগে, স্বামীজি মার্কিন দেশে থাকাকালে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ টাউন হলের যে মহতী সভায় তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন, স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বামী যোগানন্দ সেই সভার যাবতীয় আয়োজন করেছিলেন। তেমনি দেখা যায় যে, আমেরিকা থেকে প্রতি পত্রে স্বামীজি তাঁর এই প্রিয় গুরুভ্রাতাটির সংবাদ নিতেন। স্বামী যোগানন্দের স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না। শেষের দিকে কলকাতায় তিনি যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আলমোড়া থেকে স্বামীজি এক চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'যোগেনের চিকিৎসার যেন কোন ত্রুটি না হয়—আসল ভেঙ্গেও খরচ করবে।' এই প্রীতির কি কোন তুলনা হয়?

১৮৯৯। স্বামী যোগানন্দের জীবনের শেষ বৎসর। এই বছরের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীমায়ের বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তিনি শেষ

রোগশয্যা গ্রহণ করেন। পালাক্রমে অনেকে তাঁর সেবা করতেন। শেষ অসুখের সময় পিতামাতা যখন তাঁর শয্যাপার্শ্বে এলেন, তখন উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখেছিলেন যে, মহাপুরুষ সমস্ত মায়িক সম্বন্ধের অতীত হয়ে গিয়েছেন। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: 'যোগীন মহারাজের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজির মনে যে কি বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যোগীন, তুই বেঁচে ওঠ, আমি মরি।…কিন্তু যোগানন্দের আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তখন বেলুড় মঠ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, সে মঠেও বাস করা তাঁহার হইল না। স্বামীজি তাঁহাকে একদিন নৌকা করিয়া আনিয়া বেলুড় মঠ দেখাইতে লইয়া গেলেন মাত্র।'

১৮৯৯। ২৮ মার্চ। যোগীন মহারাজের জীবনের শেষ দিন উপস্থিত হলো। সেদিন গুরুভ্রাতা শিবানন্দ তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, যোগীন, ঠাকুরকে মনে আছে তো?

—আরো খুব বেশি মনে আছে, তারক দা।

ইহজীবনে এই ছিল স্বামী যোগানন্দের মুখের উচ্চারিত শেষ কথা। তারপর অপরাহ্ণ বেলায় রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের শুকদেবতুল্য তাপস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'সঙ্ঘের একটি কড়ি খসলো। এবারে ধীরে ধীরে বর্গাগুলিও খসে পড়বে।' প্রিয় গুরুভ্রাতার মহাপ্রয়াণে মর্মাহত হয়ে এই উক্তিটি করেছিলেন বিবেকানন্দ।

স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: দরদী। নিত্যসিদ্ধ।

শ্রীমা বলতেন: বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস।

রামকৃষ্ণসঙ্ঘে বাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দের এই ছিল একমাত্র পরিচয়। তিনি একান্তভাবেই সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর অনুগত ছিলেন। অনন্ত ধৈর্য আর অপার করুণার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। তাঁর এই সন্তানটি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'বাবুরামকে দেখলাম দেবীমূর্তি—গলায় হার, সখী সঙ্গে। ও নৈকষ্য কুলীন, হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।' তাঁর ক্ষণিক সংস্পর্শে এলেই লোকের হৃদয়ে ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হতো।

সূত্রাকারে এই হলো প্রেমানন্দের স্বরূপ-পরিচয়।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলা সূত্রের ভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ বলেছেন: 'ঠাকুরের মহাভাবের সময় বাবুরাম মহারাজ ভিন্ন আর কেউ তাঁকে ছুঁতে পারতেন না। স্বামীজি, মহারাজ এঁরা সকলেই বীরভাবের সাধক। বাবুরাম মহারাজের মনে পুরুষোচিত কোন ভাব ছিল না, তাই হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। ঠাকুরের লীলাসহচররূপে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানে স্বামীজিও নাই, আমাদের এক কথা।'

'সুন্দর গড়ন, হাসি সর্বদা বয়ানে।
কৃষ্ণপদে রতিমতি অতুল ভুবনে॥
স্বভাবসুলভ কিবা আঁখি ঠেরে কথা।
পশ্চাতে সময়ে পাবে তাঁহার বারতা॥

... ... বাবুরাম নাম তাঁর।
কৃপায় যাঁহার হয় ভক্তির সঞ্চার॥'[১]

হুগলীজেলার আঁটপুর গ্রামে, এক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশে, ১৮৬১ সালের ১০ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার রাত ১১টা ৫৫ মিনিট সময়ে রামকৃষ্ণ পার্ষদ বাবুরাম ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন ছিল শুক্লা নবমী তিথি। আঁটপুরে ঘোষ ও মিত্র বংশ দুটি কয়েক পুরুষ ধরে পাশাপাশি বাস করে আসছিল। বাবুরামের পিতা তারাপ্রসন্ন তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মিত্রবংশের মেয়ে মাতঙ্গিনীকে বিয়ে করেন। এঁরই গর্ভে কৃষ্ণভাবিনী নামে এক মেয়ে, আর তুলসীরাম, বাবুরাম ও শান্তিরাম নামে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অসামান্য রূপগুণশালিনী কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে আঁটপুরের নিকটবর্তী তড়া গ্রামের বলরাম বসুর বিয়ে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত এই বলরাম বসু ছিলেন ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার।

এক সাত্ত্বিক পরিবেশে লালিতপালিত হয়েছিলেন বালক বাবুরাম। ঘোষেদের গৃহবিগ্রহ ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন তাঁর পিতামাতা। এক শুভ সংস্কার নিয়েই দিব্যকান্তি, গৌরবর্ণ এই বালক সংসারে এসেছিল। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়েছিল। তারপর তাঁর মায়ের ইচ্ছানুসারে বাবুরামকে কলকাতায় নিয়ে এসে, তাঁর এক জ্ঞাতি-কাকার বাসায় রেখে দেওয়া হয়। তিনি কম্বুলিটোলায় থাকতেন। বাবুরাম কলকাতায় পর পর তিনটি স্কুলে পড়েছিলেন—বঙ্গবিদ্যালয়, এরিয়ান ও মেট্রোপলিটান (শ্যামবাজার শাখা)। বঙ্গবিদ্যালয়ে স্বামী অভেদানন্দ ও মেট্রোপলিটানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

বাবুরাম কিন্তু লেখাপড়ায় বেশি মনোযোগ দিতে পারতেন না;

১. প্রেমানন্দ-প্রেমকথা : ব্রঃ অক্ষয়-চৈতন্য।

তাঁর প্রবণতা ছিল কখনো ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে কেশব সেনের বক্তৃতা শোনা, কখনো বা হরিসভায় গিয়ে কথকথা ও কীর্তন শোনা—শুনে তন্ময় হয়ে যেতেন। প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়াতেন না, ঈশ্বরীয় কথাও শোনাতেন। ছাত্রদের মধ্যে প্রিয়দর্শন বাবুরামই তাঁর খুব প্রিয় ছিলেন। স্কুলের ছুটি হলে বাবুরাম তাঁর অন্যান্য সহপাঠীদের মতো খেলাধূলায় মত্ত হতেন না; তিনি গঙ্গার ধারে ধারে সাধু-সন্ন্যাসী খুঁজে বেড়াতেন এবং দৈবক্রমে যদি কোন সাধুর দেখা মিলত তাহলে বহুক্ষণ ধরে তাঁর কথাবার্তা শুনতেন একাগ্রচিত্তে। এই বয়সে বালকের মনে এই যে ধর্মভাবের উদ্দীপনা, এর মূলে ছিল তাঁর মায়ের তপোনিষ্ঠ জীবন। কথিত আছে, সংসারের কাজ-কর্ম সেরে, বাবুরাম-জননী মাতঙ্গিনী দেবী বহুক্ষণ ধরে জপধ্যান করতেন। তাঁর মায়ের সম্পর্কে তিনি বলতেন: 'মা সামান্যা নন। উনি মদালসার ন্যায় ছেলের বন্ধন কামনা না করে মুক্তি কামনা করেন।' ঘোষ-পরিবারের পরিবেশ ছিল ধর্মভাবে পরিপূর্ণ এবং বাবুরামের ধর্মজীবনের উন্মেষ ও বিকাশসাধনে এটা যে খুবই অনুকূল ছিল তা বলাই বাহুল্য। গোটা পরিবারটি ছিল ভগবদ্ভক্ত ও রামকৃষ্ণের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

কলকাতায় বলরাম বসুর (১৮৪২-১৮৯০) বাসস্থান ছিল বাগবাজারে। ঠাকুরের সেবায় ও সাহচর্যে স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়া হৃদয়বান বলরাম একে একে তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলকেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে লইয়া যান। এইরূপে বাবুরামের জননী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা তুলসীরামও ঠাকুরের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হন। কলকাতায় যেসব গৃহী ভক্তদের বাড়িতে ঠাকুরের আসাযাওয়া ছিল এবং যাঁরা তাঁর পার্ষদ স্থানীয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে বলরাম বসুর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। শুধু স্থান নয়, বলিতে গেলে রামকৃষ্ণ-লীলায় ধর্মপ্রাণ মানুষটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও ছিল। রাসমণি জামাতা মথুরবাবুর মৃত্যুর পর তিনিই দক্ষিণেশ্বরের এই দেবমানবের

রসদদার হওয়ার দুর্লভ গৌরবলাভ করেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর অবিচলিত ভক্তি তাঁকে রামকৃষ্ণ-সন্তানদের কাছে খুব শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি পূত বলরাম ভবনের একাংশ আজ বলরাম-মন্দিরে পরিণত হয়েছে।

সম্ভবত ১৮৮২ সালে বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে প্রথম এসে থাকবেন। তাঁর এখানে আসার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভগ্নীপতি বলরাম বসু দক্ষিণেশ্বরের মাটি গায়ে মেখে ধন্য হয়েছিলেন। কথিত আছে, শ্রীমায়ের সঙ্গেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেছিলেন। আবার অন্য বিবরণ অনুসারে জানা যায় যে, বাবুরাম তাঁর সহপাঠী রাখালের সঙ্গেই প্রথম এসেছিলেন। রাখাল আগে থেকেই এখানে যাওয়া-আসা শুরু করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রামদয়াল চক্রবর্তী—বলরামবাবুর পুরোহিত-পুত্র। তাঁরা তিনজন আহিরীটোলার ঘাট থেকে একটি নৌকায় করে যখন দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। নবাগত ভক্তটির পরিচয় পেয়ে রামকৃষ্ণ তাঁর স্বাভাবিক পরিহাসের ভঙ্গিতে রামদয়ালকে বলেছিলেন: বটে? বলরামের কুটুম্ব, তবে তো আমাদেরও কুটুম্ব! তা বেশ বেশ। তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—আজ্ঞে, তড়া আঁটপুর।

—বটে? তবে তো তোমাদের দেশেও একবার গেছি। ঝামাপুকুরের কালী-ভুলুর বাড়িও সেইখানে না?

—হ্যাঁ। আপনি তাঁদের কেমন করে জানলেন?

—তারা যে রামপ্রসাদ মিত্রের ছেলে। যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম তখন দিগম্বর মিত্রের বাড়ি আর ওদের বাড়ি যখন তখন যেতুম। এসো, আলোয় এসো, তোমার মুখখানি দেখি।

বাবুরাম তখন একুশ বছরের যুবক যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। নরেন্দ্রনাথও তখন এখানে আসা-যাওয়া শুরু করেছেন। সেদিন তাঁদের—রাখাল, বাবুরাম ও রামদয়াল—রাত্রি-

বাস ওখানেই হয়েছিল। সেই স্মরণীয় রাত্রিতে নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যুগাবতারের যে ব্যাকুলতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা বাবুরামকে রীতিমত বিস্মিত করে দিয়েছিল। বারবার তিনি রামদয়ালকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন নরেনের কথা। 'তারজন্য প্রাণটা ছটফট করছে, সে একবার যেন আসে।' সারা রাত তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এইরকম করেছিলেন। এ কী ভালবাসা! বাবুরাম যখন মনে মনে এই কথা ভাবছিলেন তখন ঠাকুরের মুখ থেকে তিনি শুনলেন : 'নরেন বড় শুদ্ধ, সাক্ষাৎ নারায়ণ! এমন যে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে দেখবার জন্য বাবুরাম নিশ্চয়ই কৌতূহলী হয়ে থাকবেন, আমরা অনুমান করতে পারি। সকালবেলায় দেবমানবকে প্রণাম করে ও তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বাবুরাম বিদায় গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন।

—আবার আসবে তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আসব।

পরের রবিবার। বাবুরাম দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। বেলা তখন আটটা। ঠাকুর খুব খুশি হলেন তাঁকে দেখে। সস্নেহে বলেন : 'তুমি এসেছ ? বেশ হয়েছে। আজ পঞ্চবটিতে ওরা সকলে চড়িভাতি করবে, নরেন্দ্র এসেছে। তার সঙ্গে আলাপ কর গে। রাখাল তখন নরেন্দ্র, ভবনাথ, লাটু, হরিশ প্রভৃতি সকলের সঙ্গে বাবুরামের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্র একটি গান গাইলেন। মুহূর্তমধ্যে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ-বাতাস সেই সুমিষ্ট স্বরলহরীতে ছেয়ে যায়। নরেন্দ্রের রূপে গুণে বাবুরাম মুগ্ধ। ঠাকুরের ভক্তদের খুব ভালই লাগল তাঁর।

এরপর আসা-যাওয়া নিয়মিত হয়ে উঠতে থাকে। কে যেন আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। সেই থেকে কমপক্ষে চারটি বছর বাবুরাম এই যুগাবতারের সান্নিধ্য লাভ করে আর তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনে কৃতার্থ হয়েছিলেন। ছুটির দিনেই তিনি ঠাকুরের কাছে যাওয়া আসা করতে লাগলেন।

আলোকসামান্য জীবন বাবুরাম মহারাজের। মহাভাবের মূর্তবিগ্রহ। প্রেম ও ভক্তির জীবন্ত মূর্তি। নিত্যশুদ্ধ—তাঁর মধ্যে আদিম জৈব প্রেরণার স্থান ছিল না। তাইতো তিনি বলতেন, সংসার—ওরে বাবা! তাইতো স্বামীজি বলতেন—বাবুরামদা সাক্ষাৎ শুকদেব। তিনি যে কতখানি জৈবসংস্কারবর্জিত মহাপুরুষ ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করছি।

'বেলুড় মঠে আসিয়া একদিন এক যুবক স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ) মহারাজের কাছে নিজের অতীত জীবনের দুষ্কৃতির কথা বলিতে থাকে। দয়া পরবশ হইয়া তিনিও শুনিয়া যাইতে থাকেন। বাবুরাম মহারাজ কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, খানিকটা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—এসব কী কথা এ বলছে? এসব কী? মহাপুরুষ প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এর কোন কথাই বুঝতে পারনি? বাবুরাম উত্তর দিলেন, না। তাঁহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, আজ বুঝতে পারলুম ঠাকুর কেন তোমার হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ বলতেন।'[1]

বাবুরাম মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। অন্তরে প্রবল ধর্মভাব, আমরা অনুমান করতে পারি, তাঁর বিদ্যার্জনে অন্তরায়স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। সেই ধর্মভাব শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসার পর প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। ফলে, স্কুল থেকে তাঁর মন অনেকটা সরে গিয়েছিল। যথাসময়ে (১৮৮৫) প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। ছেলের অকৃতকার্যতায় পিতা স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ হলেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে বাবুরাম এলেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে। সঙ্গে ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। কথাপ্রসঙ্গে সান্যাল মশাই বললেন, বাবুরাম পরীক্ষায় পাশ হয়নি।

—ভালই তো—ও পাশমুক্ত হল। যার যটা পাশ, তার তটা

১. প্রেমানন্দ-প্রেমকথা: ব্রঃ অক্ষয়চৈতন্য।

পাশ (অর্থাৎ বন্ধন)।' সহাস্যে এই কথা সেদিন বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এই সময়ে এক দিনের কথা। তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে বাবুরাম এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ভক্তিমতী মাতঙ্গিনী দেবীকে ঠাকুর বললেন: তোমার এই ছেলেটিকে এখানে দাও।

—বাবা, আপনার কাছে বাবুরাম থাকিবে এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। এই ভিক্ষা ভগবানে ওর যেন অচলা ভক্তি থাকে।

—তাই হবে। ভক্তি যে তোমার বাবুরামের হাড়ে মজ্জায়।

—আর এক ভিক্ষা। আমাকে যেন পুত্রকন্যার শোক না পেতে হয়।

—তাই হবে।

শ্রীমুখের এই অভয়বাণী শুনে কৃতার্থ হন বাবুরাম-জননী। অতঃপর বন্ধনমুক্ত বাবুরাম ইচ্ছামত রামকৃষ্ণের কাছে থাকবার ও আশা মিটিয়ে সেবা করবার সুযোগ পেলেন। সেইসময় থেকে পরবর্তী আঠারো মাস (রামকৃষ্ণের তিরোভাব পর্যন্ত) তিনি সেই দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ঠাকুরের বিশ্বস্ত সেবক ও পার্ষদরূপে তাঁর জীবনের এই সময়টা আনন্দেই কেটেছিল। এই সেবার একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন তাঁর এক জীবনীকার। 'পান সাজা, তামাক সাজা, বিছানা করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া এই সমস্তই সেবার অঙ্গ। প্রয়োজন হইলে বাবুরাম এই সমস্তই করিতেন। কিরূপে নিখুঁতভাবে এইসব কাজ করিতে হয় ঠাকুরই তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন। স্নানের পূর্বে ঠাকুরকে তিনি তেল মাখাইয়া দিতেন, গ্রীষ্মের দিনে পাখা নিয়া হাওয়া করিতেন। রাত্রে ঠাকুরের শয়নের পর হাওয়া করিতে করিতে যখনই তিনি ঘুমের ঘোরে ঢুলিয়া পড়িতেন ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া মশারির ভিতর নিজের বিছানায় শয়ন করাইতেন।'[১]

১. প্রেমানন্দ-প্রেমকথা: ব্রঃ অক্ষয়চৈতন্য।

কিন্তু এযে বাহ্য। সেবার মুখ্য কাজটা ছিল আরো কঠিন, আরো দায়িত্বপূর্ণ। ভাবাবেশ হলে রামকৃষ্ণের শরীর জ্ঞান থাকতনা —হাত মুখ গলা সব বেঁকে যেত। তখন নানাপ্রকার ঈশ্বরের নাম, বা ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি শুনিয়ে বাবুরাম তাঁর ইষ্টদেবতার বিকারপ্রাপ্ত অঙ্গগুলি ঠিকমত সংস্থাপিত করে দিতেন। তাঁকে স্পর্শ করবার বিশেষ একটি অধিকার ঠাকুর দিয়েছিলেন বাবুরামকে, কারণ তিনি জানতেন তাঁর এই সেবকটির দেহ-মন সবই শুদ্ধ। সেইজন্যই তো তিনি যখন যেখানে উৎসবাদিতে যোগদান করতে যেতেন, তাঁর সঙ্গে থাকতেন বাবুরাম।

ঠাকুর অপ্রকট হলেন। আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস নেবার সময়ে ঠাকুরের বাণী[১] স্মরণ করে বাবুরামের নাম রাখা হলো প্রেমানন্দ। শুরু হয় তাঁর তীর্থপর্যটন। রামকৃষ্ণ-সন্তানদের জীবনে আমরা একটি জিনিস দেখতে পাই। তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন তীর্থযাত্রী। হিন্দুভারতের সত্যকার পরিচয় আছে এর তীর্থগুলির মধ্যে। কারণ তীর্থস্থানগুলির চিরন্তন মহিমা ও মাহাত্ম্য আবহমানকাল থেকেই প্রচলিত। গয়াতীর্থ থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ভব হয়েছিল এবং তিনি নিজেও তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। বাবুরাম বহুবার তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন।

১৮৯৭। ফেব্রুয়ারি মাস। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ থেকে স্বদেশে ফিরলেন। এসেই তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে (শশী মহারাজ) মাদ্রাজ পাঠিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করবার জন্য। তখন স্বামীজির নির্দেশে মঠে ঠাকুরের নিত্য সেবাপূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাবুরাম মহারাজ। এর প্রায় এক বছর পরে মঠ উঠে আসে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জির বাগানে। আরো এক বছর পরে মঠ উঠে আসে নবনির্মিত নিজস্ব বাড়িতে (১৮৯৯, ২ জানুয়ারি)। মঠ-প্রতিষ্ঠার সাত-আট মাস পরে

১. 'বাবুরামের শ্রীরাধার অংশে জন্ম', এইকথা বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

স্বামীজি দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করেন। প্রবাস থেকে গুরুভ্রাতা তুরীয়ানন্দকে (ইনি তখন আমেরিকায় থাকতেন) এক চিঠিতে লিখলেন: 'হরি ভাই, গঙ্গাধর ও তুমি, কালী, শশী, নতুন ছেলেরা —এদের সবাইকে ঠেলে—ঐ রাখাল ও বাবুরামকে মঠের কর্তা করে দিচ্ছি। গুরুদেব বড় বলতেন।'

স্বামীজি তখন তাঁর সত্যজীবনের অবসান আসন্ন জেনেই নিজেকে যেন সব রকমে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। দেশে ফিরবার মাস কয়েকের মধ্যে তিনি বেলুড়মঠ ঠাকুরবাটী দেবোত্তরে পরিণত করলেন এবং গুরুভাইদের এগারোজনকে সেই দেবোত্তর সম্পত্তির অছি (Trustee) নিযুক্ত করে একটি দলিল সম্পাদন করেন। বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। কেমন করে মঠ পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচার করতে হবে, তা স্বামীজি তাঁর এই গুরুভ্রাতাকেই বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই সৌভাগ্য আর কারো হয়নি। কথিত আছে, সেই সময়ে স্বামীজি একদিন মঠের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন: 'বাবুরাম দা, এখানে যারা থাকবে তাদের সবাইকে বলবে-এটা বাবাজীদের আখড়া নয়। আমি চাই, এখান থেকে আধ্যাত্মিক শক্তির সর্বতোমুখী অভিব্যক্তি হবে—ধ্যানে, জ্ঞানে, সেবায় ও ভক্তিতে।' বলাবাহুল্য, তাঁর প্রিয়তম গুরুভ্রাতার এই নির্দেশ স্বামী প্রেমানন্দ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। কিভাবে তিনি বিবেকানন্দের এই নবীন বার্তা বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন, তাঁর পরবর্তী জীবনের ইতিহাসের মধ্যে আছে সেই গৌরবময় কাহিনী।

আঁটপুরের কথা একবার স্মরণ করি। ইতিপূর্বে অন্যপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে যে, ঠাকুরের তিরোভাবের পর তাঁর ত্যাগী

সন্তানেরা, আঁটপুরে বাবুরামের বাড়িতে মিলিত হয়ে সংকল্প করেছিলেন, তাঁর অভিপ্রেত কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবেন। স্বামীজির তিরোধানের পর সেই সংকল্পে অবিচলিত থেকে নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবার প্রয়োজন অনুভূত হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকট থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর প্রত্যেকটি সন্ন্যাসী সন্তানকে হাত ধরে বহু যত্নে তৈরি করে গিয়েছিলেন। তাঁদের শিক্ষা দেওয়ার কিছুই বাকী রাখেন নি। আমেরিকা-প্রবাসী গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দকে একটি পত্রে বাবুরাম মহারাজ এই সময়ে লিখেছিলেন: 'আমাদের যার যতটুকু সাধ্য সে ততটুকু স্বামীজির কার্যরক্ষা করবার চেষ্টা করবে। এই আমাদের সংকল্প।'

এই সংকল্পের বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ। মঠ পরিচালনার দায়িত্বটা এসে পড়েছিল তাঁর ওপর। মিশনের কাজ, উদ্বোধন-সম্পাদন ও শ্রীমার সেবা—এই তিনটি কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্বামী সারদানন্দ এবং সেজন্য তাঁকে প্রায়ই কলকাতায় থাকতে হতো। কাজেই মঠ-তত্ত্বাবধানের কাজটা বাবুরামকে নিতে হয়েছিল। এই কাজ তিনি চারভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন: ১. ঠাকুর সেবা; ২. মানুষ তৈরি করা; ৩. ভক্তসেবা ও ৪. উৎসবাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত করা। দীর্ঘ ষোলটি বছর তিনি এই বিরাট বোঝা বহন করেছিলেন। কিভাবে তিনি মঠ পরিচালনা করতেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন শ্রীমায়ের অন্যতম শিষ্য স্বামী তপানন্দ। তাঁর স্মৃতিচারণের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো।

'মঠে আমার কাজ ছিল ঝাড়ু দেওয়া, উঠানে ও লাইব্রেরি ঘরে। আমি তখন ঝাড়ু দিতে জানিতাম না। একদিন উঠানের আমগাছ হইতে পাতা পড়িতেছে, আমি একধার হইতে ঝাড়ু দিতে

১. সকলে নয়, মাত্র নয়জন: নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালীপ্রসাদ, সারদাপ্রসন্ন এবং গঙ্গাধর।

দিতে পাতাগুলি ঠেলিয়া ঠেলিয়া আসিতেছি এমন সময় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আমাকে বলিলেন—ঝাড়ু দিতে জান না, এমনি করে কি ঝাড়ু দেয়? এই বলিয়া আমার হাতের ঝাড়ুটা লইয়া পাতাগুলি এক এক জায়গায় এক একটি গাদা করিয়া তারপর প্রত্যেকটিকে একটি ঝুড়িতে কুড়াইয়া লইয়া ফেলিতে বলিলেন। আর একদিন সকালে লাইব্রেরি ঘর ঝাড়ু দিতেছি, ঘরটি ঝাড়ু দিয়া ধুলোগুলি চৌকাঠের কাছে আনিয়া চৌকাঠটির ওপারে ফেলিতেছি। শেষের কতকগুলি ধুলো ওপারে ফেলিতে না পারিয়া ঝাড়ুতে করিয়া কোণের দিকে লুকাইয়া রাখিয়া দিতেছি। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ লাইব্রেরির ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার সময় তাই দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ধুলোগুলি লুকিয়ে কোণের দিকে ঠেলে গুঁজে রাখছিস কেন? এমনি করে ময়লাগুলিও মনের এক কোণে লুকিয়ে গুঁজে রেখে দিবি তো? ফ্যাল ভাল করে, পরিষ্কার কর, কাজ যেটিই করবি, সেটি যেন নিখুঁত হয়। যে মানুষ যে কোনো একটি কাজে ফাঁকি দেয়, সে সব ক্ষেত্রেই ফাঁকি দেয়, ফাঁকি দেওয়া তার স্বভাবগত হয়ে যায়। যখন যেটি করবে, তখন সেই কর্মটিকেই প্রভুর কাজ বলে মনে করবে, তবেই চিত্তশুদ্ধি, নচেৎ নয়।'[১]

এই রকম ছোট ছোট ঘটনা থেকে আরম্ভ করে ধ্যান ধারণা সমাধি পর্যন্ত সব বিষয়েই শিক্ষা দিতেন তিনি। এমন আদর্শ শিক্ষক, ও আচার্য জগতে বিরল। 'বাবুরাম মহারাজ যখন পূজা করিতেন, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কি সুন্দর তাঁর পবিত্র মুখখানি ভাববশে অন্তর্মুখী ও লাল হইয়া যাইত, চক্ষুদুটি দেখিলে মনে হইত তিনি যেন এই পৃথিবী হইতে অতি ঊর্ধ্বে অতি দূরে কোন এক আনন্দের রাজ্যে রহিয়াছেন। প্রায় অবিরতই তিনি থাকিতেন

---

১. আত্মকথা: স্বামী তপানন্দ। পুরুলিয়াতে ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ভাবমুখ অথচ আমাদের কল্যাণের জন্য সর্বদা সর্বকাজে ছায়ার মত কাছে কাছে থাকিয়া ব্যবহারিক তরকারী কোটা, কয়লার গুঁড়োয় গোবর দিয়ে নাড়ু পাকানো প্রভৃতি গৃহস্থালীর কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার অতি উর্ধ্ব স্তরের পর্যন্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া সর্ববিষয়ে পারদর্শী করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।...কি ত্যাগই না তাঁর ছিল, ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্তি। চারটি পাঁচ হাতি কাপড় ও দুইটি কোর্তা, একজোড়া ঠনঠনের চটি ও একটি গামছা ব্যতীত কিছুই তিনি লইতেন না, রাখিতেন না।'[১]

'বেলুড় মঠে একদিন মহারাজ খাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার হাতমুখ ধুইবার জন্য ঘটিতে জল রাখিয়া খুদুমণি কার্যান্তরে গিয়াছিলেন এমন সময় তিনি হঠাৎ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়েন। বাবুরাম মহারাজ ঘটি নিয়া তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতে যাইতেই মহারাজ বলিয়া উঠলেন, বাবুরাম দা, তুমি কেন? তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া খুদুমণি ঘটি ছিনাইয়া লইলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, তোমার সেবা তো আমাদেরই করবার কথা। আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তোমার সেবা থেকে এরা আমাদের বঞ্চিত করেছে।

'চায়ের টেবিলে মহারাজ বসিয়া আছেন, বাবুরাম মহারাজ একগাছি মালা হাতে করিয়া আসিলেন এবং 'মহারাজ দেখ, কেমন সুন্দর মালাটি!' বলিয়াই তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। তারপর পরস্পর মুখ নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া দুই মহাপুরুষ অনেকক্ষণ অবধি স্থির নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। পরস্পরের মুখে তাঁহারা কি তখন নিজ নিজ ইষ্টমুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন?'[২]

মহারাজদের অনেকেই পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গিয়েছেন। স্বামী

---

১. তদেব।

২. স্মৃতিচারণ: স্বামী প্রভবানন্দ। 'প্রেমানন্দ প্রেমকথা' গ্রন্থ থেকে উৎকলিত।

প্রেমানন্দকে তাঁর জীবনের শেষ তিন বছরে আমরা দেখতে পাই পূর্ববঙ্গে প্রচার ব্রতে। তাঁর প্রচারশক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল পূর্ববঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন: পূর্ববঙ্গ তোর জন্য রইল। বাবুরাম মহারাজ শেষবারে পূর্ববঙ্গে যান ১৯১৭ সালে। তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: 'ঐ সময় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনকালে এবং তাহার অবস্থিতিস্থলের চারিপার্শ্বে এরূপ লোক সমাগম হইত যে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী পরে উহার সহিত মহাত্মা গান্ধীর আকর্ষণী শক্তির তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, মহাত্মাজীকেও দেখিবার জন্য তেমন লোক সমাগম হয় না।.... একবার ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁহার উদার বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া নবাব সলিমুল্লা তাঁহাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ পূর্বক ধর্মগুরুর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করেন।'১

এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের ফলে স্বামী প্রেমানন্দ কালাজ্বর গ্রস্ত হন। কলকাতায় ফিরে চিকিৎসায় একটু আরোগ্যলাভের পর বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি দেওঘর এলেন। এইখানেই তিনি নিদারুণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হন। সেই বছর (১৯১৮) সারা পৃথিবীতে এই ব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। তাঁর জীবন সংশয়াপন্ন হয়ে ওঠে। সংবাদ পেয়ে মঠ থেকে স্বামী শিবানন্দ দেওঘর গেলেন ও প্রিয় গুরুভ্রাতাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। কিন্তু সুচিকিৎসা সত্ত্বেও ফিরে আসার চারদিন পরে, ৩০ জুলাই, ১৯১৮, তিনি নিত্য ধামে প্রবেশ করেন। প্রেম কলেবর প্রেমানন্দ স্বামী দিব্যধামে প্রস্থান করলেন। সেদিন সংঘ জননী চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিলেন: 'মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি—সব আমার বাবুরামের রূপ ধরে মঠের গঙ্গা তীর আলো করে বেড়াত। হায়, ঠাকুর তাকেও নিয়ে গেলেন।'

---

১. ভক্তমালিকা: স্বামী গম্ভীরানন্দ।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি লাটু মহারাজ। এক নিরক্ষর সাধুর মুখ দিয়ে নির্গত হতো বেদ-বেদান্ত। ঈশ্বরপ্রীতি ভাবটা ছিল তাঁর সহজাত। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন: 'লাটু শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি।' খুবই তাৎপর্য পূর্ণ এই উক্তিটি। স্বামীজি স্বয়ং লাটু মহারাজকে নিজের চেয়েও বড়ো বলে মনে করতেন। তাঁর রচনার বহুস্থানে ও পত্রাবলীতে এঁর প্রসঙ্গ আছে। একটি উদ্ধৃতি দিই। 'লাটু যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে। আর আমরা যে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছি, এতদুভয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই উচ্চবংশজাত এবং লেখাপড়া শিখিয়া মার্জিত বুদ্ধি লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলাম। লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমরা ধ্যান-ধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম, লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না। তাহাকে একটিমাত্র ভাব অবলম্বনেই আজীবন চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র ধ্যান-ধারণা সহায়ে লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ও শ্রীশ্রীঠাকুরের তাহার প্রতি অশেষ কৃপার পরিচয় পাই।' এমন যে

মানুষ, সেই স্বামী অদ্ভুতানন্দের জীবন কথা ভাবজাতের সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয় নিছক বাক্যে প্রকাশ করবার নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্রের সহোদর অতুলচন্দ্র বলতেন : 'শ্রীশ্রীঠাকুরের miracle যদি দেখিতে চাও, তবে লাটু মহারাজকে দেখ। এর চেয়ে বড় miracle আমি আর কিছু দেখিনে।' যাঁর এই অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক সৃষ্টি সেই যুগদেবতা রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পেছনে ছিল ইতিহাসের একটা বিরাট অভিপ্রায়। কথাটি একটু খুলে বলি। তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ যুগাবতার—বলতে গেলে তিনি ছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী সকল অবতারের সুসমন্বিত ভাবঘন মূর্তি। কর্মের বিষাণ বাজাতে বাজাতে কুরুক্ষেত্রে এলেন শ্রীকৃষ্ণ, মহাভারত নিয়ে এলেন ব্যাস ; শুকদেব শোনালেন ভক্তির গান যা ঝঙ্কৃত হয়েছিল নারদের বীণায় ; বুদ্ধদেব মানুষকে শোনালেন জীবসেবায় আত্মাহুতি, যীশু পরের জন্য হাসিমুখে ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত জ্ঞানের প্রভায় দশ দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আর শ্রীচৈতন্যের নাম ও প্রেমের জ্ঞান দিকে দিকে বেজে উঠল। এইভাবে যুগ যুগ ধরে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ববর্তী অবতারগণ এক একটা বিশেষভাবে—যা তাঁদের কালে সবিশেষ প্রয়োজন ছিল—তাই-ই প্রচার করবার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে আমরা কি দেখতে পাই ? দেখি সকল ভাবের সমাবেশ ও সমাধান সকল মন্ত্রের সিদ্ধি।

অনুরূপ প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন : 'যাঁহারা কখনও বাটীর বাহির হন নাই ঠাকুর তাঁহাদের দিয়া বাজার করাইয়া আনিয়াছেন। অভিমান অহঙ্কার দূরে যাইবে বলিয়া সাধারণ ভিখারীর ন্যায় লোকের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করাইয়াছেন, সঙ্গে লইয়া পেনেটির মহোৎসব ইত্যাদি দেখাইয়া আনিয়াছেন—আর তাঁহারাও (শিষ্যবর্গ) মনে মনে কোন দ্বিধা না করিয়া মহানন্দে তাহাই

করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলে ইহা একটি কম ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। সে প্রবল জ্ঞান-তরঙ্গের সম্মুখে সকলেরই ভেদজ্ঞান প্রসূত দ্বিধাভাব তখনকার মত ভাসিয়া গিয়াছে।'[1]

আরো একটু বলার আছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ১৮৫৫ সালে শহর কলকাতার জানবাজারের প্রথিতকীর্তি কৈবর্তবংশোদ্ভূত রানী রাসমণির কালীবাড়ি যেদিন গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেদিন সেখানে বর্তমান যুগের দেবমানবের লীলাক্ষেত্রটি সুনির্মিত হয়েছিল—সেখানেই আবার নতুন করে প্রমাণিত ও প্রচারিত হয়েছিল—'ত্রিভুবন মায়ের মূর্তি'—সেখানেই লীলা করেছিলেন অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ—সেখানেই তাঁর চরণরেণু থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ষোলটি মহাপুরুষ, যাঁরা উত্তরকালে ত্যাগ, সংযম, সন্ন্যাস, সাধনা এবং সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করে লোকগঠনে ও জনসেবায় নিজেরাই এক একজন দিক্‌পালরূপে সম্পূজিত হয়েছিলেন। তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে এঁদের প্রত্যেককেই আমরা রামকৃষ্ণের miracle বলতে পারি, বলতে পারি আশ্চর্য সৃষ্টি।

লাটু মহারাজের সাংসারিক জীবনের কথা একরকম অজ্ঞাত বললেই হয়। কেবলমাত্র জানা যায় যে, বিহারে ছাপরা জেলার কোনো দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। নাম ছিল রাখতু-রাম চৌধুরী। ডাক নাম লাটু। অর্থোপার্জনের চেষ্টায় কলকাতায় এসে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে পরমার্থ লাভ করেন। তাঁর পূর্ব জীবনের কথা এর বেশি জানবার কোনো উপায় ছিল না। নিজের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পরম উদাসীন আর আত্মচর্চায় একান্ত বিতৃষ্ণ। কেউ যদি কখনো তাঁর জীবন কথা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত তাকে নিরাশ হতে হতো। জিজ্ঞাসু তাঁর কাছে একটি মাত্র

১. লীলাপ্রসঙ্গ (গুরুভাব-পূর্বার্ধ)

উত্তর পেত : 'আমার চর্চা করো না। আমার চর্চা করে কোন লাভ নেই। ঠাকুর-স্বামীজির চর্চা কর।' আমাদের সৌভাগ্যক্রমে লাটু মহারাজ 'সৎকথা' নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ রেখে গেছেন। তিনি তাঁর গুরুদেবের মতোই নিরক্ষর ছিলেন। নিরক্ষর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত কথা যেমন কথামৃতে পরিণত হয়েছে, তেমনি তাঁর অন্তরঙ্গ এই নিরক্ষর পার্ষদটির মুখের কথাই 'সৎকথা।'

কথামৃতের তুল্যই স্বাদু 'সৎকথা' গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনের জ্যোতি আর চরিত্র। যদিও রামকৃষ্ণগত প্রাণ এই মহাপুরুষ—যাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল আশ্চর্য সরলতা আর পবিত্রতা—তাঁর পূর্বাশ্রমের কথা, বাল্য ও শৈশব জীবনের কথা কারো কাছে কখনো বলতেন না, তবু কিশোর বয়সে রামকৃষ্ণের দিব্য সংস্পর্শে আসা অবধি তাঁর জীবন কিভাবে চালিত ও গঠিত হয়েছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এই বইটিতে। তাঁর শৈশব জীবনের কিছু উপাদানও পাওয়া যায় এর মধ্যে। এই বইটি পাঠ করলেই আমরা জানতে পারি 'স্বামী অদ্ভুতানন্দের অদ্ভুত চরিত্র—তাঁহার কঠোর ত্যাগ, ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা, অলৌকিক গুরুভক্তি, অবিচল বিশ্বাস, অনির্বচনীয় ভগবৎ প্রেম, অটল বৈরাগ্য, তাঁহার প্রাণপণ আত্মসংগ্রাম, পরিপূর্ণ আত্মজয়, তাঁহার একাগ্র লক্ষ্য। উগ্র সাধনা, দুর্লভ সিদ্ধি, এবং সর্বশেষে লোক কল্যাণব্রতে তাঁহার অনন্য সাধারণ আত্মোৎসর্গ।'

দত্ত পরিবারের ভৃত্য ছিলেন লাটু মহারাজ। শৈশবের নাম রাখ্‌তু-রাম। বড় অদ্ভুত নাম। ছেলেবেলায় বসন্ত রোগের আক্রমণে তাঁর বাঁচবার কোন আশা ছিল না। তখন তাঁর মা রামচন্দ্রের কাছে ছেলের প্রাণ ভিক্ষা করে প্রার্থনা করেন। মায়ের সেই আকুল প্রার্থনা নিষ্ফল হয়নি। ছেলে আরোগ্যলাভ করল। মায়ের সরল মনে ধারণা জন্মাল, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রই তাঁর ছেলের জীবন রক্ষা করেছেন। তখন তিনি ছেলের নাম রাখেন রাখ্‌তু-

রাম। এই প্রসঙ্গে লাটু মহারাজ তাঁর ভক্তদের কাছে বলতেন— রামজী তো হামাকে বাঁচালে, তাই সবাই হামাকে রাখ্‌তু-রাম বলে ডাকতো। তিনি ছাপরা জেলার একগ্রামে এক মেষপালকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। 'আমি তো রাখালদের সঙ্গে থাকতাম, তাদের সঙ্গে মাঠে গরু চড়াতাম।' এই কথা বলতেন লাটু মহারাজ। বাপ মা খুবই গরীব ছিলেন—তু'বেলা তাঁদের পেটপুরে আহার্য পর্যন্ত জুটতনা। আহার সংস্থানের জন্য তাঁর পিতামাতাকে ভীষণ পরিশ্রম করতে হতো; এর ফলে তাঁরা অকালে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। রাখ্‌তু-রামের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর।

অনাথ বালক আশ্রয় পেলেন তাঁর কাকার কাছে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন: ভ্রাতুষ্পুত্রের তত্ত্বাবধান ও ভরণপোষণের ভার তিনি গ্রহণ করলেন। তাঁর অবস্থা সচ্ছল ছিল; সুতরাং কাকার বাড়িতে রাখ্‌তু-রামের দিনগুলি সুখেই অতিবাহিত হতে থাকে। কিন্তু কিছুকাল বাদেই কাকার জীবনে ঘটলো ভাগ্য বিপর্যয়। মহাজনের নিষ্করুণ পীড়নে তাঁকে হতে হয় গৃহহারা এবং অবশেষে দেশত্যাগী। ভাইপোটিকে নিয়ে অর্থোপার্জনের জন্য এলেন কলকাতায়। নিজের পিতৃ-পুরুষের ভিটেমাটি আর জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে আসতে বালক রাখ্‌তু-রামের মনে কি রকম কষ্ট হয়েছিল তা তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন: 'ওরে দেশ ছেড়ে চলে আসতে কারো মন কি চায়? আমার তো কান্না পেয়েছিল। তোদের আত্মীয়-স্বজন কত রয়েছে, তাদের ছাড়তে পারা কি সহজ? আমার তো কেউ ছিল না, আমি তবু পারিনি।' এখানে ওদের একজন দেশওয়ালি লোক ছিল। তার নাম ফুলচাঁদ। এই ফুলচাঁদকে ধরে রাখ্‌তু-রামের কাকা শিমুলিয়াতে ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে একটা কাজ ঠিক করে দিলেন। চাকরের কাজ। তখন কেউ কি জানতো যে, দত্তবাড়ির বারো বছরের এই ভৃত্যটি, ছাপরা জেলার একটি অখ্যাত গ্রামের এই অনাথ বালকটিই

শ্রীরামকৃষ্ণের একজন লীলাসহচর? এই রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন বিশ্বনাথ দত্তেরই এক নিকট আত্মীয়।

দত্তবাড়িতে সাধারণ হিন্দুস্থানী চাকর-বাকরদের মত সব রকম কাজ করতে হতো—বাজার করা, ঘর-দোর পরিষ্কার রাখা, ছোট ছেলেমেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। হাজার রকম ফাই-ফরমাশ খাটা। এসব কাজই রাখ্‌তু-রাম খুব তৎপরতার সঙ্গে করতেন। খুব পরিশ্রমী ছিলেন তিনি, হাসিমুখে প্রচুর সব আদেশ পালন করতেন। কিন্তু যেজন্য তিনি বাড়ির সকলের খুব প্রিয় হয়ে উঠে ছিলেন সেটা ছিল এই অনাথ কিশোরের চরিত্র। ভালো করে বাংলা বলতে পারতেন না—হিন্দী ও বাংলা মিশিয়ে এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ভাষায় তিনি কথা বলতেন। নম্র প্রকৃতি, সদা হাসি মুখ আর সচ্চরিত্র এই ভৃত্যটিকে বাড়ির সকলে খুব স্নেহ করতেন এবং এইখানে কাজ করবার সময় সবাই তাঁকে আদর করে ডাকতো লালটু। লালটু নামটি দত্ত-গৃহিণী রেখেছিলেন। রাখতুরাম মুছে গেল তাঁর জীবন থেকে।

বাড়ির কাজকর্মের অবসরে তিনি কুস্তি ও কসরৎ করতেন। রামবাবুর কোন বন্ধু তাই দেখে বলেছিলেন: পালোয়ান চাকর রেখেছ; ওর খোরাক জোগাতে পারবে তো? আর একদিন রাম বাবুর অপর এক বন্ধু সাবধান করে বলেছিলেন: মনে হয় তোমার এই হিন্দুস্থানী চাকরটি বাজারের পয়সা চুরি করে। এর উত্তরে গৃহস্বামী তাঁর বন্ধুটিকে বলেছিলেন: ছেলেটার মুখ দেখে তো আমার মনে এই সন্দেহ জাগে না। তবু তুমি যখন বলছ, একবার জিজ্ঞাসা করব তাকে। সেদিন সকালে বাজার থেকে ফিরে আসতেই মনিব জিজ্ঞাসা করেন, হাঁরে, লালটু, ঠিক করে বলতো আজ কটা পয়সা সরালি?

—জানবেন বাবু আমি নোকর বটে তাই বলে চোর নই।

দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় লালটু। গৃহস্বামী বুঝলেন, তাঁর এই

ভৃত্যটি চোর নয়। পরে লালটু তাঁকে জানিয়েছিল যে, দু'চার পয়সা তার যখন দরকার হয়, সে মাঈজীর কাছ থেকে চেয়ে নেয়। মাঈজী হলেন দত্তগৃহিনী।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় মাঝে মাঝে তাঁর ভক্তদের গৃহে আসতেন। তাঁর গৃহী ভক্তদের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন একজন। 'কথামৃত'-কার লিখেছেন: 'ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ইং ১৮৭৯, ১৮৮০ খৃস্টাব্দ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিতে থাকেন। তাঁহারা যখন ঠাকুরকে দেখেন তখন উন্মাদ অবস্থা প্রায় চলিয়া গিয়াছে। তখন শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের শেষভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন।'[১] দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে রামচন্দ্রের মন তখন রামকৃষ্ণময় হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে ফিরে তাঁরই প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি দত্ত-গৃহিণীর সঙ্গে আলোচনা করতেন। তখন ভৃত্য লাল্টুও সেখানে সময় সময় উপস্থিত থাকতেন। ঘর-দোর পরিষ্কার করতে করতে তাঁরো কানে আসত রামচন্দ্র কথিত শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত দু'একটি কথা:

'ভগবান মন দেখেন, কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না।

'যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তার কাছে ঈশ্বর প্রকাশিত হন।'

'নির্জনে তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে হয়, তাঁর জন্য কাঁদতে হয়, তবে তো তাঁর দয়া হয়।'

কথা তো নয়, কথামৃত।

এই ধারণা জাগতো সরল নিরক্ষর লালটুর মনে।

এইসব সুন্দর উপদেশ কিশোরের মনে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল লাটু মহারাজের গোপন সাধন জীবন।

১. কথামৃত (১ম)।

ছুপুর বেলায় কাজকর্ম সেরে, কম্বল ঢাকা দিয়ে যখন তিনি তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে শুয়ে থাকতেন তখন তাঁর চোখ ছুটি জলে ভিজে উঠতো। কার জন্য কাঁদতেন তিনি আর কেনই বা কাঁদতেন? একদিন তাঁর এই ব্যাপার দেখে দত্ত-গৃহিণী জিজ্ঞাসা করেন, হাঁরে লালটু, তুই কাঁদিস কেন? কাকার জন্য মন কেমন করে? লালটু নীরব থাকেন। তখন কে জানতো যে তার মনিবের মুখে শোনা সেই সাধুটির চিন্তায় আজ তিনি বিভোর। তাঁকে একটিবার স্বচক্ষে দেখবার জন্য মন তাঁর ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সুযোগ খোঁজেন লালটু। যেমন করেই হোক একটিবার সেই সাধুটিকে দেখা চাই। সেদিন ছিল রবিবার। রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করছেন। সপ্তাহে এই দিনটাতেই তাঁর একটু অবসর মিলত। মনিবের কাছে এসে সংকোচের সঙ্গে লালটু নিবেদন করেন: বাবু, আপনি আজ সেখানে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—আমায় নিয়ে যাবেন?

—তুই সেখানে যাবি কেন?

—তাঁকে একটিবার দেখব।

বিশ্বস্ত ভৃত্যের এই স্নেহের আব্দার সহৃদয় মনিবের পক্ষে উপেক্ষা করা কঠিন হলো। তিনি লালটুকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। তাঁরা যখন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পৌঁছলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে ছিলেন না। তুই এই বারান্দায় একটু দাঁড়া, আমি খুঁজে দেখি তিনি গেলেন কোথায়। এই বলে রামচন্দ্র মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন। লালটু দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমের বারান্দায়। তাঁর বুক দুরুদুরু করছে, দেবমানবকে দর্শন করতে এসেছেন তিনি। কত চিন্তা, কত ভাব ফুলঝুরির মতো ফেটে পড়ছে নিরক্ষর সেই কিশোরের মনে। কিছুক্ষণ বাদেই রামচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুর ফিরলেন। দণ্ডায়মান ছেলেটিকে দেখতে পেয়েই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন তিনি:

এই ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছ, রাম? একে কোথায় পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ দেখছি।

তাঁর সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে এই নবাগত কিশোরটিকে লীলা সহচর বলে চিনতে দেরী হলো না শ্রীরামকৃষ্ণের। অন্যদিকে, লাল্টুর মনই তাঁকে জানিয়ে দিল, ইনিই সেই সাধু যাঁর কথা তিনি অনেকবার শুনেছেন তাঁর মনিবের মুখে। তাঁর দুটি চরণে ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করেন লালটু। তারপর হাত দুটি জোড় করে ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিনম্রচিত্তে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। দেবমানবের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ তাঁর ওপর। আপন মনেই তিনি বলছেন: যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞান হয়েই রয়েছে। তারা যেন পাথর-চাপা ফোয়ারা। চাপটা সরিয়ে দিলেই অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফর ফর করে জল বেরুতে থাকে।

লালটু তেমনিভাবে করজোড়ে দাঁড়িয়ে।

মুখে কথা নেই-যেন নিস্তব্ধ পাষাণ-মূর্তি।

হঠাৎ সেই পাষাণ-মূর্তিকে স্পর্শ করলেন রামকৃষ্ণ।

তারপর? 'সহসা লাটুর রোমাঞ্চ হইল, ওষ্ঠদ্বয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, আর দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল—লাটু তখন আর এই জগতে নাই! অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর তাঁহাকে আবার স্পর্শ করিলে লাটুর ভাবসংবরণ হইল। স্বীয় লীলাসহচরকে এক আঁচড়েই চিনিয়া লইয়া ঠাকুর রামচন্দ্রকে নির্দেশ দিলেন, এখানে ওকে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিও। আর লাটুকে বলিলেন, ওরে, আসিস। এখানে মাঝে মাঝে আসবি, জানিস।'[১]

আর একদিনের কথা।

সেদিন সকালে রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কিছু ফল-মিষ্টি পাঠাবেন। কে নিয়ে যাবে? মনিবের অভিপ্রায় জানতে পেরে লাটু বলেন সাগ্রহে, আমাকে দিন। আমি ওখানে পৌঁছে দেব।

১. ভক্তমালিকা: স্বামী গম্ভীরানন্দ।

—পথ চিনে যেতে পারবি ?

—আজ্ঞে পারব।

—তবে চান-টান করে তৈরী হয়ে নে। একটা ছোট টুকরি নিয়ে যেতে হবে। তাঁর হাতে দিবি।

বেলা তখন এগারোটা যখন লাটু মহারাজ দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছলেন। বাগানের রাস্তায় ঠাকুরের দর্শন পেয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানালেন। সহাস্য বদনে তিনি তাঁর চিহ্নিত এই সন্তানটিকে বলেন—কি রে লাটু ? কি মনে করে ?

—আজ্ঞে কর্তা এইটা দিয়েছেন আপনাকে।

—কী আছে এর মধ্যে ?

—ফল আছে, মিঠাই আছে।

—ঐখানে রেখেদে। এবেলাটা এখানে থেকে যা। একটু পরে মন্দিরে গিয়ে মায়ের ভোগ-আরতি দেখবি। তারপর আমার প্রসাদ পাবি।

পরক্ষণেই ঠাকুরের হুঁস হয় কালীমন্দিরের প্রসাদ তো আমিষ ; লাটু বিহার দেশের মানুষ, মাছ-মাংস খায়না, ওর সংস্কারে বাধবে। কিন্তু বিষ্ণুমন্দিরের ভোগ নিরামিষ, এবং রান্না হয় গঙ্গাজলে। তখন লাটুকে বলেন, তুই ইচ্ছে করলে এই ভোগ খেতে পারিস।

—আপনি যা পাবেন, আমি তাই খাব—আমি তো আপনার প্রসাদ পাব। এই সরল উত্তর ঠাকুরের মনকে স্পর্শ করলো—তবু একটু পরিহাসের ভঙ্গিতে পার্শ্বে দণ্ডায়মান ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের দিকে তাকিয়ে বলেন : শালা কেমন চালাক দেখেছিস ? আমি যা পাব শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়। যাই হোক, তাঁর ইষ্ট-দেবের প্রসাদই গ্রহণ করে লাটু মহারাজ সেদিন কৃতার্থ হয়েছিলেন। তাঁকে পাশে বসিয়েই ঠাকুর যত্নের সঙ্গে খাওয়ালেন তাঁর লীলা সহচরটিকে। লাটুর অন্তরে আনন্দ যেন আর ধরেনা। যখন তাঁর

ভুক্ত অন্ন একটুখানি ভক্তের হাতে তুলে দিয়ে বলেন—এই নে, মহা-প্রসাদ নে—তখন লাটুর সমস্ত অন্তর, সমস্ত সত্তা যে এক অনির্বচনীয় দিব্য পুলকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

দিন যায়। গুরুর প্রতি লাটুর চিত্ত আরো আকৃষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। চাকরিতে আর মন বসেনা। ঠাকুরের কাছে একদিন এসে তাঁর মনের কথা নিবেদন করে বলেন, আমি আর চাকরি করবে না ; আপনার এখানে থাকব।

—আমার এখানে থাকবি, তা রামকে বলেছিস।

—আপনি বলে দেবেন।

—তাহলে পরে বলব। এখন তো আমি এখানে থাকছি না। দেশে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন মনিবগৃহে কি রকম অনাসক্তভাবে থাকতে হয়, সেই কৌশলটা শিখিয়ে দিলেন। তারপর তিনি কামারপুকুর চলে গেলেন। ঠাকুর নেই, তবুও লুকিয়ে লুকিয়ে আসতেন তিনি দক্ষিণেশ্বরে। একদিন জানতে পেরে রামবাবু তাঁর প্রিয় ভৃত্যটিকে (শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভের পর থেকেই, রামচন্দ্র তাঁর ভৃত্যটিকে একটু স্নেহমিশ্রিত সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতেন।) জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর তো ওখানে এখন নেই ; তবে মিছি মিছি যাস কেন ?

—দক্ষিণেশ্বরে তাঁর নিত্য অবস্থান।

রামচন্দ্র—রামকৃষ্ণের ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত—বিস্মিত হয়ে গেলেন লাটুর মুখে এই উত্তর শুনে।

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ের মন্দিরে আসা নিষিদ্ধ হলে সর্বক্ষণের জন্য একজন সেবকের অভাবে তাঁকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। সেই সময় রামচন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর তাকে বললেন, রাম, লাটুকে আমার কাছে রেখে দাও। ছেলেটি খুব শুদ্ধ

আধার। আর এখানে থাকতেও ভালবাসে। সেইদিন শ্রীরামকৃষ্ণ লাটুমহারাজকে শুধু তাঁর সেবক হিসাবেই গ্রহণ করেন নি। তিনি নিজের হাতে এই অনাথটির সকল দায়িত্বই নিয়েছিলেন। এমন সৌভাগ্য তাঁর আর কোন সন্ন্যাসী সন্তানের হয়নি। তখন থেকেই তিনি তাঁকে ঠিক পুত্রনির্বিশেষে দেখতেন। তাঁকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন; বর্ণপরিচয়কালে ব্যঞ্জন বর্ণে এসে তিনি ঠেকে যান। শত চেষ্টা করেও তাঁর মুখ দিয়ে 'ক' এবং 'খ' ঠিকমত উচ্চারিত হতো না। লাটুর লেখাপড়া এখানেই শেষ হয়।—'যা তোর আর পরে দরকার নেই। পুঁথিগত বিদ্যা শুরুতেই শেষ হলেও পরম করুণাময় ঠাকুর তাঁর এই সন্তানটিকে অধ্যাত্মবিদ্যায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। সে-ইতিহাস জানবার মতো, বুঝবার মতো।

অতঃপর দক্ষিণেশ্বরের দিন ফুরালে শ্রীরামকৃষ্ণ চিকিৎসার জন্য যখন প্রথমে কলকাতায় এবং পরে কাশীপুরে অবস্থান করেন তখন 'ছায়াবানুগতা' হয়ে লাটুমহারাজ, তাঁর অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের মতো ইষ্টদেবের সেবা ও পরিচর্যায় তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীগুরুর সন্নিধানে এবং গুরুগতপ্রাণ নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের সাহচর্যে লাটুমহারাজের দিনগুলি সুখেই অতিবাহিত হতো। তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম করুণা দেখে প্রত্যেক গুরুভ্রাতা নিরক্ষর লাটুমহারাজকে বিশেষ চক্ষে দেখতেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি শ্রীমায়ের সেবাতেও নিযুক্ত ছিলেন। সেবাকার্যে তাঁর নিষ্ঠা ও তন্ময়তা দেখে তাঁর প্রত্যেকটি গুরুভ্রাতা বিস্মিত হতেন।

শেষের দিকে তিনি নিদ্রাকে জয় করেছিলেন। প্রায় সারা রাত ধ্যান-ধারণায় কাটিয়ে দিনের বেলায় একটু বিশ্রাম করতেন। শ্যামপুকুর ও কাশীপুরেও লাটুমহারাজ সেবার সঙ্গে সাধনায় রত থাকতেন। ঠাকুর অপ্রকট হওয়ার পর শ্রীমায়ের বৃন্দাবনযাত্রার

সময় অনেকেই সঙ্গে গিয়েছিলেন। লাটু তাঁহাদের অন্যতম। ঐ সময় তিনি কিছুদিন অন্যের অজ্ঞাতসারে যমুনাপুলিনে তপস্যায় রত ছিলেন। বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তাঁর নাম হয় স্বামী অদ্ভুতানন্দ। সন্ন্যাসী অদ্ভুতানন্দ একাদিক্রমে দেড় বছর এই মঠে দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সেই তপস্যার বর্ণনা আছে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের লেখায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখেছেন : 'বরাহনগর মঠে দেখেছি রাত্রে লাটু ঘুমাতেন না। তেমনি ডেকে না খাওয়ালে তাঁর খাওয়ার হুঁশ থাকত না। এমন কতদিন হয়েছে যে, আমাদের সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, ডেকে তার সাড়া না পেয়ে ঘরে তার খাবার দিয়ে আসা হয়েছে। দুপুর গেছে, সন্ধ্যে গেছে, সেই রাত্রে তাকে ডাকতে গেছি —লাটু সেই একইভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে আর দুপুরের খাবার তেমনি পড়ে আছে। অনেক ডাকাডাকি হাঙ্গামা-হুজ্জুত করে তবে তাকে খাওয়ানো হতো।

১৮৯২ থেকে ১৮৯৭ এই ছয় বছর লাটু মহারাজের প্রকৃত বাস-স্থান ছিল গঙ্গাতীর। সন্ন্যাসীর জীবনের এই কয় বছরের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হলে গিরিশচন্দ্রের ভাষায় বলা চলে : গীতার সাধু দেখতে চাও তো লাটুকে দেখ গে।' 'এই কয় বৎসর স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রায়ই ভিক্ষালব্ধ অর্থে চালভাজা বা ছোলা ভাজা কিনিয়া দিবসের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। বস্ত্রের জন্য তিনি রামবাবুর দ্বারে উপস্থিত হইতেন এবং কম্বলাদি গিরিশবাবুর নিকট হইতে লইতেন। শেষের আড়াইটা বছর নিরন্তর জপধ্যানে এবং অন্তর্মুখীন ভাবেই কেটেছিল তাঁর। স্বামী বিবেকানন্দের তিনি কি রকম প্রিয় ছিলেন তার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই দুই সন্ন্যাসী সন্তানের চিন্তাধারা ও জীবন প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ১৮৯৭। স্বামীজি আমেরিকা থেকে ফিরে এলে বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়ি তাঁকে সংবর্ধনা

করা হয়। সেই সংবর্ধনা সভায় একজন বাদে আর সব গুরুভাই উপস্থিত ছিলেন। সেই একজন আর কেউ নন—স্বামী অদ্ভুতানন্দ। তিনি ভেবেছিলেন, 'ওদেশে সাহেব মেমদের সঙ্গে মেলামেশা করে নরেনের কি আমার কথা মনে আছে?' নরেন্দ্র নাথ কিন্তু ঠিকই মনে করে রেখেছিলেন এবং তাঁকে খুঁজে আনা হলে, গলায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'তুই আমার সেই লাটুভাই, আর আমি তোর সেই লরেন ভাই।' এ ভ্রাতৃভাবের কি কোন তুলনা আছে? মতের অমিল থাকলেও স্বামীজি তাঁর এই গুরুভাইটিকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন। ১৮৯৭ সালে তিনি যখন উত্তরভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তখন স্বামী অদ্ভুতানন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর ইষ্টদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ে আদর্শটি যেন লাটু মহারাজের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর উদারতা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। তিনি ঈদ ও মহরম উপলক্ষে যেমন পীরের দরগায় পূজা পাঠাতেন তেমনি বড়দিন ও গুডফ্রাইডের দিনে নিজের হাতে যীশুখ্রীস্টকে ভোগ নিবেদন করতেন। তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ-ছয় বৎসর (১৯১৫-১৯২০) কাশীতে বিশ্বনাথের চরণপ্রান্তে অতিবাহিত হয়েছিল। সেই সময় লাটু মহারাজ একমাত্র ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন না। তাঁর কাছে তখন বহুভক্তের সমাগম হত এবং তিনি তাদের বিবিধ আধ্যাত্মিক অভাব মেটাতেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখে সর্বদা উচ্চ ধর্মতত্ত্ব শোনার জন্য অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন। তাঁর এই সময়কার উপদেশাবলী সংগৃহীত হয়ে পরে 'সৎকথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' বই দুটির তুল্যই এই গ্রন্থটি—মঠের অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসীর মুখে এই কথা এই গ্রন্থের লেখক শ্রুত আছেন। যিনিই এ বই পাঠ করেছেন তিনিই এই রামকৃষ্ণ সন্তানের গভীর অনুভূতি দেখে অবাক হয়েছেন।

১৯২০, ২৪ এপ্রিল, শ্রীরামকৃষ্ণের 'লেটো', বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দের আদরের 'লটুভাই' মহাসমাধি লাভ করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের একটি মর্মস্পর্শী চিঠিতে এই মহাপ্রয়াণের কথা এই-ভাবে বর্ণিত হয়েছে : এমন অদ্ভুত মহাপ্রয়াণ প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং সর্বদা অন্তর্মুখ থাকিতেন। অসুখের সময় হইতে একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন—ভ্রূমধ্যবদ্ধ দৃষ্টিসকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত।...যখন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয় তখনকার মুখের ভাব যে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া জানানো যায় না। একেবারে বিহ্বগরিত ও উন্মুক্ত চক্ষু দুইটিতে যে কি ভালবাসা, কি প্রসন্নতা, কি সাম্য ও মৈত্রভাব দেখিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইল। বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে। সকলকেই যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। অদ্ভুতানন্দ নাম সার্থক করিতেই যেন প্রভু এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন।'[১]

---

১ 'ভক্তমালিকা গ্রন্থ থেকে উৎকলিত।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের 'গোপাল মুরুব্বি', গুরুভাইদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র 'গোপাল দাদা' আর ভক্তদের প্রিয় 'বুড়ো গোপাল—বিশাল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যিনি এই সব নামে পরিচিত ছিলেন, তিনিই স্বামী অদ্বৈতানন্দ। ঠাকুরের সন্ন্যাসীসন্তানগণের মধ্যে বয়সে ইনিই ছিলেন সকলের বড়ো ; এমন কি, তাঁর ইষ্টদেবতারও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তিনি। এইজন্য সঙ্ঘে তিনি একটি বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেছিলেন। আরো একটি কারণে সঙ্ঘে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। কাশীপুরের বাগান বাড়িতে মহাসমাধিলাভের কিছুদিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যে এগারোটি মানস সন্তানকে গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করে তাঁদের ভাবী জীবনের ইঙ্গিত রেখে গিয়েছিলেন, সেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর এই মুরুব্বি গোপালের জন্যই। প্রসঙ্গান্তরে এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। আবার বরাহনগর মঠের প্রথম স্থায়ী অধিবাসী ছিলেন তিনিই ; কারণ তখন তাঁর নিজের বলতে কোন আবাসস্থল ছিল না। ঠাকুরের ষোলজন সন্ন্যাসী সন্তানের মধ্যে সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, স্বামী যোগানন্দ এঁর কিঞ্চিৎ পরবর্তী।

'শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে ভক্ত সঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে যা'ন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের 'কাপ্তেন' এই সময়ে আসিতে থাকেন। সিঁথির গোপাল

('বুড়ো গোপাল') ও মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এই সময়ে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।'[১]

শহর কলকাতার উপকণ্ঠ সিঁথিতে এক সদ্গোপ পরিবার বাস করতেন। এঁদের পৈতৃক বাসস্থান ছিল চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে। এই গ্রামের অপর নাম জগদ্দল। জগদ্দলের ঘোষেরা সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। এই বংশের অধস্তনপুরুষ গোবর্ধন ঘোষ পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করে সিঁথিতে এসে বসবাস করতে থাকেন। এঁরই প্রথম পুত্র গোপাল চন্দ্র ঘোষ ১৮২৮ সালের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর বাল্য, শৈশব বা কৈশোর জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সিঁথিতে বেণীমাধব পাল নামে একজন ধর্মপরায়ণ ব্যবসায়ী বাস করতেন। তিনি ব্রাহ্ম-ভক্ত ছিলেন। এই বেণীপালের চিনাবাজারে বুরুশ, পাপোষ প্রভৃতির একটি দোকান ছিল। তিনি গোপালচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁর দোকানে কুড়িটাকা মাইনের একটা কাজে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেকালের প্রথানুসারে গোবর্ধন তাঁর ছেলের বিবাহ খুব অল্প বয়সেই দিয়েছিলেন ; তখন গোপালের বয়স কুড়ি বছরও পূর্ণ হয়নি।

তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন গোপালের স্ত্রীবিয়োগ হয়। তিনি দারুণ শোক পান ; সংসার অনিত্য মনে হয়। একটা বৈরাগ্যের ভাব জাগে তাঁর মনে—তিনি এক সংশয়াতীত পরম সত্যের খোঁজ করতে থাকেন। লেখাপড়া তিনি বিশেষ কিছু শেখেন নি, তাই কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা শাস্ত্রচর্চা করা থেকে তিনি স্বভাবতই বিরত ছিলেন। কিন্তু একটা ধর্মের ভাব ফল্গুনদীর মতো তাঁর অন্তরে সর্বদা প্রবহমান ছিল। সিঁথিতে তাঁর এক বন্ধু ছিলেন—মহেন্দ্র কবিরাজ। ইনি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা করতেন। পত্নীর

১ কথামৃত (১ম ভাগ)

মৃত্যুর পর গোপালচন্দ্র একদিন শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁর বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা মহেন্দ্র, তোমার কোন সাধু-সন্ন্যাসী জানা আছে যাঁর কাছে গেলে মনের অশান্তি দূর হয়।

—দক্ষিণেশ্বরে এক সাধু আছেন—গেরুয়াধারী সাধু নন, ধুতি-কোট পরা সাধু—আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যাই। তাঁর নাম রাম-কৃষ্ণপরমহংস।

—তাঁর কাছে গেলে কি শান্তি পাব?

—একবার গিয়ে দেখতে পারো। তাঁর কৃপা যদি হয় তাহলে, আমার ধারণা, তোমার এই যে অশান্তি, সংসারের ওপর বৈরাগ্য-এসব দূর হয়ে যেতে পারে।

—আমাকে একদিন তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারো, মহেন্দ্র?

—হ্যাঁ। কবে যাবে বলো? ওখানেই বা যাবে কেন? তুমি যাঁর দোকানে চাকরি করো সেই বেণীপালের বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে আসেন। এখানকার সমাজেও আসেন।

—পাল মশাই শুনেছি ব্রাহ্ম।

—কিন্তু ভক্ত মানুষ। তাঁর বাড়িতে শরৎ ও বসন্তকালের উৎসবে তিনি মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আনেন।

বন্ধুর কথা অনুসারে গোপালচন্দ্র ঠিক করলেন রামকৃষ্ণ যখন সিঁথিতে আসবেন তখনই তিনি তাঁকে দর্শন করবেন। শীঘ্রই সে সুযোগ এসে গেল। পাল মশাইকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি জানালেন যে এই সামনের রবিবারেই রামকৃষ্ণের শুভাগমন হবে তাঁর বাড়িতে। সেদিন ছিল বসন্ত পঞ্চমী। বেলা দশটা নাগাদ ঠাকুর এলেন বেণীপালের বাড়িতে। তখন—

'গোপাল বিশ্বাস-সহ আইলা দেখিতে।
শান্তি দাতা রামকৃষ্ণে মহেন্দ্রের সাথে ॥[১]

---

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

দেখলেন, প্রণাম করলেন, কিন্তু তাঁর অশান্ত মন শান্ত হলো না, শোকেরও উপশম হলো না। সত্যি কথা বলতে এই প্রথম দর্শনে গোপালচন্দ্রের মন ভরেনি ; ফলে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধার ভাবও জাগেনি। বন্ধুকে বলেন তিনি অকপটে—কই মহেন্দ্র তোমার সাধুকে দেখে আমার শোকতাপ তো দূর হলো না আর মনের অশান্তিও ঘুচল না।

—কি যে বলো গোপাল ছেলে মানুষের মতো। মহাপুরুষকে কি একদিনে চেনা যায়। তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর সঙ্গ করতে হয়। তুমি চলো একদিন আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে।

তাই হলো। বন্ধুর সঙ্গে গোপালচন্দ্র এলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে। তারপর ? 'দ্বিতীয়বার শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া গোপাল-দা তাঁহার ভালবাসায় বাঁধা পড়িলেন এবং উহাই ক্রমে নিবিড়তর হইয়া তাঁহার সমস্ত সংসার বন্ধন দূর করিয়া দিল। ঠাকুরকে পাইলেন তিনি তাঁহার ব্যথার ব্যথিরূপে ; আর তাঁহার মুখে অবিরাম ভাগবতী কথা শুনিয়া ও বৈরাগ্যের অনুপ্রেরণা পাইয়া তিনি জানিলেন যে, এই সংসাররূপ মায়ামরীচিকায় মুগ্ধ জীবের পক্ষে বৈরাগ্যই একমাত্র মহৌষধ।'[১]

সেই থেকে গোপালচন্দ্র মনেপ্রাণে দক্ষিণেশ্বরের এই দেবমানবের আশ্রয় নিলেন। তিনি এখন বুঝেছেন যে, তাঁর চরণস্পর্শমাত্র এই মায়াময় সংসার অতিক্রম করা যায়। পত্নী-বিয়োগ গোপালচন্দ্রের জীবনে যেন শাপে বর হয়ে উঠেছিল। ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম পরিচয় অল্প দিনের মধ্যে পরিণত হয় গভীর শ্রদ্ধাভক্তিতে। সংসার ত্যাগ করে, তাঁর সান্নিধ্যে বাস করার জন্য তাঁর মন উন্মুখ হয়ে উঠতে থাকে। অন্তর্যামী ঠাকুর সেটা বুঝতে পেরে তাঁকে কৃপা করলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসাযাওয়া করতে করতে তাঁর সঙ্গে লাটু মহারাজের পরিচয় হয়। তিনিই একদিন গোপালচন্দ্রকে বলেছিলেন : এমনটি

১. ভক্তমালিকা।

আর কোথায় পাবে ? ঠাকুরকে তোমার যথাসর্বস্ব বলে গ্রহণ করো, ওঁর চরণে আশ্রয় নাও—কোন ভয়-ভাবনা থাকবে না। এইত আমি এখানে ওঁর পায়ের তলায় পড়ে আছি, দিব্যি আছি।

ক্রমে গোপালচন্দ্রের এমন অবস্থা হলো যে দক্ষিণেশ্বরে না এসে তিনি থাকতে পারতেন না। এখানকার মাটি যখন গায়ে মাখতেন, তখন তাঁর শরীর-মন জুড়িয়ে যেত। ভগবানলাভের জন্য উদ্দীপনা প্রবল হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্যসত্যই ঈশ্বরপ্রেমিক এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। একটা অনির্বচনীয় ব্যাকুলতায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে তাঁর সকল সত্ত্বা। মনের কথা একদিন বললেন তিনি লাটু মহারাজকে। বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন : লাটু ভাই, আমি কি ঠাকুরের দয়া পাব না ? সান্ত্বনা দিয়ে লাটু মহারাজ যখন তাঁকে বললেন, নিশ্চয় পাবে, আলবৎ পাবে তখন গোপালচন্দ্রের মন আশা ও আনন্দে ভরে ওঠে।

একদিন। দুপুরবেলা। তখনো ঠাকুর মধ্যাহ্ন আহার গ্রহণ করেননি। একাকী বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সুযোগে গোপালচন্দ্র তাঁকে জানালেন তাঁর মনের ইচ্ছা। একটা অভাব বোধ করছি—এই বলে নতজানু হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পা দুটি জড়িয়ে ধরে গোপালচন্দ্রের সে কি কাতর ক্রন্দন। দূর থেকে এই দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় লাটু মহারাজের। দেখলেন, ঠাকুর হাত ধরে গোপালকে তুলছেন—করুণার অপার্থিব জ্যোতিতে তাঁর মুখখানি উদ্ভাসিত। গোপালচন্দ্রের দুই চোখ বেয়ে তখনো দর দর ধারে অশ্রু ঝরছে। তারপর কি হলো তিনি জানেন না। কিন্তু এরপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গোপালচন্দ্রকে বিষ্ণুমন্দিরে কীর্তন করতে দেখা যেত। তিনি খুব ভাল কীর্তন করতে পারতেন। সিঁথিতে বেনীপালের বাড়িতে কীর্তন করার জন্য তাঁর ডাক পড়ত মাঝে মাঝে। গলাও ছিল সুমিষ্ট। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মুরুব্বির গলাটিও খাসা ; কীর্তনের ঢংটিও ভালো।

আর একদিন।

সেদিন দুই সেবক—লাটু ও গোপালকে নিয়ে একটু কৌতুক করছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পরম কৌতুকী ঠাকুর এরকম প্রায়ই করতেন যখন এই দুজনকে তাঁর সামনে পেতেন। কি একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লাটুকে বলেন ঠাকুর, লেটো, এই যে তোরা সব এখানে আসিস, এখানকার কথা যা শুনবি তা মানবি তো?

—ও হামি বুঝে না। আপনি বুঝিয়ে দিন এখানকার কথা।

—ওগো গোপাল-মুরুব্বি, শোনো লেটো কি বলে।

—হামি ঠিকই বোলে। এখানকার কথা কুছু বোঝে না—বুঝিয়ে দিন।

—লাটু বলছে, ও এখানকার কথা বুঝতে পারে না, আপনি বুঝিয়ে দিন।

—এখানকার কথা কি কাউকে বোঝান যায়? তুমিই বলো না, বাপু লেটোর এ কেমন আব্দার?

—আপনার তো জানা আছে, বলে দিন না।

—তুমিও দেখছি লেটোর দলে। এখানকার কথা কি জানাতে আছে?

—সেই কথা শুনবার জন্যই তো আমরা সব আসি এখানে।

রামকৃষ্ণকে হার মানতে হলো। হেসে বলেন: এখন নয়—এখানকার কথা এখন নয়। সময় হলে একদিন তোমরা সব বুঝবে।

তারপর সেই শুভ সময় যেদিন এলো, ঠাকুর নিজে থেকে তাঁর এই চিহ্নিত সন্তানটিকে কৃপা করলেন। ঠাকুর তখন তাঁর সন্তানদের নিয়ে থাকেন কাশীপুরে। গোপালও আছেন এখানে। 'সেদিন (১৮৮৫, ১১ ডিসেম্বর) কাশীপুরে প্রেমের ছড়াছড়ি—নিরঞ্জন ও কালীপদকে ঠাকুর কৃপা করিলেন; পরে দুইটি ভক্ত-মহিলাও কৃপালাভ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে চলিয়া

গেলেন। ঠাকুর অতঃপর গোপাল-দাকে ডাকাইয়া আনিয়া কৃপা করিলেন।'[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করার পর এক নতুন খাতে বইতে থাকে গোপালচন্দ্রের জীবন। যেন নবজীবন লাভ হলো তাঁর। 'ঠাকুরের সেবা করিয়া ও উপদেশ শুনিয়া গোপালদা নিজেকে চরিতার্থ মনে করিলেন তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ মন স্বতই সাধনার জন্য ব্যাকুল হইত। সেই প্রেরণায় তিনি কখনো কখনো নরেন্দ্রাদির সহিত কাশীপুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ধ্যানজপ ও তপশ্চর্যা করিতেন। কাশীপুরে থাকাকালে তিনি একবার তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন।'[২]

১৮৮৮ সাল থেকে আটবছর ধরে চলেছিল স্বামী অদ্বৈতানন্দের তীর্থভ্রমণ। শরীর অপটু, কিন্তু মন ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহে পরিপূর্ণ। সেই মনোবলে বৃদ্ধ বয়সে তিনি কেদারনাথ থেকে কন্যাকুমারী এবং দ্বারকা থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত প্রধান প্রধান তীর্থগুলি দর্শন করেছিলেন।

কাশী ছিল তাঁর প্রিয় তীর্থক্ষেত্র। এইখানে তিনি দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল এমন একজনের বিবরণ একটু উদ্ধৃত করছি এখানেঃ 'কাশীধামে প্রাত্যহিক সাধনা ও জীবন প্রণালীতে স্বামী অদ্বৈতানন্দের চিরাচরিত নিয়মানুবর্তিতা ও সুশৃঙ্খলা প্রখরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত কথা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচার করে স্বামী বিবেকানন্দ যখন দেশে ফিরলেন মঠ তখন বরাহনগর থেকে আলমবাজারে উঠে এসেছে। এইবার তিনি গুরুভাইদের সাহায্যে গুরুর নামাঙ্কিত সঙ্ঘকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করার কাজে সচেষ্ট হলেন। স্বামীজির সপ্রেম আহ্বান গেল কাশীতে।

---

১. কথামৃত (৪র্থ ভাগ)

২. ভক্তমালিকা।

অমনি আলমবাজার মঠে ফিরে এলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দ। ঠাকুরের প্রিয়তম সন্তান নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর এবং সকলেরই বয়োজ্যেষ্ঠ এই গুরুভ্রাতাটির ছিল বিশেষ আনুগত্য। তাই দেখা যায় যে, যেইমাত্র স্বামীজি বললেন, অমনি বৃদ্ধ বয়সে তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন 'লঘুকৌমুদী'। বেলুড়ে গঙ্গাতীরে মঠ তৈরী হবে, সেজন্য জমি কেনা হয়েছে। আলমবাজার থেকে মঠ উঠে এলো নীলাম্বর-বাবুর বাগানে। মঠের নির্মাণকার্য তত্ত্বাবধান করার জন্য স্বামীজি অনুরোধ করলেন গোপাল দাদাকে। তখন থেকে শুরু হয় তপস্বী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর শেষ অক্লান্ত কর্মজীবন। বলা বাহুল্য, স্বামী অদ্বৈতানন্দ এই কাজকে যুগাবতারের ভাবপ্রচারের তপস্যা হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন।

কালক্রমে মঠে নতুন ছেলেদের সমাগম হতে থাকে। মহারাজের আদেশে নতুন ব্রহ্মচারীদের স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে বাগানের কাজ করতে হতো। তারা সব স্কুল-কলেজে-পড়া ছেলে। এই ধরনের কাজে স্বভাবতই তারা ছিল অনভ্যস্ত—বৃদ্ধ গোপালদার সঙ্গে তারা সমানতালে চলতে পারতনা। তিনি বিরক্ত হতেন, সময় সময় বকতেন। তাঁর সেই ভর্ৎসনার তীব্রতায় ব্রহ্মচারীরা আঘাত পেতো, মনে মনে দুঃখিত হতো। 'কিন্তু একদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন, সর্বভূতে তিনিই বিদ্যমান। এই অনুভূতির পরে তাঁহার ঐ স্বভাবের পরিবর্তন হইল। তিনি বলিতেন, সর্বভূতে তিনিই বিরাজমান ; কাকে নিন্দা করি, আর কারই বা সমালোচনা করি? ঠাকুরের সংসার, আর ইহারা ঠাকুরেরই সন্তান—এই মনোভাব লইয়াই তিনি বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া গিয়াছিলেন।'[১]

সঙ্ঘের এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসীর চরিত্রের একটি লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যনিষ্ঠা। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের

---

১. ভক্তমালিকা।

প্রত্যেকটি সন্তানের চরিত্র এই বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর ছিল। তবে স্বামী অদ্বৈতানন্দের চরিত্রে এর একটা বিশেষ ব্যঞ্জনা পরিদৃষ্ট হতো। তিনি নিজে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, মঠের ব্রহ্মচারীদেরকে তেমনি সত্য-পরায়ণ হতে বলতেন। শুধু বলা নয়—উৎসাহও দিতেন। তাদের বলতেন ঃ জানিস, ঠাকুর আমাদের সব সময়ে বলতেন ঃ সত্যকথা বলা কলিযুগের তপস্যা।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ চর্চারত শ্রীরামকৃষ্ণের যে নিখুঁত ছবি তুলে ধরতেন তা তাঁর বর্ণনার গুণে একেবারে জীবন্ত হয়ে শ্রোতাদের মনশ্চক্ষের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। ইষ্টদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটি বাণী তাঁর মনের মধ্যে ঠিক যেমন গাঁথা ছিল, তেমনি তাঁর প্রতিটি আচরণ—পদক্ষেপ, হস্তচালনা, মুখভঙ্গী, চোখের ভঙ্গী—তাঁর দৃষ্টিপটে আলোকচিত্রের প্রত্যক্ষতা নিয়ে সর্বদা জ্বল্‌জ্বল্ করতো।

তোমরা ঠাকুরের কথা শুনতে চাও খুব ভাল কথা—এই বলে তিনি শুরু করতেন এবং আলোচনা করতে করতে এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যা কোন মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তোমরা ঠাকুরের ছবি দেখেছ—ছবির রামকৃষ্ণ আর আমাদের স্বচক্ষে দেখা রামকৃষ্ণে কত তফাৎ। যেদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে তাঁর সেই ঘরটিতে দ্বিতীয়বার দর্শন করেছিলাম সেদিন কি মনে হয়েছিল জানো? ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলাম, জীবন্ত করুণার প্রস্রবণ যেন নরমূর্তি ধারণ করে তক্তাপোষের উপর বসে আছেন। মাথায় নেই জটা। কোমরে নেই ল্যাঙ্গোট (কৌপিন), পরনে গেরুয়া কাপড়ও নেই। পরিধানে ছিল লালপেড়ে সুপরিচ্ছন্ন একখানি সাদা ধুতি আর গায়ে কালো রঙের একটা জামা। কোঁচার খুঁটটি কাঁধের ওপর রাখা। মুখখানা লম্বা দাড়িতে ঢাকা নয়, ভদ্রলোকের মতো গোঁফ দাড়িতে সুশোভিত। শরীরের কোথাও ছাই তো দূরের

কথা, তিলক-চন্দনের চিহ্নমাত্র ছিল না। যে খাটের ওপর বসেছিলেন তার ওপর একটি সাদা বিছানা—বিছানার উপর তাকিয়া। ঘরের কোথাও হোমকুণ্ড দেখি নি—দেখিনি বল্কল বা বাঘছাল। গাঁজার কলকের তো কোন অস্তিত্বই ছিল না সেই ঘরে। তাঁকে দেখে আমার মনে প্রথম ভাব জেগেছিল—এ কেমন সাধু—এ কার কাছে এলাম? মাথাটি কিন্তু আপনা থেকেই সেই দিব্য পুরুষের চরণের উপর নেমে এসেছিল। মেঝের একধারে বিছানো ছিল একটি মাত্বর। স্নেহমধুর কণ্ঠে তার উপর বসতে বললেন। দু'একজন ভক্ত এলেন। দেখলাম তাঁরা আসতেই পরমহংসদেবের মুখ থেকে অনর্গল বেরুতে থাকে কথা নয়—কথামৃত। তারই দু' একটা, যা আমার মনের মধ্যে আজো গাঁথা আছে—তোমাদের বলছি শোনো:

'আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।'

'ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। আদ্যাশক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না। যেমন জলকে বাদ দিয়ে তরঙ্গ হয় না।'

'তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার আর জ্ঞানীদের জন্য নিরাকার। সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করলেই ঈশ্বরের স্বরূপ জানা যায়।'

'দয়া থেকে ঈশ্বরলাভ হয়। শুকদেব নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন। তেমনি সরল না হলে ঈশ্বরে চট্ করে বিশ্বাস হয় না।'

এমনি কত উপদেশ তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনেছি—কত আর বলব? বেদ-বেদান্ত-গীতা সবই তিনি উগরে দিতেন। এই বলে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নিস্তব্ধ হলেন। চোখ দুটি বোঁজা। দেহ নিষ্পাপ। ব্রহ্মচারীরা যেন তাঁরই মধ্যে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আভাস পেয়ে

ধন্য হলেন। একটু পরে, চোখ খুলে তাকিয়ে তিনি বলেন—আমার জগৎ এখন রামকৃষ্ণময়; যেখানে দৃষ্টি পড়ে শুধু তাঁকেই দেখি। অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তোমরা তাঁর চরণে আশ্রয় পেয়েছ—এ তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফল জানবে। এই যে সঙ্ঘ দেখছ—এর মধ্যে তিনিই রূপায়িত হয়ে নিত্য বিরাজ করছেন। এ আমার কথা নয়—স্বয়ং স্বামীজি এই কথা আমাদের বলতেন।

—আচ্ছা ঠাকুর নাকি গান গাইতেন? জিজ্ঞাসা করে এক তরুণ ব্রহ্মচারী।

—সেই দেবকণ্ঠে তিনি যখন গান গাইতেন তখন আকাশ-বাতাস চরাচর সব স্পন্দিত হয়ে উঠতো। একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরটিতে আমরা কয়জন ভক্ত বসে আছি। সেদিন স্বামীজিও উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে মার নামকীর্তন করেছিলেন:

সদানন্দময়ী কালী (মহাকালের মনমোহিনী)
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ মা আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালি
ব্রহ্মাণ্ড ছিলনা যখন (তুই) মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।
সবে মাত্র তুমি মা যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি
যেমন করাও তেমনি করি মা যেমন বলাও তেমনি বলি।

গাইতে গাইতে তাঁর মহাভাবের অবস্থা হয়েছিল। গায়ের জামা ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। মনপ্রাণ-পবিত্র-করা সেই দৃশ্য যেন আজো আমার চোখের সামনে ভাসছে।

শেষ বয়স পর্যন্ত অদ্বৈতানন্দের স্বাস্থ্য ভালই ছিল, কারণ তিনি ব্যায়ামাদি করতেন। আশী বছর বয়সেও তাঁর মেরুদণ্ড এতটুকু বাঁকেনি। সেইজন্য সেই বয়সেও তাঁকে কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় নি। সহজে তিনি কারো সেবা বড় একটা নিতে চাইতেন না। স্বাবলম্বী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নিজের সব কাজ নিজেই করতেন। ভক্তদের বলতেন: যতক্ষণ একেবারে অপারগ না হচ্ছি

ততক্ষণ নিজের কাজ নিজে করাই ভালো। আমার তাতেই আনন্দ। কিন্তু শরীরের ধর্ম তার আপন কাজ নিঃশব্দে করে চলে। শেষের দিকে জরাজীর্ণ শরীরটাকে তিনি যেন আর বহন করতে পারতেন না। মহাপ্রয়াণের কিছুপূর্বে পেটের অসুখ হয়। সেই অসুখে ভুগে সেই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ যেন দিন দিন জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হতে থাকে। তখন একদিন তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে স্বামী অদ্বৈতানন্দ নিবেদন করলেন: 'ঠাকুর মুক্তি দাও।'

তাঁর সেই আকাংখিত মুক্তি এলো ১৯০৯, ২৮ ডিসেম্বর। ঐদিন অপরাহ্ণ বেলায় বেলুড় মঠে তাঁর দেহত্যাগ হয়। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী, স্বামী প্রেমানন্দ তাঁর গুরুভ্রাতার মহাপ্রয়াণ সম্পর্কে একটি চিঠিতে লিখেছেন: '২৮শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় গোপালদাদা স্বধামে গমন করেছেন। সামান্য জ্বর হয়েছিল মাত্র। কেউ বুঝতে পারেননি যে, এত শীঘ্র তিনি দেহরক্ষা করবেন। শেষ সময়ের মুখকান্তি অতিসুন্দর! শ্রীশ্রীপ্রভুর ভক্তের লীলাই এক আশ্চর্য। সে সময়ে মতি ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। লেবু-দুধ খেলেন। মতিবাবুকে নমস্কার করে হাসতে হাসতে দেহত্যাগ করলেন।'

তাঁর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহে লীন হয়েছিলেন প্রথমে স্বামী যোগানন্দ এবং তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দ। এখন মহাপ্রয়াণ করলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের গোপাল মুরুব্বী। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকেই পেছনে রেখে গিয়েছিলেন পরবর্তী সন্ন্যাসী সঙ্ঘের জন্য সেই আদর্শ জীবন যার অনুকরণ সম্ভব নয়। জানি—সন্ন্যাসীর জীবনও নাই, মৃত্যুও নাই; দেশ, কাল ও নিমিত্তের পরপারে তাঁর বাস। জীবনকে এঁরা অর্ঘ্যরূপেই অর্পণ করে ইষ্টপূজা করে গিয়েছেন। একই গুরুর শিষ্য হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-সন্তানগণ প্রত্যেকেই ছিলেন 'প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাং।' সেই দীপের আলো চির অনির্বাণ।

স্বামী তুরীয়ানন্দ

'হরিভাই যেন মূর্তিমান তিতিক্ষা, ত্যাগ ও তপস্যা।' বলতেন বিবেকানন্দ।

'এমন মহাপুরুষ দুর্লভ।' বলতেন ব্রহ্মানন্দ।

বিশাল রামকৃষ্ণসঙ্ঘে যিনি হরি মহারাজ বা স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে পরিচিত, তাঁর সম্পর্কে এই উক্তি দুটি আদৌ অত্যুক্তি নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সন্তানটির চরিত্র ছিল নানা দুর্লভগুণে বিভূষিত। তাঁর ইষ্টদেবতার জীবনের শেষ ছয়টি বৎসর নিরন্তর তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল স্বামী তুরীয়ানন্দের। তাঁর বৈরাগ্য, মানবিক সহৃদয়তা, ভক্তি ভাব, সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এই সন্ন্যাসীকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। ধ্যান ছিল তাঁর জীবনের সঙ্গী আর ঈশ্বর-নির্ভরতা ছিল অবিচল। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভগবান। একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন জীবনে তাঁর অন্য কোন আকাংখা ছিল না। এই ভাব নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। পাণ্ডিত্য ছিল কিন্তু পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র গর্ব ছিল না। দেহ ছিল কিন্তু দেহবুদ্ধি ছিল না।

কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৬৩ সালের ৩ জনুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। পিতা —চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; মা—প্রসন্নময়ী। বাগবাজারে বোসপাড়াতে বাস করতেন চন্দ্রনাথ। স্বধর্মপরায়ণ এই ব্রাহ্মণ যেমন তেজস্বী তেমনি স্পষ্টবাদী ছিলেন। কলকাতার এক ইংরেজ সওদাগরি অফিসের গুদাম সরকার ছিলেন তিনি।

চন্দ্রনাথের তিন ছেলে—মহেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও হরিনাথ এবং তিনটি মেয়ে। মেয়ে তিনটির মধ্যে দুটি খুব অল্প বয়সেই মারা যায়। হরিনাথ তাঁর পিতামাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। এই হরিনাথই পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী-সন্তান স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

শৈশব অবস্থাতেই হরিনাথের মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। হরিনাথের বয়স যখন মাত্র বারো বছর। এই সময়ে তিনি তাঁর পিতাকেও হারালেন। সত্তর বছর বয়স্ক চন্দ্রনাথকে যখন গঙ্গাযাত্রা করানো হয়, তখন তাই দেখে বালক হরিনাথের সে কি কান্না। তাঁর দিদি বাবাকে বলেন, বাবা, হরি যে কাঁদছে, ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন। মৃত্যুপথযাত্রী ব্রাহ্মণ পরলোকের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলেছিলেন: হরি জগতের, জগৎ হরির—ওকে আর কি বলব? পিতার মৃত্যুকালে হরিনাথ কম্বুলিয়াটোলা বাংলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি সম্পর্কে অন্তিম পথযাত্রী পিতার এই শেষ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। লেখাপড়ায় তাঁর খুবই মনোযোগ ছিল—তবে তাঁর প্রবণতা ছিল ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের দিকে। শরীরচর্চার দিকেও তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। সেইসঙ্গে ছিল ব্রহ্মচর্যপালন।

শরীরচর্চার সঙ্গে সেই বয়সেই চলতো তাঁর ধর্মচর্চা। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক জীবনীকার লিখেছেন: 'ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও বাল ব্রহ্মচারী হরিনাথ গায়ত্রীজপ ও সন্ধ্যারাধনা তো নিয়মিত করিতেনই, তদুপরি প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাস্নান, স্বপাক হবিষ্যান্ন-ভোজন ও কঠিন শয্যায় শয়নাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রপাঠাদিও যথেষ্ট ছিল। বেদান্ত বিচারে তিনি অল্পবয়সেই পারদর্শী হইয়াছিলেন।'[১] বাংলা স্কুলের পড়া শেষ হলে হরিনাথকে

১. ভক্তমালিকা: স্বামী গম্ভীরানন্দ।

তাঁর অগ্রজ জেনারেল এসেমব্লি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। মিশনারিদের স্কুল। এখানে বাইবেল পড়ানো হতো। হরিনাথ নিজের হাতে বাড়িতে নারায়ণ পূজা শেষ করে এসে গভীর শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে বাইবেল পাঠ শুনতেন। পিতার মৃত্যুর সময়ে হরিনাথের বয়স ছিল বারো বছর—মৃত্যু জিনিসটা কি, সেটা তিনি জেনেছিলেন তখন এবং তখনই সকলের অলক্ষ্যে বালকের অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়ে থাকবে। কিছুকাল বাদে যখন কলেরায় আক্রান্ত তাঁর এক খুড়তুতো ভাই অল্পবয়সেই মারা যায় তখন হরিনাথের অন্তরের বৈরাগ্যভাবটা প্রবল হয়ে উঠেছিল। 'হরিনাথ দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন—মানুষের জীবন কত ক্ষণভঙ্গুর, আর মৃত্যুর সম্মুখে মানুষের সর্বপ্রকার চেষ্টা, সর্বপ্রকার স্নেহের আকর্ষণ কত অকিঞ্চিৎকর!' তখন থেকেই তিনি সকাল-সন্ধ্যা খুব বেশি করে 'বিবেক চূড়ামণি' পড়তে থাকেন।

তাঁর মনের মধ্যে যখন বৈরাগ্য তীব্র হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময়ে কলকাতার চিৎপুরে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে এক সাধুর আবির্ভাব ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী-সন্তান স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর মহারাজ) ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দের বাল্যবন্ধু। গঙ্গাধরের কাছেই হরিনাথ এই সাধুটির কথা শুনেছিলেন এবং তাঁরই সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন সর্বমঙ্গলার মন্দিরে তিনি যাওয়া-আসা করতে থাকেন। এই সাধুটি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন—যাকে যা বলতেন তা অব্যর্থ ফলত। হরিনাথ এসে চুপটি করে বসে থাকতেন, অন্যান্য দর্শনার্থীদের মতো সাধুর কাছে তিনি কিছুই প্রার্থনা করতেন না। সাধুটি এটা লক্ষ্য করে খুব আশ্চর্যবোধ করতেন।

—তুমি রোজ এখানে আস যাও, কিছু তো চাও না?

—চাইবার জিনিস আমার একটিমাত্র আছে, যদি অভয় দেন তো বলি।

—তোমার কি চাই, বলো?

—সাধন-ভজন আর ভগবানলাভ।

—বেশ, বেশ! তোমার হবে।

—কবে?

—একটু দেরী আছে। এখন সংসারে থেকে সাধন-ভজন কর।

হরিনাথ আশ্বস্ত হয়ে গৃহে ফিরে এলেন। বাক্‌সিদ্ধ সাধুর কথা নিশ্চয়ই ফলবে, এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি সেদিন বাড়ি এসেছিলেন, আমরা এখন অনুমান করতে পারি। দিন যায়। কিশোরের মনে ধর্মপিপাসা প্রবল হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময়ে (১৮৭৭) একদিন বাগবাজার পল্লীতে দীননাথ বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন ঘটে। দীননাথ তাঁর গৃহীভক্তদের মধ্যে অন্যতম। ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ঠাকুরের তখন সবে পরিচয় হয়েছে। খবর পেয়ে বন্ধু গঙ্গাধরের সঙ্গে হরিনাথ এলেন রামকৃষ্ণ দর্শনে। পরবর্তী ঘটনা স্বামী তুরীয়ানন্দ নিজে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: 'দেখলাম একখানা ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি থেকে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি[1] আর একজন অচৈতন্য ও অত্যন্ত কৃশ ব্যক্তিকে নামাচ্ছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখকান্তি ও অঙ্গের ভাব যেন শাস্ত্রবর্ণিত শুকদেবের ন্যায়। ধরাধরি করে তাঁকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছুক্ষণ পরে তিনি জ্ঞান ফিরে পান। তখন প্রথমে তিনি গান গাইলেন এবং পরে অনেক পরমার্থ প্রসঙ্গ করলেন। সকলেই হৃষ্টমনে সেই সব মধুর কথা শুনলেন।'

১৮৮০।

হরিনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসা শুরু করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ছুটির দিন ভিন্ন অন্যদিনে যেতে বলে দেন; কারণ ছুটির দিনে অনেক ভক্তের সমাগম হয় তাঁর কাছে।

১. শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়।

ঠাকুর জেনে নিয়েছিলেন যে বাগবাজারের এই ছেলেটি জ্ঞানমার্গের পথিক, আর তার সবচেয়ে প্রিয় বই 'রামগীতা'। তিনি কেমন করে হরিনাথকে শুষ্ক জ্ঞানের পথ থেকে সরস ভক্তির পথে নিয়ে এসেছিলেন তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন স্বামী সারদানন্দ :

'আমাদের জনৈক বন্ধু হরিনাথ এক সময়ে বেদান্তচর্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্তমান এবং উহার আকুমার ব্রহ্মচর্য, ভক্তি নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য উহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদান্তচর্চা ও ধ্যান ভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া হরিনাথ পূর্বে পূর্বে যেমন ঘন ঘন ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন, সেরূপ কিছুদিন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বিষয় অলক্ষিত থাকে নাই। বন্ধুটির সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে তুই যে একলা, সে আসে নি? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, সে মশায় আজকাল খুব বেদান্তচর্চায় মন দিয়েছে। রাতদিন পাঠ, বিচার তর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময় নষ্ট হবে বলে আসে নি। ঠাকুর শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না।

'উহার কিছুদিন পরেই আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, কিগো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার করছ? তা বেশ বেশ! তা বিচার তো খালি এই গো ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, না আর কিছু? বন্ধু—আজ্ঞা হাঁ, আর কি? বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, ঐ কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথা বুঝা হইল।...কথাগুলি ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া পঞ্চবটিতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন। ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তখন হইতে গ্রন্থপাঠাদি অপেক্ষা

সাধনভজনেই অধিক মনোনিবেশ করিবেন এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার দিকে ফিরিলেন।'[১]

আর একদিনের আর একটি ঘটনা 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে : পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাগবাজার-অঞ্চলের ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া অনেকে উপস্থিত হইলেন। আমাদের পূর্বোক্ত বন্ধুর আবাস অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় পাড়ার পরিচিত জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। বলরামবাবুর বাটীর দ্বিতলের প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বন্ধু ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্যে কুশল প্রশ্নমাত্র করিয়াই উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইবার নহে।...কি জান, কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা! তাঁর দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি! সে শক্তি দিয়ে সে কতটুকু ধারণা করতে পারে? এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল।'[২]

হরিনাথ বিস্মিত, স্তম্ভিত। তারপর তিনি যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন তা আরো চমৎকার। দেখলেন অল্পক্ষণ বাদে অর্ধবাহ্যদশা পেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সেই দেবকণ্ঠে গান ধরলেন। উপস্থিত

---

১. লীলা প্রসঙ্গ (৩য় ভাগ)

২. তদেব।

সকলেই উৎকর্ণ হয়ে সেই গান শুনতে থাকেন। গান গাইতে গাইতে দর-বিগলিত ধারায় হতে থাকে অশ্রুবিসর্জন। হরিনাথও কেঁদে আকুল হন। আজ তাঁর মনে হলো বুঝি তাঁর মনের ভুল ধারণা দূর করবার জন্যই সকলের সামনে ঠাকুর এইপ্রসঙ্গটি তুলেছেন তাঁকে উপলক্ষ করেই। পরবর্তীকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ এই ঘটনাটির কথা উল্লেখ করে বলতেন: 'সে শিক্ষা চিরকাল আমার অন্তরে অঙ্কিত হয়ে আছে। সেদিন থেকেই বুঝেছিলাম, ভগবানের দয়া ছাড়া কিছুই হবার নয়।'

আর একদিন। হরিনাথ এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সরল মনেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন: এখানে যখন আসি তখন বেশ উদ্দীপনা পাই; কিন্তু কলকাতায় ফিরে গেলে সে ভাব আর থাকে না কেন?

—তা কি করে হতে পারে? তুই হরির দাস; তোর পক্ষে ভগবানকে ভুলে থাকা কঠিন। তুই জানিস আর নাই জানিস, তুই হরির সেবক, হরির ভক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথায় স্নেহ যেন উথলে পড়ে। শিষ্যের মনে তিনি এইভাবেই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হওয়ার অল্প পরে হরিনাথের মনে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করেন এবং আসাম পর্যন্ত ঘুরে আসেন। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি বরাহনগর মঠে যোগদান করেন। এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে অভিহিত হন। শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়।

শুরু হয় নবীন সন্ন্যাসীর জীবনে পরিব্রাজকের জীবন। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৮—এই দীর্ঘকাল স্বামী তুরীয়ানন্দকে আমরা ভারতের তীর্থস্থানগুলি পরিক্রমা করতে দেখি।

পরিব্রাজক ও সাধকরূপে স্বামী তুরীয়ানন্দকে আমরা কখনো দেখতে পাই স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে হৃষীকেশ-গঙ্গোত্রী প্রভৃতি

তীর্থে। কখনো বা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ; কখনো বা স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে বৃন্দাবনে। এখানে দুজনে দীর্ঘকাল তপস্যায় কাটিয়েছিলেন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন : 'হরি মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সমধিক-শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। সুতরাং তাঁহাকে ভিক্ষার্থে যাইতে না দিয়া স্বয়ং দ্বারে দ্বারে খণ্ড খণ্ড রুটির সন্ধানে ঘুরিতেন। এই কঠিন শ্রমের ফলে কোন দিন উদরপূর্তি হইত। কোনদিন বা হইত না। একদিন কূপের পার্শ্বে দুইজনে বসিয়া জলে ভিজাইয়া শুষ্ক রুটি খাইতেছেন, এমন সময়ে হরি মহারাজ সকাতরে বলিলেন, মহারাজ, আপনাকে ঠাকুর কত স্নেহ যত্ন করতেন এবং ক্ষীর সর ননী খাওয়াতেন ; আর আজ আমি শুকনো রুটি খাওয়াচ্ছি—ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গেল।'[১] এই ভ্রাতৃভাবের কি কোন তুলনা আছে ? যে কোন চিত্রকরের হস্তের নিম্ন তুলিকাপাতে অঙ্কিত হবার যোগ্য এই দৃশ্যটি।

১৮৯৭। ফেব্রুয়ারি মাস। পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তের বাণী প্রচার করে, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন সিংহল হয়ে। স্বামীজি কলকাতায় এসে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের পত্তন করলেন, ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই সময়ে বেলুড়ের জলবায়ু সহ্য না হওয়াতে হরিমহারাজ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ গুরুভাইকে নিয়ে স্বামীজি গেলেন আলমোড়াতে। অক্টোবর পর্যন্ত তাঁরা এখানে অবস্থান করেন ; তারপর বেলুড়ে ফিরে আসেন। স্বামীজি দৃঢ়ভিত্তির ওপর মিশন স্থাপন করতে চেয়েছিলেন ; আমেরিকা থেকে যে অর্থ তিনি নিয়ে এসেছিলেন তা মঠের জমি কিনতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। মঠের বাড়ি তৈরি করতে টাকার দরকার। তখন স্বামীজি প্রচার কার্য ও অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁর

১. ভক্তমালিকা (প্রথম ভাগ) : গম্ভীরানন্দ।

কয়েকজন শিষ্যকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠালেন। গুজরাটে পাঠালেন স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে একই উদ্দেশ্যে।

এই সময়ে স্বামীজি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন; চিকিৎসকগণ তাঁকে পরামর্শ দিলেন সমুদ্রযাত্রার জন্য। তখনই ভারত ত্যাগের ইচ্ছা তাঁর ছিলনা, কিন্তু গুরুভাইদের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি সম্মত হলেন একটি শর্তে—তাঁর সঙ্গে যাবেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। তুরীয়ানন্দ প্রথমে রাজী ছিলেন না, কিন্তু স্বামীজি যখন তাঁকে বললেন, হরি-ভাই, দেখতে পাচ্ছ না, ঠাকুরের কাজে আমি বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি আমার এই কাজে সাহায্য করবে না?—তখন তুরীয়ানন্দ আর 'না' বলতে পারলেন না। ১৮৯৯, ২০ জুন তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতা ও গুরুভ্রাতা তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতা-বন্দরে জাহাজে উঠলেন। যাত্রার পূর্বে তাঁরা তিনজনেই সংঘজননী সারদাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়েছিলেন।

তাঁরা লণ্ডন হয়ে অতলান্তিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করে ২৬ আগষ্ট নিউ ইয়র্কে এসে উপনীত হলেন। স্বামী অভেদানন্দ তখন এখানে প্রচার কার্যে রত ছিলেন। দুই গুরু ভ্রাতার আগমনে তিনিও খুব আনন্দিত বোধ করলেন, কিন্তু স্বামীজির স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে যারপরনাই উদ্বিগ্ন হলেন। তাই সকল রকম কাজ থেকে বিরত থেকে তিনি যাতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন সেইজন্য দুজনেই—তুরীয়ানন্দ ও অভেদানন্দ বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন। স্বামীজির পূর্বতন বন্ধু মিঃ লেগেট তাঁদের অভ্যর্থনা করে তাঁর দেশের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। স্বামীজি সম্মত হলেন। অতঃপর গুরুভ্রাতাকে তিনি বললেন, 'হরি ভাই, জীবন দেখাও। আর ভারতকে ভুলে যাও।' স্বীয় গুরুভ্রাতার এই নির্দেশ তিনি আন্তরিকতার সঙ্গেই পালন করে, আমেরিকাতে বেদান্ত-প্রচারের এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁর ত্যাগ-বিশুদ্ধ সন্ন্যাস-

জীবনের কঠোরতা দেখে আর তাঁর মুখে শাস্ত্রালোচনা শুনে, আমেরিকার নর-নারী স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। সণ্ট স্কোয়ারে নবাগত সন্ন্যাসীর সকাশে দলে দলে ধর্মান্বেষীরা আসতে থাকেন। শনি ও রবিবার, সপ্তাহে এই দুটি দিন তিনি নিউ ইয়র্কের কাজে স্বামী অভেদানন্দকে সাহায্য করতেন। তারপর অভেদানন্দ যখন বেদান্ত প্রচার কার্যে অন্যত্র চলে গেলেন, তখন তুরীয়ানন্দকে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো। প্রথমবার আমেরিকা এসে স্বামীজি এই সমিতি স্থাপন করেছিলেন এবং পরে অভেদানন্দ এসে এর উন্নতি সাধন করেন।

'নিউইয়র্কের বেদান্তানুরাগীরা তাঁর নাম যশ পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, অধুনা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠতররূপে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বেদান্ত সমিতির বৈঠকখানার পার্শ্বে একটি অন্ধকার গৃহে তিনি প্রায়ই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন—শুধু নির্দিষ্ট সময়ে সমাগত ব্যক্তিদের সহিত সদালাপ করিতে নির্গত হইতেন। তখন তাঁহার হাস্যময় মুখ, সৌজন্য ও বক্তব্য বিষয় বুঝাইবার আগ্রহ আগন্তুককে মুগ্ধ করিত। অন্তররাজ্যে মগ্ন থাকা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইলেও জিজ্ঞাসুর অনুসন্ধিৎসা মিটাইতে তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সময়ের কথা ভুলিয়া অনেক ক্ষেত্রে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রসঙ্গ চালাইতেন।' স্বামী তুরীয়ানন্দ বক্তা ছিলেন না—বক্তৃতা তিনি আমেরিকাতে খুব কমই দিতেন ; তাঁর প্রচারের প্রণালী ছিল ব্যক্তিগত সৎপ্রসঙ্গ, শাস্ত্র আলোচনা এবং ধ্যানের পদ্ধতি শেখানো। সপ্তাহে একদিন গীতা ব্যাখ্যা করতেন। তিনি বলতেন, জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য বক্তৃতা শ্রেষ্ঠ উপায়, কিন্তু লোকের অন্তর জয় করা যায় ঘনিষ্ঠ মেলামেশা দ্বারা। এইখানে উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষ থেকে যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজি তাঁর প্রিয় হরিভাইকে বলেছিলেন : 'আমি পাশ্চাত্য জগৎকে ক্ষত্রবীর্য দেখিয়েছি,

বক্তৃতায় তাদের চমৎকৃত করেছি ; এবার তুমি দেখাবে খাঁটি সন্ন্যাসীর চিত্র, ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা আর ধ্যানপরায়ণতা।' নেতার এই কথা হরিমহারাজের সর্বক্ষণ মনে থাকত। তিনি ঠিক সেইভাবেই প্রচার ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। বস্তুতঃ ওদেশের বেদান্তানুরাগীদের জীবনগঠনের জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দের মতো একজন তপস্বী ও বৈরাগ্যবান প্রচারকের সেদিন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রচার কার্যে তাঁর অগ্নিময় উদ্দীপনা এবং শান্ত সমাহিতভাব দেখে স্বয়ং স্বামী অভেদানন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আমেরিকাতে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রধান কর্মকীর্তি 'শান্তি আশ্রম'। এর ইতিহাসটা এই রকম। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় এসে স্বামী বিবেকানন্দ আগের মতো উদ্যম সহকারে কাজ করতে না পারলেও একেবারে নীরব ছিলেন না। এবার তিনি আমেরিকার পশ্চিমকূলের লস এঞ্জেলস, ওকল্যাণ্ড্ স্যান ফ্রান্সিসকো প্রভৃতি স্থানে প্রায় ছয়মাস কাল প্রচারকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং এর ফলে কালিফোর্ণিয়া-অঞ্চলে বেদান্তের বীজ রোপিত হয়ে উত্তরকালে একটি মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক শহর জায়গা; স্বভাবতই এখানকার বেদান্ত সোসাইটির ছাত্র-ছাত্রীদের ধ্যান-ধারণার জন্য একটি নির্জন পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। সোসাইটির অন্যতম ছাত্রী কুমারী মিনি বুক একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য উত্তর কালিয়োর্নিয়াতে আণ্টোন উপত্যকায় স্বামীজিকে ১৬০ একর নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। রেল স্টেশন থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী এই রমণীয় নির্জন পরিবেশ স্বামীজিকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'শান্তি আশ্রম' তিনি মনে করলেন স্থানটি ধ্যান-ধারণার খুব উপযোগী হবে। তিনি কুমারী বুকের এই দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বক্তৃতার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য আশ্রম তিনি গড়ে তুলতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল, স্বামী তুরীয়ানন্দ এই কাজের যোগ্য ব্যক্তি।

শান্তি আশ্রমের পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, স্বামী বিবেকানন্দের নির্বাচন অভ্রান্ত ছিল। কালিফোর্ণিয়াতে স্বামী তুরীয়ানন্দ বেদান্তের পতাকা উড্ডীন করতে তাঁর পরিচালনায় সক্ষম হয়েছিলেন। এই আশ্রমের একটি সুন্দর চিত্র আমাদের দিয়েছেন তাঁর এক জীবনীকার। তিনি লিখেছেন: 'আশ্রমের সকল কাজে স্বামী তুরীয়ানন্দ উৎসাহ দিতেন ও যোগদান করিতেন এবং কেহ বাধা দিলে বলিতেন, আমি নিজে না করলে ওরা শিখবে কিরূপে?...... তাঁর অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় শান্তি আশ্রমের সকলে তপস্যা ও অধ্যয়নাদিতে মগ্ন হইলেন। প্রত্যুষে স্নানান্তে শীতকালে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া গৃহমধ্যে কিংবা গ্রীষ্মকালে বৃক্ষতলে ধ্যান চলিত। ধ্যানের পুর্বে সংস্কৃতপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। এক ঘণ্টা ধ্যানের পর সকলে গৃহকার্য ও রন্ধনাদিতে ব্যাপৃত হইতেন। আটটায় প্রাতরাশের পর পুনর্বার কার্য আরম্ভ হইত এবং ১০টা ১১টায় রাজযোগ বা গীতাদি পাঠেব পর পুনর্বার এক ঘণ্টা ধ্যান চলিত। বেলা একটায় মধ্যাহ্ন-ভোজন ও সন্ধ্যা সাতটায় সান্ধ্যভোজন হইত। তৎপরে সান্ধ্যধ্যান। মাতৃভাবে মাতোয়ারা হরি মহারাজ সর্বাবস্থায় সকলকে মায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায় দু'বছর শান্তি আশ্রম পরিচালনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এজন্য তাঁকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এর ফলে তাঁর শরীর ও স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে পড়ল। চিকিৎসকের পরামর্শে স্থির হলো যে, তিনি ভারতে ফিরে যাবেন। এই সময়ে প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য তিনি খুব অস্থির হয়েছিলেন। ভারতে ফিরবার জন্য অনুমতি চেয়ে তিনি স্বামীজিকে একটি চিঠি লিখলেন। যথাসময়ে পত্রযোগে অনুমতি এলো। ১৯০২, ৩ জুন তিনি স্যানফ্রান্সিসকো বন্দরে জাহাজে উঠলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ মোট দু'বছর নয় মাস আমেরিকায় প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রেঙ্গুনে এসে সংবাদপত্রে

তাঁর মৃত্যুসংবাদে হরি মহারাজ শোকে স্তম্ভিত ও মর্মাহত হয়ে গেলেন। বিবেকানন্দহীন বেলুড় মঠে তাঁর মন ফিরতে চাইছিল না। তাঁর ভবিষ্যতে জীবন সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা শূন্যে মিলিয়ে গেল। উদ্যম-উৎসাহ সব যেন একেবারে স্তিমিত হয়ে গেল; এমন কি জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনেও তাঁর কোন আগ্রহ রইল না।

১৪ জুলাই—স্বামীজির মহাপ্রয়াণের দশদিন বাদে, জাহাজ এসে ভিড়ল কলকাতার বন্দরে। আমেরিকা-প্রত্যাগত গুরুভাইকে স্বাগত জানাতে জাহাজঘাটায় উপস্থিত ছিলেন স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ কয়েকজন গুরুভাই। সারদানন্দকে দেখে তুরীয়ানন্দ নিজেকে আর সংযত করতে পারলেন না; দুই হাতে তাঁর গলাটি জড়িয়ে ধরে বললেন: শরৎ, নরেনকে আর দেখতে পেলাম না। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানদের মধ্যে এই যে একটি সহজ ভ্রাতৃভাব, এই যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা—এ আলোচনার বিষয় নয়, একান্তই অনুভবের জিনিস।

আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বামী তুরীয়ানন্দ অল্পকালই মঠে অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। প্রায় তিন বছর ওদেশে কর্মময় জীবন অতিবাহিত করলেও তাঁর অন্তরের সেই ভাব-নিরবচ্ছিন্ন তপস্যার আকাংখা—সমানভাবেই বিদ্যমান ছিল। জন্মতপস্বী স্বামী তুরীয়ানন্দ আবার পূর্বেকার কঠোর তপশ্চর্যার জীবনে ফিরে যাবেন, এমন অনুমান তাঁর গুরুভাইদের অনেকেই করেছিলেন সেদিন যখন তিনি বৃন্দাবন যাত্রার কথা ঘোষণা করেন। স্বাস্থ্যের কারণেই তিনি দেশে ফিরেছেন। কিন্তু আবার তীর্থভ্রমণে বহির্গত হবেন তিনি—এই সংবাদে বিচলিত হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাই হরি মহারাজের তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি একজন সেবককে—ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল (পরবর্তীকালে স্বামী ধীরানন্দ) তাঁর সঙ্গে দিলেন। এবার তিনি

একাদিক্রমে তিন বছর বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। সেবক ব্রহ্মচারী খুব অল্পদিনই তাঁর সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বৃন্দাবনে আসার কিছু কাল বাদেই স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁকে বলেন, মাধুকরী করে আমরা খাবার সংগ্রহ করব। তোমাকে রান্নাবান্না করতে হবে না। বৃন্দাবনে তিনি ভাগবতচর্চায় দিনাতিপাত করতেন ও দুজন বৈষ্ণব সাধুকে ভাগবত শিক্ষা দিতেন। সন্ন্যাসজীবনে তাঁর এই আচার্যের ভূমিকাটি সত্যিই অনুধাবনের বিষয়।

বৃন্দাবনে কঠোর তপস্বীর জীবন যাপন করার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাদের অনুরোধে স্বামী তুরীয়ানন্দ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে[১] চলে আসেন। ১৯০৫ সালে তিনি যখন এখানে আসেন তখন একটি মহৎকাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন; সেটি হলো স্বামীজির গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করা ও প্রকাশ করা। স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেবার জন্য এই কাজটি তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই সম্পন্ন করেছিলেন। এই তপস্বী কখনো কর্মহীন জীবন যাপন করতে জানতেন না। এখানেও তিনি মঠের সভ্যদের জন্য শাস্ত্রপাঠের ক্লাস খুলেছিলেন। ১৯০৫ সালের শেষভাগে (নভেম্বর) তিনি উত্তরাখণ্ডে গিয়ে আবার তপস্যায় নিরত হন। প্রথমে কনখল, পরে হৃষীকেশ এবং তারপরে উত্তর-কাশীতে যান।

তপস্যাক্লিষ্ট শীর্ণদেহ এই রামকৃষ্ণ-সন্তান ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছেন। সর্বত্রই তিনি পেতেছিলেন তাঁর তপস্যার আসন। শেষজীবনে তাঁর জিতনিদ্রাবস্থা লাভ হয়েছিল। ১৯১০ সালে হরিমহারাজের শরীরে বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়। উপযুক্ত চিকিৎসায় তিনি সেবারে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করলেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপের দিকে চলতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই

১. হিমালয়ের কোলে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের এই আশ্রমটিতে ঠাকুরের কোন প্রকার পূজা অর্চনা হয় না।

যে, সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপই থাকতনা। ১৯১২ সালের গোড়ার দিকে তিনি কাশীতে ছিলেন। তারপর স্বামী ব্রহ্মানন্দও শিবানন্দের কনখল যাওয়ার সময় তিনিও তাঁদের সঙ্গে সেখানে যান। এই বছরে তিন রামকৃষ্ণ-সন্তান মিলে কনখলে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেছিলেন। চণ্ডীপাঠক ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। সমগ্র চণ্ডী তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল; একঘণ্টায় পড়ে শেষ করতে পারতেন। তাঁর তপস্যাপ্রবণ মন তাঁকে চিরন্তর এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে নিয়ে যেত। তাঁর জীবনব্যাপী তীর্থভ্রমণের আনুপূর্বিক ইতিহাস যেন এক মহাভারতবিশেষ। দেহজ্ঞানহীন এই জীবন্মুক্ত পুরুষ যেন তীর্থগতপ্রাণ ছিলেন। সেইসঙ্গে ছিল তাঁর অপূর্ব অধ্যয়ননিষ্ঠা।

১৯১৯। কাশীতে এলেন হরি মহারাজ। তাঁর জীবনের শেষ সাড়ে তিনটি বছর বিশ্বনাথের চরণপ্রান্তেই অতিবাহিত হয়েছিল। তখন তাঁর পূর্ণ জ্ঞানীর অবস্থা। কাশীর রামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রমের একটি ছোট ঘরে তিনি থাকতেন। ধ্যান, জপ ও পাঠ—সবই ঘড়ির মতো চলতো। তিতিক্ষামূর্তি তপস্বী কারো সেবা গ্রহণ করতেন না। কাশীর শীতেও গায়ে একটিমাত্র কম্বল আর পরিধানে কৌপীন ব্যতীত অন্য কোনরূপ বস্ত্র ব্যবহার করতেন না। তাঁর কাশীবাস কালের প্রধান ঘটনা কাশীতে লাটু মহারাজের মৃত্যু। দীর্ঘ কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল। বহুমূত্র, হাঁপানি প্রভৃতির সঙ্গে দুইবার ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ তাঁকে একপ্রকার শয্যাশায়ী করে দিয়েছিল। শয্যায় শুয়ে শুয়ে বললেন শ্রীমা নেই, রাজা মহারাজ নেই—আমার আর এ দেহে থাকা কেন? শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে গিয়েছিল। এই সময়টা তাঁর শরীরে অসংখ্যবার অস্ত্রোপচার হয়েছিল। অবশেষে আসে চরম মুহূর্ত—তখন আর কোন ঔষধ সেবন নয়—শুধু চরণামৃত পান। এইভাবেই ১৯২২ সালের ২১ জুলাই সন্ধ্যায় বেদান্ত-তপস্বী স্বামী তুরীয়ানন্দ সজ্ঞানে, শান্তমনে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য' এবং 'জয় রামকৃষ্ণ'—এই ছিল তাঁর কণ্ঠে শেষ উচ্চারিত কথা।

স্বামী অখণ্ডানন্দ
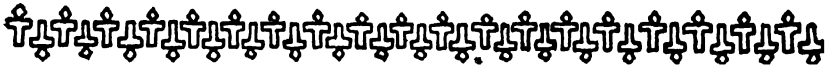
স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে আদর করে ডাকতেন 'Ganges' বলে, তিনিই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গঙ্গাধর মহারাজ বা স্বামী অখণ্ডানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দ তাঁর এই গুরুভ্রাতাটি সম্পর্কে বলতেনঃ 'এমন দেবদুর্লভ সরলতা, এমন হৃদয়বত্তা আর কারো মধ্যে দেখিনি।'

১৮৬৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন গঙ্গাধর ঘটক। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে গভীর ধর্মপ্রবণতা লক্ষ্য করে বাড়ির সকলে বিস্মিত হতো এবং তখন থেকেই আচারে-আচরণে তাঁর মধ্যে অত্যন্ত গোঁড়ামির ভাব পরিলক্ষিত হতো। দিনের মধ্যে তিনি একাধিকবার স্নান করতেন, একাহারী ছিলেন এবং নিজের আহার্য নিজেই রেঁধে নিতেন। প্রতিদিন গীতা ও অন্যান্য শ.স্ত্রগ্রন্থ পাঠ করতেন। ধ্যানের অভ্যাস ছিল নিয়মিত। এই ছিল গঙ্গাধরের জীবনধারা যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে সম্ভবত ১৮৮৩ বা ১৮৮৪ সালে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এখানে তিনি প্রথমবার এসেছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু হরিনাথের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) সঙ্গে। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর।

তখন বিকেল হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরটিতে তক্তপোষের উপর সহাস্য মুখে কয়েকজন ভক্তপরিবৃত হয়ে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরীয়-প্রসঙ্গ হচ্ছিল। বন্ধুর সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একপাশে বসেন গঙ্গাধর। সমস্ত ঘরটার মধ্যে ছড়িয়ে আছে একটা দিব্য আধ্যাত্মিক ভাব। ঠাকুর ভক্তদের বলছেন।

'এ যা বললুম সব বিচারের কথা। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিচার। সব স্বপ্নবৎ বড় কঠিন পথ। এপথে তাঁর লীলা স্বপ্নবৎ, মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আমিটাও উড়ে যায়। এ পথে অবতারও মানে না। বড় কঠিন। এসব বিচারের কথা ভক্তদের বেশী শুনতে নাই। তাই ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে ভক্তির উপদেশ দেন—শরণাগত হতে বলেন। ভক্তি থেকে তাঁর কৃপায় সব হয়—জ্ঞান বিজ্ঞান সব হয়। তিনি লীলা করছেন—তিনি ভক্তের অধীন। কখনো ঈশ্বর চুম্বক হয়, ভক্ত ছুঁচ হয়। আবার কখনো ভক্ত চুম্বক হয়, তিনি ছুঁচ হন। ভক্ত তাঁকে টেনে লয়—তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন।'[১]

গঙ্গাধর অবাক হয়ে শুনছেন। উপস্থিত সকলেই যেন শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেছেন, তাঁর মনে হলো। মনে পড়লো বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাড়িতে প্রথম যেদিন এঁকে দেখেছিলেন তিনি, সেদিনও এঁর মুখে এমনি ধারা জ্ঞানের কথা শুনেছিলেন। অথচ সবাই বলে, ইনি নাকি তেমন লেখাপড়া জানেন না শাস্ত্র গ্রন্থও তেমন কিছু পড়েন নি। তবে এমন উচ্চ জ্ঞানের কথা কেমন করে বলেন? দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। ভক্তরা একে একে ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। হরিনাথ মন্দিরে গেছে ভবতারিনী দেবীর আরতি দেখতে। ঘরের মধ্যে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আর গঙ্গাধর ভিন্ন তৃতীয়জন কেউ নেই। ছেলেটিকে কাছে ডেকে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন—তোর নাম কি?

—গঙ্গাধর ঘটক।

—কোথায় থাকিস?

—কলকাতায়।

—আমাকে এই প্রথম দেখলি, না আগে কখনো দেখেছিস?'

---

১. কথামৃত (৫ম ভাগ)।

—আজ্ঞে বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাড়িতে অনেকদিন আগে একবার আপনাকে দেখেছি।

—আজকের রাতটা এখানে থেকে যা। তুই তো এখানকারই। মায়ের প্রসাদ পাবি। এখন মায়ের আরতি দেখে আয়।

ভবতারিনী দেবীর আরতি তখনো শেষ হয়নি। আরতি শেষ হয়ে গেলে বন্ধুকে সব কথা খুলে বললেন গঙ্গাধর। ঠাকুরের দেখছি অশেষ কৃপা তোমার ওপর, বন্ধুকে বলেন হরিনাথ। তুমি তাহলে রাতটা এখানেই থাকছ ?

—হ্যাঁ ভাই। তুমি বাড়িতে একটু খবর দিও।

পরের দিন। সকালবেলা যখন বিদায় নিয়ে ফিরবেন গঙ্গাধর, তখন রামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, আবার আসিস।

দিন যায়।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতে থাকেন গঙ্গাধর।

এর ফলে গুরুশিষ্যের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে যুবকের মনে জাগিয়ে তুললো ত্যাগের তীব্র স্পৃহা আর মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে সেবা করার আকাঙ্খা। প্রতিবারই যখনই তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখনই ঈশ্বর-প্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে নব নব ভাবের নব নব রূপের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হন আর সেই সঙ্গে তাঁর শ্রীমুখ থেকে অনর্গল ধারায় নিঃসৃত দিব্যজ্ঞানের কথা শুনে তিনি যেন এক নতুন মানুষ হয়ে উঠতে থাকেন। এই আসা-যাওয়ার ফলে অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ঘটতে থাকে। তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের নিঃশব্দ প্রেমের প্রভাব সকলের অলক্ষ্যে এক বিরাট রূপান্তর সাধন করে চলছিল। শুধু তাই নয়। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে এই দেবমানবের কাছ থেকে হাতে-কলমে তিনি অনেক শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকে গঙ্গাধরের অতিরিক্ত গোঁড়ামির ভাব।

একদিন কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর তাঁর এই চিহ্নিত সন্তানটিকে বললেন, 'ভ্যাখ্ এসব গোঁড়ামি ভাব সেকেলে। ঈশ্বর কি অত শুক্‌নো জিনিস? তিনি যে রসের সাগর, আনন্দের মহাসমুদ্র। সব সময়ে তাঁকে সেইভাবে চিন্তা করবি। ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দময়—তিনি কেন অনাহারী-উপোসী হতে যাবেন। খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে এত বাদবিচার করবি কেন? নরেনকে ভ্যাখ্। কী বড়ো বড়ো তার চোখ। দিনের মধ্যে সে একশোটা পান খায় আর যা পায় তাই-ই খায়। কিন্তু কি গভীর অন্তর্মুখীন তার মন। কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া যা কিছু সে দেখতে পায়-দেখে সবই ঈশ্বরে পরিপূর্ণ। যা, একদিন সিমলেতে গিয়ে নরেনকে দেখে আয়।

পরের দিনই গঙ্গাধর এলেন সিমুলিয়াতে দত্তবাড়ি। নরেন্দ্রনাথ তখন গৃহেই ছিলেন। আলাপ হলো। দেখলেন বড়লোকের ছেলে, রীতিমত উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, না আছে কোনো পারিপাট্য তাঁর বেশভূষায় বা মাথার চুলে—বাইরের কোনো কিছুতে তাঁর যে আকর্ষণ আছে তা তাঁর কথাবার্তায় আভাস পাওয়া গেল না। সবই যেন তাঁর আলাদা। সবচেয়ে যে জিনিসটা গঙ্গাধরকে আকৃষ্ট করলো তা হলো নরেন্দ্রনাথের আয়ত চোখ দুটি—সেই চোখের দৃষ্টি তাঁর মনের কোন্ গভীরে চলে গেছে। এই বয়সে যতটুকু শাস্ত্রচর্চা করেছেন গঙ্গাধর তারই আলোকে তাঁর বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, ইনি যেমন তেজস্বী তেমন এক বিরাট স্বত্বগুণের আধার। আবার নরেন্দ্রনাথের মধুর ব্যবহার ও শিষ্টাচারেও তিনি বড়ো কম মুগ্ধ হলেন না। এখন গঙ্গাধর বুঝতে পারলেন কেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কাছে দত্তবাড়ির এই কৃতবিদ্য ছেলেটির প্রশংসায় অমন পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন।

কয়েকদিন বাদে গঙ্গাধর এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁকে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম প্রশ্ন: কি রে, নরেনের ওখানে গিয়েছিলি? কেমন দেখলি তাকে?

—আজ্ঞে দেখলাম যেমন তেজস্বী তেমনি সত্ত্বগুণী।

—ঠিক ধরেছিস তো। একবারের আলাপে ঠিক বুঝেছিস তো

—তোর বুদ্ধিশুদ্ধি তো কম নয় দেখছি।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে গঙ্গাধর মহারাজ বলতেন: 'সিমুলিয়ার দত্তবাড়িতে প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম নরেনের সঙ্গে আলাপ করতে সেদিন প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার বিশাল চোখ দুটি; বিকচপদ্মের মতো মানুষের এমন সুন্দর চোখ হয় আমার সে ধারণা ছিল না। সে তখন একটি বিরাট আয়তনের ইংরেজি বই পড়ছিল নিবিষ্ট চিত্তে। ঘরটি ধূলি-মলিন, কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দেখে মনে হলো তার মন এই পৃথিবী ছাড়িয়ে যেন কোথায় চলে গেছে। তারপর থেকে ঠাকুর আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি যেন প্রায়ই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি। তখন থেকেই তার প্রতি আমার স্থায়ী ভক্তির সূচনা এবং তখন থেকেই সে আমার জীবনের Hero হয়ে ওঠে।'

গঙ্গাধর একেবারে শেষের দিকে এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে যেমন এসেছিলেন কালীপ্রসাদ. কাজেই এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্য-লাভ তাঁর জীবনে বেশিদিন ঘটেনি। তবে অসুস্থ হওয়ার পর ঠাকুর যতদিন এখানে ছিলেন তখন গঙ্গাধর প্রায়ই এখানে আসা-যাওয়া করতেন ও সেই সময়ে রাখাল, তারক প্রভৃতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের মাসাধিক কাল পরেই বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের গোড়াপত্তন হয়। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরের কয়েকজন সন্ন্যাসী সন্তান এখানে অবস্থান করতেন। তাঁর আহ্বানে ক্রমে ক্রমে সকলেই সেই বাড়িতে এসে মিলিত হলেন। একটি জীর্ণ, পরিত্যক্ত দ্বিতল বাড়িতে নবীন সন্ন্যাসীর দল যে দুশ্চর তপস্যা

আরম্ভ করেছিলেন, অধ্যাত্ম জগতের সংঘজীবনের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। প্রসঙ্গান্তরে উল্লিখিত হয়েছে যে, এইখানেই তাঁরা ১৮৮৭ জানুয়ারির শেষভাগে শাস্ত্র সম্মত সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের ইষ্টদেবতার পাদুকার সম্মুখে। গঙ্গাধর মাঝে মাঝে এখানে আসতেন এবং তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন, বিশেষ করে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে, যাঁকে তিনি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। এই সময়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' নামে অভিহিত হন।

যদিও গঙ্গাধর মহারাজ তখনই বরাহনগর মঠে যোগদান করেন নি, কিন্তু পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করার জন্য তাঁর মনের মধ্যে জেগে ওঠে তীব্র ইচ্ছা। ১৮৮৭, ফেব্রুয়ারি, শুরু হয় তাঁর তীর্থযাত্রা—প্রথমে হিমালয় তীর্থ, পরে তিব্বত। তিনি তিনবার তিব্বত ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং ১৮৯০ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। হিমালয় অঞ্চলের তীর্থস্থানগুলি এবং তিব্বতের মহিমা ও রূপৈশ্বর্য দেখে তিনি এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সেই বিষয়ে গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি প্রায়ই চিঠি লিখতেন। স্বামীজিরও তখন পরিব্রাজক জীবন চলছিল এবং তিনি তখন গাজীপুরে অবস্থান করছিলেন। কিছুকাল বাদে বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করে তিনি গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দকে মঠে আসবার জন্য চিঠি লিখলেন। কয়েকমাস বরাহনগর মঠে গুরুভ্রাতাদের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করে, ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সমভিব্যাহারে হিমালয় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হলেন। এই যাত্রায় তাঁরা কর্ণপ্রয়াগ হয়ে বদ্রীনাথ গিয়েছিলেন। পরে তাঁরা হৃষীকেশ আসেন। ভারতীয় সাধুসন্তদের তপস্যার এই স্থানটি স্বামীজির খুব প্রিয় ছিল। পথিমধ্যে দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন—কখনো স্বামীজি, কখনো অখণ্ডানন্দ। এই সময়ে তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

১৮৯৩ সালের মে মাসে বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন আবুতে এবং সেইখানেই তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে জানতে পারেন যে, তাঁদের নেতার পাশ্চাত্যদেশে গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভারতের অগণিত ক্ষুধার্ত জনসাধারণের জন্য রুটির ব্যবস্থা করা। পরিব্রাজক জীবনে এদের দারিদ্র্য ও দুঃখ দেখে স্বামীজি এতদূর বিচলিত বোধ করেছিলেন যে, তাঁর মনে হয়েছিল এদের পার্থিব অবস্থার উন্নতি সাধন না করে এদের কাছে ধর্মপ্রচার করা অর্থহীন। এই কথাগুলি কিন্তু তখনই গঙ্গাধর মহারাজের মনে দাগ কাটেনি। তারপর যখন তিনি অতড়ির মহারাজা অজিত সিংহের[1] আতিথ্য গ্রহণ করে ছয়মাস এখানে অবস্থান করেন সেই সময়ে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ ও নীচ—সকল প্রকার লোকের সংস্পর্শে এসে তিনি স্বামীজির পাশ্চাত্যদেশ গমনের উদ্দেশ্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। তাঁরও হৃদয়ে জেগে ওঠে একই মহৎ সংকল্প—দরিদ্রনারায়ণদের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন ঠিক করেন। স্বামীজির অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলেন তাঁকে। সেই চিঠির উত্তরে আমেরিকা থেকে তিনি তাঁর এই গুরুভ্রাতাটিকে উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলেন: 'ভাই গঙ্গা, তোমার সংকল্প সিদ্ধ হোক, ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা জানাই।'

স্বামী অখণ্ডানন্দ বুঝেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যাতিরেকে ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। সেই থেকে তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল শিক্ষা। অতড়িতে যে ছয়মাস কাল তিনি অবস্থান করেছিলেন সেই সময়টা তিনি বৃথা যেতে দেননি। মহারাজা ও তিনি এই বিষয়ে আলোচনা

১. ১৮৯১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পরিব্রাজক জীবনের এক পর্যায়ে যখন অতড়িতে এসেছিলেন তখন মহারাজা তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বামীজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

করেন এবং স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা তাঁরই চেষ্টায় ও যত্নে ৮০ থেকে ২৫৭-তে পরিণত হয়েছিল। তারপর তিনি অতড়ির আশেপাশে কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং গ্রামের ছেলেদের পাঁচটি স্কুল স্থাপন করেন। যে রাজ্যে আগে শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন ব্যয় বরাদ্দ ছিল না সেই অতড়িতে মহারাজা স্বামী অখণ্ডানন্দের অনুরোধে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বছরে পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। তারপর উদয়পুর, আলোয়ার প্রভৃতি রাজপুতানার কয়েকটি স্থানে তিনি দরিদ্রদের জন্য কয়েকটি স্কুল স্থাপন করে ১৮৯৫ সালে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। মঠ তখন আলমবাজারে উঠে এসেছে।

১৮৯৭। স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর।

আলমবাজার মঠ থেকে পদব্রজে গঙ্গার উপকূল ধরে তিনি উত্তরের দিকে যাত্রা করেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর থেকে বিশমাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রামে এসে উপনীত হন। দেখলেন গোটা গ্রামটি দুর্ভিক্ষ কবলিত। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম পরিচয়। সেই গ্রামের শত শত অসহায় ও অনশনক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যদানের কথা তিনি চিন্তা করলেন। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে যেসব ভয়াবহ দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল তাতে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের ত্রাণের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তিনি এই স্থান ত্যাগ করবেন না—এই সংকল্প করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সন্ন্যাসী-সন্তান। সমস্ত বিবরণ দিয়ে আলমবাজার মঠে একটি চিঠি পাঠালেন তিনি। এর ঠিক তিন মাস আগে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে এসেছেন এবং তখন তিনি আলমবাজার মঠেই অবস্থান করছিলেন। গুরুভ্রাতার কাছ থেকে মুর্শিদাবাদে ঐ গ্রামগুলিতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পেয়ে তিনি যারপরনাই বিচলিত বোধ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ কিছু টাকাকড়ি সহ দুজন গুরুভ্রাতাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবেই সেদিন—১৮৯৭, ১৫ মে—রামকৃষ্ণ

মিশনের উদ্যোগে বহরমপুরের পাঁচগাঁ ও মাহুলা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ত্রাণের কাজ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল এবং এই ত্রাণকার্য চলেছিল প্রায় এক বছর। ঘটনাটি বিশেষভাবেই স্মরণযোগ্য। স্মরণযোগ্য এই কারণে যে, সাধু-সন্ন্যাসী অধ্যুষিত এই ভারতবর্ষে দুর্গত মানুষদের জন্য সেবা এবং ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করে, রামকৃষ্ণ-নামের পতাকাবাহী সন্ন্যাসী সঙ্ঘ সেদিন একটা বড়ো রকমের আদর্শ দেশবাসীর সামনে স্থাপন করেছিলেন। সমাজসেবার পরবর্তী ইতিহাসে এর প্রভাবটা সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

এই ত্রাণের কাজ করতে গিয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ দুটি অনাথ বালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এর থেকেই একটি অনাথ আশ্রম স্থাপনের 'পরিকল্পনা' তাঁর মনের মধ্যে জেগেছিল। তারপর জিলার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে মাহুলাতে তিনি স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম ১৮৯৮ সালের মে মাসে। পরে এটি সারগাছি গ্রামের একটি ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। তেরো বছর বাদে আশ্রমটি তার নিজস্ব ভবনে উঠে আসে এবং এইজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অর্ধেক পরিমাণ তিনি স্বয়ং ভিক্ষা করে সংগ্রহ করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়া-পত্তন থেকে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এর উন্নতিকল্পে স্বামী অখণ্ডানন্দ নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন—এটি যেন হয়ে উঠেছিল তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তার জিনিস। তাঁর তত্ত্বাবধানে এবং আশ্রমের উদ্যোগে গ্রামের বালক এবং বয়স্কদের শিক্ষার জন্য দুইটি বিদ্যালয়—একটি দিনের বেলায় অপরটি রাত্রিতে—স্থাপন করেন। তাঁর এই মহান উদ্যমের ফলেই গ্রামের শত শত বালক অনাহার, নিরক্ষরতা ও অধঃপতন থেকে রক্ষা পেয়েছিল। স্কুল দুটির সঙ্গে একটি ছোটখাটো দাতব্য চিকিৎসালয়ও তিনি খুলেছিলেন। পরে এটির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ১৯০০ থেকে ১৯১০—এই দশ বছর অনাথ আশ্রমের উদ্যোগে একটি কারিগরী বিদ্যালয়ও তিনি

চালিয়েছিলেন; এখানে তাঁতবোনা, সেলাই, কাঠ ও রেশমের কাজ শিক্ষা দেওয়া হতো। বিদ্যালয়টি গ্রামবাসীদের অনেকের গ্রাসাচ্ছদন সংস্থানের একটি উপায়স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সারগাছির এই কারিগরী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তৈরি দ্রব্যাদি বহরমপুরের একটি শিল্প প্রদর্শনীতে শুধু প্রশংসালাভ করেনি, পর-পর কয়েক বছর ছাত্ররা তাদের হাতের কাজের জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিল। এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিলেন দানবীর মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। স্বামী অখণ্ডানন্দ স্থাপিত অনাথ আশ্রম ও কারিগরী বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্থানাভাববশত এই বিদ্যালয়টি দশ বছর চলবার পর বন্ধ হয়ে যায়।

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে অনাথ আশ্রমের ছেলেদের আধ্যাত্মিক ও ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের দিকটাও অবহেলিত ছিল না। সকাল-সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা ছিল বাধ্যতামূলক এবং রামায়ণ-মহাভারত থেকে নির্বাচিত অংশগুলি নিয়মিতভাবে পাঠ করে ছেলেদের বুঝিয়ে দেওয়া হতো। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই অনাথ আশ্রমে জাতিধর্ম নির্বিশেষে ছেলেদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তাঁর ইষ্টদেব শ্রীরামকৃষ্ণ উদার মানবিকতার আদর্শের অনুসরণে স্বামী অখণ্ডানন্দ সমাজসেবার কাজে অগ্রণী হয়ে একটা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর সকল গুরুভ্রাতাই, বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ, এই প্রয়াসের প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর অনাথ আশ্রমের ছেলেরা পরবর্তীকালে সমাজসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিকটবর্তী বহু গ্রামে কলেরা প্রভৃতি মহামারীর সময় ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করত। নানাদিক দিয়েই সারগাছি রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রমটি ছিল গঙ্গাধর মহারাজের একক ও অনন্য একটি সৃষ্টি।

তাঁর সমাজসেবা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দূর-দূরান্ত বহু স্থানেই তিনি ছুটে যেতেন যখনই কোনরকম ত্রাণকার্যের

প্রয়োজন হতো। যখন ভাগলপুরের ঘোঘা অঞ্চলে প্রচণ্ড বন্যা হলো তখন সেই সংবাদ পেয়ে এই রামকৃষ্ণ-সন্তান সেখানে গিয়ে উপযুক্ত ত্রাণকার্য শুরু করে দিয়েছিলেন এবং পঞ্চাশটি গ্রামে আড়াই মাস ধরে বহুসংখ্যক কলেরা রোগাক্রান্ত রুগীদের তিনি নিজের হাতে সেবা করেছিলেন। প্রাণের মায়া করেন নি। আবার ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের ফলে বিধ্বস্ত মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলা দুটি পরিদর্শন করে, সেই সম্পর্কে বেলুড় মঠে বিবরণ পাঠিয়ে দিয়ে মিশন থেকে যাতে অবিলম্বে ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা হয় সেজন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁরই কথামত ও তাঁরই নেতৃত্বে সেদিন বিহারে রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজসেবার কাজ দেখে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের তখন সত্তর বৎসর; সেই বয়সে তাঁর যৌবনোচিত কর্মতৎপরতা ও উদ্যম বিহারের জনসাধারণের মনে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাব জাগিয়ে তুলেছিল। এই যে তিনি এইভাবে মানবসেবায় এবং দুঃস্থ, আর্ত ও পীড়িতদের সেবায় নিজেকে অমনভাবে উৎসর্গ করেছিলেন এর প্রেরণা স্বামী অখণ্ডানন্দ পেয়েছিলেন তাঁর মহান্ গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তিটির মধ্যে: 'এই দরিদ্র, অজ্ঞ, দুঃস্থ, আর্ত—এরাই তোমাদের ভগবান। জেনে রাখো একমাত্র এদের সেবাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।' স্বামীজির এই বাণী তিনি অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত করেছিলেন।

ভাবলে অবাক হতে হয় একান্ত নীরবে, প্রচারের ঢাক না বাজিয়ে তিনি এইসব কাজ করতেন অক্লান্তভাবে এবং স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে। শারীরিক অবস্থা যখন এইসব শ্রমসাধ্য কাজের অনুকূল ছিল না তখনো তিনি সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রামেই অবস্থান করতেন। ১৯২৫ সালে তিনি ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এবং ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে, স্বামী শিবানন্দের মহাপ্রয়াণের পর, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পর বেলুড় মঠে তাঁর উপস্থিত প্রয়োজন হতো, কিন্তু সারগাছির নির্জন রমনীয় পরিবেশ আর সেখানকার অনাথ বালকদের সঙ্গ তাঁকে বেশি আনন্দ দান করত। বাঁধাধরা কাজের মধ্যে তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠতেন। মঠের এক প্রাচীন সন্ন্যাসী—ঠাকুরের অনেক পার্ষদদের সঙ্গে যাঁর মিশবার সৌভাগ্য হয়েছিল—স্বামী অখণ্ডানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন :

'শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সরলতার পরিচয় মঠে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি যখনই মঠে আসিতেন, সেখানে দুই চারিদিন থাকিবার পরই সারগাছি আশ্রমে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। তিনি মঠে আসিলে শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাঁহাকে লইয়া নানারূপ কৌতুক করিতেন। যখনই সারগাছির জন্য তাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতা দেখিতেন তখনই বলিতেন, কি হবে গঙ্গা, সেখানে গিয়ে? সেখানে তো কয়েকটি বাপ-মা খেদানো ন্যাংটা ছেলেদের নিয়ে আছ। এখানে কত সাধু ব্রহ্মচারী আসছে। তাদের নিয়ে থাকো ও তাদের শিক্ষাদি দাও না কেন? ইহা যে মহারাজের অন্তরের কথা নহে তাহা গঙ্গাধর মহারাজ বুঝিতে পারিতেন না এবং আরো ব্যাকুল হইয়া বলিতেন, না, না, মহারাজ তুমি বুঝছ না, আমি না গেলে ঐসব ছেলেদের খুব কষ্ট হবে। মহারাজও তাঁহার সেই পূর্বকথা পুনরায় আবৃত্তি করিতেন ও গঙ্গাধর মহারাজও ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর হইতেন ও অবশেষে মঠে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে স্বীকৃত হইয়া মহারাজের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন।'[১]

দরিদ্রনারায়ণদের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই রামকৃষ্ণ-সন্তানের জীবনের অন্য দিকও আছে যা তাঁর চরিত্রের অন্য দিককেও উজ্জ্বল করে তুলছে আমাদের কাছে। তাঁর এক জীবনীকার জানিয়েছেন যে, সারা জীবন তিনি ছিলেন একজন পুস্তক-প্রেমী, যাকে বলে

১. পুণ্যস্মৃতি : স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ।

'lover of books' এবং তাঁর সারগাছি আশ্রমের গ্রন্থাগারে তিনি নানা বিষয়ের প্রচুর ইংরেজি ও বাংলা বই সংগ্রহ করেছিলেন। অসাধারণ ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি আর তার সঙ্গে মিলেছিল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি। কথাবার্তায় তিনি সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। মুখে মুখে তিনি যখন তাঁর তিব্বত ভ্রমণের কাহিনী বলে যেতেন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনতো। তিব্বত সম্পর্কে তিনি ছিলেন একজন 'অথরিটি' (Authority) এবং প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎচন্দ্র দাসের বহুপূর্বে তিনি ঐ নিষিদ্ধ দেশে গিয়েছিলেন।[১] তাঁর সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী শোনাতে তিনি কখনো ক্লান্তি বোধ করতেন না। ভাষা শিখবার জন্য তাঁর মধ্যে একটি বিশেষ প্রবণতা পরিলক্ষিত হতো। বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃততে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বেদচর্চায় ছিল তাঁর সমধিক আগ্রহ। রাজপুতানায় অবস্থানকালে তিনি সুকঠিন হিন্দী ব্যাকরণ আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা ভাষায় তিনি একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন এবং যাঁরাই 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত স্বামী অখণ্ডানন্দের 'তিব্বতে তিন বৎসর' প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন তাঁরাই জানেন যে বাংলায় ভ্রমণ সাহিত্যের এটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। তেমনি মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় তাঁর অসমাপ্ত রচনা 'স্মৃতিকথা' সুখপাঠ্য। বাগ্মীতায়ও তিনি কম পারঙ্গম ছিলেন না। তবে জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে তিনি খুব অনিচ্ছুক ছিলেন। কৌতুকপ্রিয়তা ছিল এই সন্ন্যাসীর স্বভাবের আর একটি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য এবং এই ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দের সগোত্র।[২]

---

১. রামকৃষ্ণ সন্তানদের মধ্যে দুজন—স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ তিব্বত গিয়েছিলেন।

২. APOSTLES OF SRI RAMAKRISHNA : Swami Gambhirananda.

'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থের লেখক জানিয়েছেন যে দেশের বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দের বিশেষ যোগ ছিল। তিনি একবার ব্যারাকপুরে গিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলেছিলেন: 'আপনারা এ কিভাবে কংগ্রেস পরিচালনা করছেন? দেশের মঙ্গল চাইলে গ্রামে যেতে হয়। সেখানে হাজার হাজার গ্রামবাসী রয়েছে, যারা আপনাদের কোনো কথাই জানে না। আপনারা এখন শুধু শহরে বসেই কংগ্রেস করছেন। আপনারা গ্রামে গিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন করেন না কেন?' পরবর্তীকালে গান্ধীযুগে 'গাঁও মে কংগ্রেস' যখন হয় তখন এই সন্ন্যাসীর দূরদৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতে হয়। তেমনি একদিন তিনি ভবানীপুরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে (তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) তাঁকে বলে এসেছিলেন: 'আপনি তো এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। আপনি এখানে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন করেন না কেন? এই সংস্কৃতই তো আমাদের জাতির মেরুদণ্ড।'

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এইভাবেই তাঁর সন্ন্যাসী-সন্তানগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রচার করতেন। একথা মিথ্যা নয় যে, এঁদের জীবনেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ভাষ্য রচিত হয়েছে এবং এঁদের প্রত্যেকের জীবনব্যাপী কার্যকলাপের ভেতর দিয়েই তো আজ সমগ্র ভারতে এবং বিশ্বের প্রায় সর্বত্র প্রকটিত হয়েছে জনসেবা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বরূপ। তাঁর জীবন ব্রত উদ্‌যাপন করে, একাত্তর বছর বয়সে তাঁর বহু গুরু-ভ্রাতার স্মৃতিপূত বেলুড় মঠে ১৯৩৭ সালের ৭ মার্চ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহাসমাধিলাভ করেন। তখন দেশের সর্বত্র তাঁর ইষ্টদেবতার শতবার্ষিক উৎসব চলছিল।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

বেলঘরিয়াতে দেওয়ান গোবিন্দ মুখুয্যের বাড়িতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরের কাছেই—দু'মাইলের মধ্যে—বেলঘরিয়াতে গৃহীভক্ত গোবিন্দ দেওয়ানের বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। তিনি আসবেন জানতে পারলেই অনেক ধর্মপ্রাণ নর-নারী দেওয়ানজীর বাড়িতে আসতেন তাঁকে দর্শন করতে। তাঁর মুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনতে, ধর্মের কথা শুনতে। সেদিন বারো-তেরো বছরের একটি ছেলেও এসেছিল। এই ছেলেটির নাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। নিতান্তই কিশোর মনের নিছক কৌতূহল নিয়ে সে এসেছিল দক্ষিণেশ্বরের এই সাধুটিকে দর্শন করতে। বয়স নিতান্ত কম, তাই তার শুধু চোখের দেখাই হলো। টুকরো-টাকরা কথা যা কানে এলো তার অর্থবোধ বিশেষ কিছু হলো না, তাই মনের মধ্যে কোন দাগ কাটেনি। তবে রামকৃষ্ণকে সেই প্রথম দেখে কিশোরের মনে একটা বিষয়ে বিস্ময় জেগেছিল : এ আবার কেমন সাধু। পরনে গেরুয়া কাপড় নেই, মাথায় নেই জটা, কপালে ভস্ম নেই—এ আবার কেমন সাধু!

দু'বছর পরের কথা। ১৮৮৩ সাল। হরিপ্রসন্ন তখন কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। তাঁর দুজন সহপাঠী—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ) ও বরদা পালের সঙ্গে তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে এলেন। এটাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যথার্থ সাক্ষাৎকার। কারণ এই দর্শনের ফলেই তো তাঁর জীবনের দিক্‌পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ঠাকুর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ

স্নেহ ও ভালবাসার সঙ্গে হরিপ্রসন্নকে গ্রহণ করলেন এবং সেই স্নেহডোরে হরিপ্রসন্ন চিরকালের মতো বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন। বাঁধা তো পড়তেই হবে, কারণ তিনি যে যুগাবতারের অন্যতম লীলাসহচর ও চিহ্নিত সন্তান। বয়স তখন যদিও কম, তবু তাঁর বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, দক্ষিণেশ্বরের এই সাধুটি সত্যই অসাধারণ। তাঁর সরলতা, তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথায় তিনি যারপরনাই আকৃষ্ট হলেন। সেদিন ঠাকুরের সন্ধ্যায় কলকাতায় মণি মল্লিকের বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। তাই তিনি সন্ধ্যার আগেই কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বন্ধু তিনটিও তাঁকে অনুসরণ করলেন। ফলে সেদিন বাড়ি ফিরতে হরিপ্রসন্নর অনেক রাত হয়েছিল। মা উৎকণ্ঠিত মনে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ছেলে ফিরতেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁরে, এত রাত হলো কেন?

—দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে।

—ও তুই সেই পাগল বামুনটার কাছে গিয়েছিলি?

—উনি পাগল তোমায় কে বললে? পাগলামির চিহ্নমাত্র তাঁর মধ্যে দেখলাম না। সহজ, সরল মানুষ, আর কী সুন্দর জ্ঞানের কথা বলেন তিনি।

—একশোবার পাগল। শুনেছি উনি কম করে সাড়ে তিনশো কাঁচা ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছেন।

—কি সব উদ্ভট কথা বলছ মা।

এই হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় উত্তরকালে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বা বিজ্ঞান মহারাজ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর কৈশোর জীবনের এই ঘটনাটি উল্লেখ করে তিনি বলতেন: 'সত্যি মাথাটা খারাপ করে দিয়েছিলেন তিনি। মাথাটা আজো খারাপ হয়ে রয়েছে। যদি না আমি দক্ষিণেশ্বরের সেই উন্মাদের প্রভাবের আওতার মধ্যে আসতাম, ভগবান জানেন, আজ আমি কোথায় থাকতাম। হয়ত এই পার্থিব সংসারের পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে

থাকতাম এবং আর পাঁচজন যেভাবে জীবন কাটায়, আমিও ঠিক সেই গতানুগতিক ভাবে জীবন কাটাতাম।' কথাগুলি প্রাণিধান-যোগ্য।

বেলঘরিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৬৮ সালের ২৮ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। 'বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই চিহ্নিত সন্তানটির ললাটে লেখা ছিল এই পরিচয়। ভাগবতের একটি শ্লোকে আছে :

> বুধো বালকবং ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
> বদেদুন্মত্তবদ্ বিদ্বান গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥

অর্থাৎ, মহাপণ্ডিত হয়েও তিনি বালকের মতো খেলাধুলা করেন। সকল বিষয়ে পারঙ্গম বা কুশলী হয়েও জড়বৎ বসে থাকেন। তাঁর কথাবার্তা অসংলগ্ন এবং সেই কথা শুনে লোকে তাঁকে উন্মাদ মনে করে। বেদজ্ঞ হয়েও অতি বিসদৃশ তাঁর আচরণ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূতচরিত্রে ভাগবতের এই শ্লোকটিতে উল্লিখিত লক্ষণগুলি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ছিল। তাঁর সান্নিধ্যলাভের দুর্লভ সৌভাগ্য যাঁদের কোন না কোন সময়ে হয়েছিল তাঁদেরই প্রদত্ত বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যথার্থ সুপণ্ডিত হয়েও তিনি সরল বালকের মতো ব্যবহার করতেন। সকল রকম কায়িক কাজে সুদক্ষ হয়েও অনেক সময় তিনি জড়বৎ আচরণ করতেন। তিনি যেসব কথা বলতেন সেগুলি ছিল রীতিমতো অসংলগ্ন এবং সেগুলির অর্থ অনেকের কাছে বোধগম্য হতো না। বহু শাস্ত্র তিনি পাঠ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বাইরের আচরণ দেখে তার কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সকল গুরুভাইদের চেয়ে বিজ্ঞান মহারাজ বয়সে ছোট হলেও তাঁর পূত চরিত্র, পাণ্ডিত্য এবং অন্যান্য গুণাবলীর জন্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি একটি অনন্যলব্ধ স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। নানা দিক দিয়েই তাঁর স্বাতন্ত্র্য তাঁর কর্ম এবং চিন্তায় অভিব্যক্ত হতো।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নিজেই বলেছেন যে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পাঁচ কি ছয়বার সাক্ষাৎ করেছিলেন। একদিন বিকেলবেলায় যখন এলেন তখন ঠাকুর তাঁকে সেই রাতটা দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়ে যেতে বললেন। সেই রাত্রে ঠাকুর নিজে কোন আহার্য গ্রহণ করলেন না, কিন্তু হরিপ্রসন্নর জন্য আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে কিশোরের শয়নের ব্যবস্থা তাঁর ঘরেই হলো—একমাত্র তাঁর নির্বাচিত মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের এই সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি নিজে পরম স্নেহভরে মেঝের ওপর একটা মাদুর বিছিয়ে দিলেন এবং মশারি টাঙিয়ে দিলেন। হরিপ্রসন্ন যখন বিছানায় শুয়েছিলেন তখন ঠাকুর তাঁর কাছটিতে এসে কথা বলতে লাগলেন: জানিস, কেন তোকে এত ভালবাসি? মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তুই এখানকার, তুই আমার চিহ্নিত সন্তান।' ঠাকুরের কথাবার্তা চলতে থাকে আপন মনে, কিশোরের দুই চোখ ভরে ঘুম আসে। কিছুক্ষণ বাদে হরিপ্রসন্ন সবিস্ময়ে দেখলেন, ঠাকুর দুই হাতের তালি বাজাতে বাজাতে তাঁর বিছানার চারদিকে ঘুরছেন আর বিড়বিড় করে কিসব বলছেন। উনি পাগল নাকি? অনেকেই তো তাই মনে করে থাকে। পরবর্তীকালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলতেন, সেই রাত্রে তাঁকে ঠাকুরের যা দেওয়ার ছিল তাঁকে সব প্রদান করেছিলেন।

তরুণ শিষ্যদের অথবা ভাবী শিষ্যদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল অসীম ভালবাসা। যদি কখনো তাঁদের মধ্যে কেউ দক্ষিণেশ্বরে অনেকদিন না আসতেন, তাহলে তিনি রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠতেন এবং লোক পাঠিয়ে হয় তাঁকে ডেকে আনাতেন নয়ত খোঁজ-খবর নিতেন। একবার হলো কি হরিপ্রসন্ন অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে আসেন না। তখন তিনি শরৎ-এর মারফৎ তাঁর কাছে খবর পাঠালেন এবং এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। হরিপ্রসন্ন

আসতেই ঠাকুর সখেদে তাঁকে বলেন: 'এখানে আসিস নি কেন এতদিন? খবর পাঠিয়েও তোকে এখানে আনা কঠিন দেখছি।'

—সব সময় আসার প্রেরণা পাই না, তাই আসি না।

সরল মনে বলেন হরিপ্রসন্ন। এইকথা শুনে ঠাকুর শুধু হাসলেন এবং বললেন: একটু করে ধ্যান করিস তো?

ধ্যান করতে চেষ্টা করি। আচ্ছা কেমন করে ভালোভাবে ধ্যান করা যায় বলুন তো? সত্যিকারের ধ্যান তো করতেই পারি না।

এই উত্তর শুনে রামকৃষ্ণ যারপরনাই বিস্মিত হলেন এবং তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। হরিপ্রসন্ন তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন এবং কখন তাঁর ঠোঁট দুটি থেকে কথা বেরুবে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হরিপ্রসন্ন যখন এইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন ঠাকুরের মুখের ভাবটা বদলে যায়। তিনি গম্ভীর হয়ে ওঠেন এবং বলেন: 'বেশ, এখন পঞ্চবটিতে গিয়ে ধ্যান করবার চেষ্টা কর। তারপর ইসারায় তিনি হরিপ্রসন্নকে কাছে ডাকেন এবং ডান হাতের তর্জনী দিয়ে তাঁর জিভে কিসব লিখে দিলেন এবং পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে পঞ্চবটিতে। ঠাকুরের দিব্য স্পর্শলাভ করা মাত্র আচ্ছন্নের মতো একটা ভাব দেখা দিল তাঁর মধ্যে এবং কোনমতে স্খলিত চরণে পঞ্চবটির দিকে চললেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যাপুত স্থান দক্ষিণেশ্বরের এই পঞ্চবটি। তাঁর সাধনপীঠ। তার তলায় বসে ধ্যান করবার চেষ্টা করতেই তাঁর চারদিকের পরিবেশ এবং বাইরের পৃথিবী সব কিছু বিস্মৃত হয়ে গেলেন তিনি। লুপ্ত হয়ে যায় চৈতন্য। যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তিনি, দেখলেন সহাস্যবদনে ঠাকুর পাশে বসে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

কিছুক্ষণ বাদে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন: কি? আজ ধ্যান হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ সত্যিকার ধ্যানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি আমি।

—এরপর থেকে দেখবি যে রোজ এইরকম ঠিক ঠিক ধ্যান হবে।

ঠাকুর তাঁর সন্তানদের সঙ্গে কী সহজ এবং ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন তা অভিব্যক্ত হয়েছে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-বর্ণিত চিত্তাকর্ষক এই ঘটনাটির মধ্যে : 'ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় একদিন আমি ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তি লড়েছিলাম। এই বারান্দার কোলেই গঙ্গা। তিনি ছোট-খাটো মানুষ, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আমি যেমন বড় ছিলাম, তেমনি গায়েও শক্তি ছিল। আমি সহজেই তাঁকে চিৎ করে ফেলেছিলাম। কী হাল্কা আর নরম তাঁর শরীর—একেবারে শিশুর মতো নরম। মল্লযুদ্ধে আমি জয়ী হয়েছিলাম বটে, কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে শারীরিক সংস্পর্শের ফলে আমার মধ্যে যে দিব্য শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল তখন তাতে আমি রীতিমত ভয় পেয়েছিলাম।'

১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য দেশ জয় করে ফিরে আসার অল্পকাল পরে হরিপ্রসন্ন মহারাজ আলমবাজার মঠে এসে যোগদান করেন। অত্যন্ত মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন হরিপ্রসন্ন এবং তাঁরই জন্য তিনি সরকারী চাকরি গ্রহণ করেছিলেন এবং বেশ কয়েক বছর চাকরি করার পর যখন মায়ের ভবিষ্যৎ সংস্থানের প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁর হাতে এলো তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি তখন এটোয়াতে। সংসার ত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে ঠাকুর তাঁর এই সন্তানটিকে পর-পর দু'বার দর্শন দেন এবং সংসার ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। সাংসারিক কর্তব্য শেষ করে, অবশেষে তিনি অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে মঠে যোগদান করেন।

স্বামীজির রাজপুতানা' এবং অন্যান্য অঞ্চল ভ্রমণের সময় বিজ্ঞানমহারাজ তাঁর সঙ্গী ছিলেন। ১৮৯৯। বেলুড়ে মঠ উঠে এলো স্থায়ীভাবে। মঠের প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্মাণের সকল দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর ওপর। গঙ্গার কাছেই মঠের প্রধান বাড়িটি অবস্থিত। সেজন্য একটি বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন হয় এবং এই বাঁধ তৈরি করার কাজও বিজ্ঞানমহারাজকে তত্ত্বাবধান করতে হয়েছিল।

একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

'মঠের দোতলার বারান্দায় দুইখানি চেয়ারে বসিয়া মহারাজ ও হরিপ্রসন্ন মহারাজ কৌতুকচ্ছলে কথা-কাটাকাটি করিতেন। একদিন মহারাজ নিলেন আস্তিকের পক্ষ, হরিপ্রসন্ন মহারাজ নাস্তিকের। হরিপ্রসন্ন মহারাজকে হার মানিতে হইল, মহারাজ তাঁহার সকল যুক্তিই খণ্ডন করিলেন। পরদিন মহারাজ নিলেন নাস্তিকের পক্ষ, আর হরিপ্রসন্ন মহারাজ আস্তিকের। তাহাতেও ফলের ইতরবিশেষ হইল না, মহারাজকে হারাইতে পারা গেল না। কথা-কাটাকাটি হইতে হইতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার সময় মহারাজ গঙ্গাজল স্পর্শ করিতেন, সেবক তাঁহার হাতে গঙ্গাজল ঢালিয়া দিতেছেন দেখিয়া হরিপ্রসন্ন মহারাজ তর্কের জের টানিয়া কহিলেন, এ কী হচ্চে মহারাজ, এখন যে আস্তিকের মত কাজ হচ্চে? মহারাজ উত্তর দিলেন, এটা কী জানো—সংস্কার; গঙ্গাজল স্পর্শ করা একটা সংস্কারে দাঁড়িয়েছে; কোন মতেই একে আস্তিকতা বলা চলে না।[১]

ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসী হিসাবে ভারতের বহু তীর্থস্থান পর্যটন করতে করতে অবশেষে এই শতাব্দীর সূচনায় এলাহাবাদে এসে উপনীত হলেন বিজ্ঞান মহারাজ। এই পবিত্র তীর্থে কিছুকাল অবস্থান করার জন্য তিনি এখানে তাঁর এক চিকিৎসকবন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সময়ে স্থানীয় কয়েকজন ধর্মপ্রাণ তরুণ শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক ভক্তের সহায়তায় 'ব্রহ্মবাদিন ক্লাব' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, শাস্ত্রপাঠ, পূজা-অর্চনা ও আলোচনার সাহায্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই রামকৃষ্ণ-ভক্তটি ১৯০০ সালে কলকাতায় ফিরে গেলে ক্লাবের সদস্যগণ একজন যোগ্য পরিচালকের অভাব বোধ করতে থাকেন। ঠিক সেই সময়ে

১. ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা : ব্রঃ অক্ষয়চৈতন্য।

তাঁরা জানতে পারেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের একজন শিষ্য এলাহাবাদে এসেছেন। সদস্যগণ তাঁর উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেন। তাঁরা স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কাছে এসে তাঁদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং তাঁকে ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে নিয়ে এলেন। এখানে সবকিছু দেখে-শুনে ও ক্লাব-সদস্যদের আন্তরিকতা ও ধর্মপ্রবণতা দেখে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হলেন এবং কিছুকাল সেখানে অবস্থান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এক এক করে আটটি বছর তিনি এখানে তপস্যা করেছিলেন—সেই সঙ্গে চলতো শাস্ত্রপাঠ আর ধ্যান। অবশেষে এই পবিত্র প্রয়াগঃতীর্থে রামকৃষ্ণ নামের পতাকা উড্ডীন করলেন তিনি—স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ মঠের একটি স্থায়ী কেন্দ্র এলাহাবাদে। জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি এইখানেই অতিবাহিত করেছিলেন এবং তাঁর ধ্যান-ধারণামণ্ডিত সেই জীবন থেকে নিরন্তর বিচ্ছুরিত হতো অধ্যাত্মশক্তির ধারা।

ব্রহ্মবাদিন ক্লাবের আবাসে আটবছর অতিবাহিত করার পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মুথিগঞ্জে উঠে আসেন ১৯১০ সালে এবং সেই বছরেই তিনি এখানে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের মানবসেবার আদর্শকে সামনে রেখে, তিনি আশ্রমে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এইসময় থেকে তাঁর অন্তর্মুখিনতা ক্রমশ নিবিড় থেকে নিবিড়তম হয়ে উঠতে থাকে এবং সাধারণ লোকের পক্ষে সেই জীবনের নাগাল পাওয়া খুবই সুকঠিন ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি উক্তি স্মর্তব্য। মহারাজ বলতেন: 'প্রসন্নকে জানা বা বুঝা খুবই কঠিন। তিনি সব সময়েই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্। আত্মাকে তিনি জেনেছেন, তাই তিনি আত্মারাম।' তাঁর আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টি-বলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বীয় গুরুভ্রাতার এই উদাবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তো মহারাজ, যেসব নবীন ব্রহ্মচারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক আস্পৃহা দেখতে পেতেন, তাদেরকে তিনি বেলুড় মঠ

থেকে এলাহাবাদে বিজ্ঞান মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিতেন উপযুক্ত শিক্ষালাভের জন্য।

স্বামী বিজ্ঞামানন্দ একজন যথার্থ সুপণ্ডিত ছিলেন। বই পড়তে তিনি খুব ভালবাসতেন এবং ইংরেজিতে যাদের বলা হয় voracious reader—তিনি ছিলেন ঠিক সেই শ্রেণীর পাঠক। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ছিল বহুমুখী। এলাহাবাদের দুজন প্রখ্যাত পণ্ডিত—নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎচন্দ্র দাস ও মেজর বি. ডি. বসু—তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং এঁদের উৎসাহে তিনিও সাহিত্যকর্মে প্রবৃত্তি হয়েছিলেন। বাংলাভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে দুখানি বই (A Manual of Engineering ও Water works) ব্যতীত তিনি সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে 'দেবী ভাগবত', জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুখানি প্রাচীন গ্রন্থ এবং বরাহমিহিরের 'বৃহজ্জাতক' ও 'সূর্যসিদ্ধান্ত' অনুবাদ করেছিলেন। শেষোক্ত বইটি তিনি বাংলাতেও অনুবাদ করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ইংরেজিতে রামায়ণ অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু এই অনুবাদ অসমাপ্ত।

নির্জনতাপ্রিয় মানুষ ছিলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। সেইজন্য তিনি মিশনের প্রধান কাজে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু যখনই তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন হতো, তিনি অকাতরে সেই সাহায্য দান করতেন: বিশেষ করে পূর্তবিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মিশনের কিছু কিছু গৃহ-নির্মাণে খুবই সহায়ক হয়েছিল। কাশীতে 'রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সার্ভিস'-এর ভবন ও বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে বেলুড়ে নবনির্মিত রামকৃষ্ণ মন্দিরটি। এই মন্দিরটি যখন নির্মিত হয় তখন তাঁর বয়স সত্তর বছর এবং স্বাস্থ্যেরও কিছুটা অবনতি দেখা গিয়েছে। তাই গভীর উদ্বেগের সঙ্গেই তিনি মন্দির-নির্মাণের সমাপ্তি কাজটা লক্ষ্য

করতেন। নিজের হাতে তাঁর ইষ্টদেবের মর্মর মূর্তি এই মন্দিরে তিনি স্থাপন করবেন—এই ছিল তাঁর অন্তরের অভিলাষ। একদিন নব-নির্মিত বেলুড় মঠে ঠাকুরের একটি আলোকচিত্র মাথায় করে এনে স্থাপন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ আর আজ, সেই ঘটনার চল্লিশ বছর বাদে, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্থাপন করলেন নবনির্মিত মন্দিরে রামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তি (১৪ জানুয়ারি, ১৯৩৮)। সেদিন পঞ্চাশ হাজার লোক এই স্মরণীয় অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিল।

তাঁর প্রিয়তম ইষ্টদেবতার মর্মর মূর্তিস্থাপন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে পরে বিজ্ঞান মহারাজ মনে করলেন তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজটি সম্পন্ন হলো। এর পর তিনি মাত্র আর একটিবার বেলুড় মঠে এসেছিলেন এবং সেই সময়ে অনেকে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষালাভ করে তাঁর উপদেশ শুনে কৃতার্থ হয়েছিল। ১৯৩৮, ২৫ এপ্রিল তিনি মহাসমাধিলাভ করেন এবং তাঁরই শেষ ইচ্ছানুসারে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে ত্রিবেণীর পবিত্র সলিলে তাঁর দেবদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়। হাজার হাজার সন্ন্যাসী ও ভক্ত এক পুণ্য-পুরুষের এই সলিল সমাধি সেদিন প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছিলেন।

তাঁর এই সন্তানটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ দুটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন; প্রথম, ধ্যান সম্পর্কে, দ্বিতীয়, স্ত্রীলোক সম্পর্কে। এবং এই দুটি উপদেশই তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। মঠের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও জ্ঞান, ভক্তি ও বালকোচিত সারল্যের সঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের আচরণে অপূর্ব সংযম, নিষ্ঠা ও ঠাকুরের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখে সকলেই মুগ্ধ হতো।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

—কেশবের সমাজে যাওয়া-আসা আছে নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সাকার ভালবাস, না নিরাকার ?

—ঈশ্বর আছেন কিনা তাই জানি না—তাঁর আবার সাকার না নিরাকার।

এই সরল ও নির্ভীক উত্তর যাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল এবং যে উত্তর শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনিই শশী মহারাজ বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামে অভিহিত। কথিত আছে, প্রথম দিনেই ঠাকুর শশীর মন জয় করে নিয়েছিলেন। আর শশীও তাঁর অন্যতম লীলাসহচর রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। চিহ্নিত হয়েছিলেন বলেই না ঠাকুর তাঁকে বলে দিয়েছিলেন তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে : 'আবার আসিস, কিন্তু একা একা ; ধর্মের সাধন গোপনীয়।' নরেন, রাখাল, শরৎ, তারক—সবাইকে যুগাবতার প্রথম দেখার পর বলেছিলেন : আবার আসিস।

এবং তাঁরা প্রত্যেকেই এসেছিলেন, আর রামকৃষ্ণলীলার পূর্ণতা সাধনে নিজনিজ প্রতিভা অনুযায়ী প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের নেপথ্য বিধানেই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে আমরা এই মহত্তম আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তারই ফলশ্রুতি ছিল শুধু বাংলায় নয়, শুধু ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে এক অভিনব যুগান্তর। আর দশজনের মতোই সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে।

কেমনভাবে এক অন্তর্নিহিত প্রেরণায় শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণ নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে যৌবনের প্রারম্ভেই যুগাবতারের পদতলে উপনীত হন এবং তাঁর দিব্য স্পর্শে এক নতুন রাজ্যের সন্ধান পান তা এক বিস্ময়কর কাহিনী। অসংখ্য লোকের মধ্য থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ষোলটি সন্তানকে শুধু চিনে নেন নি, পরন্তু তাঁদেরকে নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী ধর্মরাজ্যে এগিয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁর সৃষ্টি।

হুগলী জেলার ইছাপুর গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করতেন ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক নিষ্ঠাবান শাক্ত। এঁর পৈতৃক-নিবাস ছিল চব্বিশ-পরগণার মজিলপুরে এবং তখন এঁদের উপাধি ছিল বাপুলি; কিন্তু এই পরিবার যখন মজিলপুর থেকে চলে আসেন, তখন তাঁদের কেউ কেউ চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু একজন শাক্ত ছিলেন না, তান্ত্রিক পূজা ও তান্ত্রিক সাধনার বিবিধ বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। তৎকালীন বাংলার প্রখ্যাত তান্ত্রিক পণ্ডিত ও সাধক স্বামী পূর্ণানন্দ অবধূতের একজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র এবং পাইকপাড়ার জমিদার রাজা ইন্দ্র-নারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন তিনি। রাজা ইন্দ্রনারায়ণ একজন পরিপূর্ণ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং তাঁর বাগানবাড়ির এক প্রান্তে তান্ত্রিক পূজার যাবতীয় উপচার, যথা—হোমকুণ্ড, যূপকাষ্ঠ, পঞ্চমুণ্ডি আসন ইত্যাদি, সংরক্ষিত থাকত তাঁর গুরুদেব ঈশ্বরচন্দ্র এবং তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য। শাক্ত সাধনায় ঈশ্বরচন্দ্রের খ্যাতি সুবিস্তৃত ছিল। কথিত আছে, কালিঘাটে এক গভীর রাত্রে দেবী তাঁকে বালিকাবেশে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। তাঁর গৃহে প্রতি বৎসর কালীপূজা হতো। পরবর্তীকালে শ্রীমায়ের নির্দেশে স্বামী সারদানন্দ তাঁর এই খুল্লতাতের কাছ থেকে তন্ত্রোক্ত পূর্ণ অভিষেক গ্রহণ করেছিলেন। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, শশ্রু শোভিত

মুখ, মাথায় লম্বা চুল, রক্তচন্দন শোভিত প্রশস্ত ললাট—ঈশ্বরচন্দ্র দেখতে একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন।

এই নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে শশীভূষণ ১৮৬৩ সালের ১৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম বামাসুন্দরী দেবী—ধর্মপ্রাণ স্বামীর ধর্মপ্রাণা স্ত্রী ছিলেন তিনি। বলাবাহুল্য, এই পরিবারে একটা নির্মল ধর্মীয় ভাব সদা বিদ্যমান ছিল এবং স্বভাবতই শশীভূষণ তাঁর শৈশবকালে সেই পবিত্র পরিবেশ থেকেই প্রাণরস আহরণ করেছিলেন। যে উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি এই সংসারে এসেছিলেন এবং যে পরিবেশের মধ্যে তিনি লালিতপালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন তা পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে পূর্ণতা লাভ করেছিল। বংশ এবং পারিবারিক ঐতিহ্য মানুষের চরিত্র গঠনে যে সহায়ক হয়ে থাকে, শশীভূষণের জীবনে এটা বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন ভগবৎপরায়ণ এবং শৈশব থেকেই পূজা অর্চনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে শশীভূষণ এলেন কলকাতায় ইংরেজী শিক্ষার জন্য। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন গ্রামের একটু সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের ছেলেরা কলকাতায় এসে ইংরেজী শিক্ষালাভ করতেন। তখন কলকাতায় তাঁর খুড়তুতোভাই শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শশীভূষণ এসে তাঁর কাছেই উঠলেন এবং হেয়ার স্কুলেই ভর্তি হলেন। মেধাবী ছাত্র, অধ্যয়নে অখণ্ড মনোযোগ। এনট্রান্স পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে বৃত্তি পেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পুত্রের এই কৃতিত্বের সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হলেন এবং উৎসাহ দিয়ে একটি চিঠিতে তাকে লিখলেন: মনে রেখো, ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা। বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্তটি সব সময়ই মনে রাখবে। অতঃপর শশীভূষণ আলবার্ট কলেজ থেকে ফার্স্ট আর্টস পাশ করলেন অনুরূপ কৃতিত্বের

সঙ্গে। তারপর বি. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান কলেজে (এখনকার নাম বিদ্যাসাগর কলেজ)। অঙ্ক, সংস্কৃত, দর্শন ও ইংরেজী—এই চারটি ছিল তাঁর বিশেষ পাঠ্য বিষয়। কলেজেও তিনি একজন দেদীপ্যমান ছাত্র বলে গণ্য হয়েছিলেন।

কলকাতায় তখন ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের যুগ। তাঁর বক্তৃতা শুনতে ছাত্ররাই বেশি আসত এবং তাঁর অপূর্ব বাগ্মীতায় তারাই বেশি করে আকৃষ্ট হতো ও প্রভাবিত হতো। প্রসঙ্গান্তরে আমরা এই বিষয়টি উল্লেখ করেছি এবং এখানে তার পুনরুল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। দুই ভাই—শশী ও শরৎ—ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কেশবচন্দ্রের কাছে যাওয়া-আসা আরম্ভ করেছিলেন। দুজনেই সমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন এবং শশীভূষণ কিছুকাল কলুটোলায় কেশবচন্দ্রের পুত্রের গৃহশিক্ষকতা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, শৈশবের ন্যায় যৌবনেও তাঁর ধর্মভাব প্রবল ছিল এবং তখন থেকেই তিনি নিরামিশাষী হয়েছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে কেশবচন্দ্রের একখানি ইংরেজী পত্রিকা ছিল ; এই কাগজেই তিনি রামকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি বিবরণ প্রকাশ করে-ছিলেন এবং সেটি পাঠ করেই কলকাতার ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণদল দক্ষিণেশ্বরের এই অদ্ভুত সাধকটির কথা সর্বপ্রথম জানতে পেরেছিল। শশীর এক সহপাঠী—কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী—সেটি পাঠ করেছিলেন এবং তাঁর বন্ধুকে একদিন সেই লেখাটি দেখিয়ে বললেন, শশী, চল একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে এঁকে দেখে আসি। কেশববাবু যখন লিখেছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ হবেন। শশী তখন ফার্স্ট আর্টস (F.A.) পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১৮৮৩। অক্টোবর মাসের একদিন সকালের দিকে তাঁর খুড়তুতো ভাই শরৎ ও বন্ধু কালীপ্রসাদসহ শশীভূষণ এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁদের সঙ্গে আরো পনর জন ব্রাহ্ম ছিলেন। সকলেই সমবয়সী। শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতা থেকে সমাগত ধর্মপ্রাণ এই যুবকদের প্রীতির

সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সেই ঘরটিতে বসে। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে কথাবার্তা বললেন। তখন শশীভূষণের সঙ্গে তাঁর যেসব কথা হয়েছিল এই আলোচনার প্রথমেই আমরা তার উল্লেখ করেছি। স্বামী অভেদানন্দ যে কথা বলেছিলেন, পরবর্তীকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও ঠিক সেই কথাই বলেছিলেন: 'প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্র সেনই গুরুমহারাজকে প্রকাশ করেছিলেন এবং পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কলকাতায় তিনিই ছিলেন সর্বজনমান্য এবং সর্বজনঅন্বেষিত ব্যক্তি। তাঁর সমাজে সব সময়েই লোকের ভীড় এবং তরুণেরাই ছিল তাঁর অনুগামী। তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন ছিল। যখন তিনি শুভ্র বেশে সজ্জিত হয়ে সমাজের বেদীতে দাঁড়িয়ে অপূর্ব বাগভঙ্গী সহকারে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতেন তখন তাঁর দুই চোখ বেয়ে দরদর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতো এবং উপস্থিত সকলের চক্ষু সজল হয়ে উঠতো। তিনি সত্যই একজন বিরাট পুরুষ ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন।'[১]

'প্রথম দিনেই ঠাকুর শশীর মন জয় করিয়া লইলেন। এই আকর্ষণের ফলে তিনি ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তিনি অনেক কথা বলিতেন; কিন্তু অতঃপর যুবকমনে বহু সন্দেহ উঠিলেও এবং সন্দেহ নিরসনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে গেলেও ঠাকুরকে ভগবৎ প্রসঙ্গে নিমগ্ন ও ভক্তপরিবেষ্টিত দেখিয়া তার বিশেষ বাক্যস্ফূর্তি হইত না। তাঁহাকে দেখিলেই ঠাকুর বলিতেন, 'বস, বস'। তিনিও বসিতেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই মনের সংশয় বিদূরিত হইয়া তৎস্থলে অপূর্ব শান্তি বিরাজ করিত। ক্রমে

১. 'Days in an Indian Monastery' : Sister Devamata. (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ইংরেজী জীবনী 'Swami Ramakrishnananda থেকে উৎকলিত।

সুযোগ বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহার নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহার হৃদয়-মন চিরতরে এক উচ্চতর স্তরে তুলিয়া লইলেন। একদিন বস্তুবিশেষের সন্ধানে শশী দ্রুতপদে ঠাকুরের কক্ষ অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন। এমন সময় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, তুই যাকে চাস—সে এই, সে এই। চকিতে শশীর দৃষ্টি অনুসন্ধেয় বস্তু হইতে সদানন্দময় ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি বুঝিলেন, ঠাকুরই জীবনের একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু—আর সব অনুসন্ধান এই বৃহৎ অনুসন্ধানের রূপান্তর মাত্র।'[1]

এখানে উল্লেখ্য যে, দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া-আসার ফলে শশীভূষণ ক্রমে নরেন, রাখাল প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে পরিচিত ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দিন যায়। যাতায়াত বাড়ে। মাঝে মাঝে সেবারও একটু-আধটু সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হন। কখনো কখনো ঠাকুর শশীকে এখানে থেকে যেতে বলতেন। এই 'থেকে যাওয়া'-র অর্থ কি যুবক শশীভূষণ তা বুঝতে পারতেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়নি, সাংসারিক অসচ্ছলতাও কম ছিল না। গুরুর প্রতি তাঁর ভক্তিও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যখন সামান্য সেবার সুযোগ পেতেন, নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

শশী তখন কলেজে বি. এ. ক্লাসে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়েন। সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে (১৮৮৫) গলার অসুখের চিকিৎসার জন্য ভক্তগণ ঠাকুরকে প্রথমে কলকাতায় শ্যামপুকুরে নিয়ে এলেন। তখন শশীভূষণের সামনে একটি সমস্যা দেখা দিল: অধ্যয়ন, না সেবা? তখন তিনি নিঃসঙ্কোচে তাঁর দেহ-মন-প্রাণ সব অসুস্থ ঠাকুরের সেবায় নিয়োজিত করবার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। পরীক্ষায় আর বসলেন না। অন্যান্য গুরুভাইদের মতো তিনিও নিষ্ঠার সঙ্গে ইস্টদেবতার সেবা করতে থাকেন।

১. ভক্তমালিকা (প্রথম ভাগ): স্বামী গম্ভীরানন্দ।

শ্যামপুকুর থেকে পরে রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে আসা হয় কাশীপুরে। এখানেও তাঁর সেবায় বীরভক্ত শশীভূষণ ছিলেন অগ্রণী। একদিন ঠাকুরের জামরুল খাবার ইচ্ছা হলো। তখন শীতকাল—জামরুল অলভ্য। কিন্তু ঠাকুর যখন খেতে চেয়েছেন তখন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল যেখান থেকেই হোক জামরুল সংগ্রহ করতেই হবে। শশীভূষণ খবর পেলেন যে, এক বাগানে জামরুল আছে। অমনি সেখানে গিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। নরেন্দ্রনাথ, শশীভূষণ আর শরৎচন্দ্র—এই তিনজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে। ঠাকুরের প্রতি শশীর ভক্তির প্রগাঢ়তা দেখে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'শশীভাই যেন মূর্তিমান ভক্তি।' তাঁর সেবার প্রগাঢ়তা এমনই ছিল যে, তাঁর খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ভুল হয়ে যেত; কখনো বা দেখা যেত যে, হাত থেকে হাত-পাখা নামে না—ঠাকুরকে হাওয়া করছেন অবিরাম, অবিশ্রান্ত, হাত ভারি হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই শশীভূষণের। •

কিন্তু এত সেবা দিয়েও ঠাকুরকে বেঁধে রাখা গেল না। লীলা সংবরণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময় ঠাকুরের পূতদেহকে মাল্য-চন্দন-পুষ্পে সাজাইয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। বাস্তবকে বিশ্বাস করিতে অপটু শশী চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত চিতার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। লাটু তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিলেন, নরেন ও শরৎ অনেক প্রবোধ দিলেন—শশী তখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। চিতা নির্বাপিত হইলে তিনি নীরবে ভস্মাস্থি তুলিয়া একটি তাম্রকলসীতে রাখিলেন। এবং উহা মস্তকে ধারণ করিয়া উদ্যানবাটিতে ঠাকুরের শয্যায় স্থাপন করিলেন। শশীর বিশ্বাস ঠাকুর যান নাই; সুতরাং ঠাকুরের দ্রব্যাদি সযত্নে রক্ষিত হইল এবং ভস্মাস্থিপূর্ণ কলসীতে নিয়মিত পূজা চলিতে লাগিল।'[১]

অতঃপর শশীভূষণ ঘরে ফিরলেন এবং অভিভাবকের তাগিদে

১. ভক্তমালিকা (প্রথম ভাগ)।

আবার পড়াশুনায় মনোনিবেশ করলেন। অভিভাবকের ইচ্ছা যে, তিনি অন্তত বি. এ. টা পাশ করেন। কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। কয়েকমাস পরে নরেন, রাখাল প্রভৃতি গুরুভাইদের আহ্বানে তাঁকে বরাহনগর মঠে এসে যোগদান করতে হলো—তিনি না এলে ঠাকুরের নিত্যপূজা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। প্রসঙ্গান্তরে উল্লিখিত হয়েছে যে, এইখানেই তাঁর অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে সন্ন্যাসগ্রহণের পর শশীভূষণ 'রামকৃষ্ণানন্দ' নাম গ্রহণ করেন। তাঁর সন্ন্যাসজীবনের এই নামটির মধ্যেই লিখিত আছে এই রামকৃষ্ণ-সন্তানের প্রকৃত জীবনেতিহাস। বরাহনগর মঠে তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। একদিকে তিনি অতিনিষ্ঠা সহকারে নিত্যগুরুপূজার মাধ্যমে সকলের মনে গভীর ভক্তিভাব জাগাতেন। অন্যদিকে তেমনি তাঁদের শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। মঠ স্থাপনের পর গুরুভ্রাতাদের বেশির ভাগই তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু গুরুসেবায় নিযুক্ত এই রামকৃষ্ণ-সন্তানের মনের ভাবটা এই ছিল: 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।' কোথায় যাবেন তিনি ঠাকুরকে ফেলে?

বরাহনগর মঠ—রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম মঠ। গোড়ার দিকে এখানে সকলের জীবন কিরকম ছিল তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন স্বামী অভেদানন্দ: 'আমাদের ভবিষ্যৎ সংঘ-জীবনের সংগঠন বরাহনগর-মঠ হইতেই শুরু হইয়াছিল। তখন সকলের জীবন অতিশয় দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনে সহায় সম্বল করিয়া মনের আনন্দেই দিন যাপন করিতাম। অবশ্য খাওয়া-পরার তখন অত্যন্ত কষ্ট ছিল। আহার আমাদের এক বেলাই জুটিত। কোন কোন দিন তেলাকুচার পাতা আনিয়া সিদ্ধ করিতাম ও তাহা দিয়া ভাত খাইতাম।'[১] কিন্তু আহার্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা এবং আহার প্রস্তুত

১. আমার জীবনকথা: স্বামী অভেদানন্দ।

করা—দুটিরই দায়িত্ব ছিল একজনের উপর। তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলেছেন: 'শশী ছিল মঠের প্রধান খুঁটি। সে না থাকলে আমাদের মঠবাস অসম্ভব হতো। সন্ন্যাসীরা ধ্যানভজনে প্রায়ই ডুবে থাকতো এবং শশী তাঁদের আহার প্রস্তুত করে অপেক্ষা করতো; এমন কি, মাঝে মাঝে তাদের ধ্যান থেকে টেনে এনে খাওয়াতো।'[১]

কিন্তু এহো বাহ্য।

'মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্বধর্মসমন্বয় মূর্তি সবভাবময় বিগ্রহ ঠাকুর। তিনি অপ্রকট হইলে তাঁহার সেবাপূজাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন, অনেক গুরুভাইদের স্পষ্ট বিরোধিতা সত্ত্বেও, দাস্যমূর্তির মূর্তবিগ্রহ শশী মহারাজ। আঁকড়াইয়া ছিলেন বলিয়াই এত সহজে রামকৃষ্ণসংঘ গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল।' বরাহনগর মঠ স্থাপিত হলে রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ প্রথমেই ঠাকুরের ব্যবহৃত বিছানা, পাদুকা ও অন্যান্য জিনিসপত্র কাশীপুর বাগানবাড়ি থেকে এখানে নিয়ে আসেন। নিয়ে আসা হয় খাট-বিছানা এবং সেগুলি একটি ঘরে সুন্দরভাবে সা.জয়ে রাখা হয়। সকলেই সেই ঘরটিকে ঠাকুর-ঘর বলে মনে করতেন এবং ঠাকুরের বিছানার সামনে বসে ধ্যান-ধারণা ও কীর্তনাদি করতেন। সেইসঙ্গে চলতো ঠাকুরের অমিয় কথা আলোচনা। কিন্তু এই দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটালেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। এই প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ লিখছেন: 'শশী আসিয়া যেই ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের খাট, বিছানা, পাদুকা ও অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ছিল সেইখানেই সেইগুলি আরো ভালভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিল এবং খাটের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো স্থাপন করিয়া নিত্য-নিয়মিতভাবে পূজা। আরাত্রিক ও স্তব-পাঠাদি করিতে আরম্ভ করিল। স্তবপাঠ ও কীর্তনের সময় আমরা ও অন্যান্য সকলে যোগদান করিতাম। ক্রমশ শ্রীশ্রীঠাকুরের

১. তদেব।

জীবদ্দশায় আমরা যেইরূপ তাঁহাকে সেবা-শুশ্রূষাদি করিতাম, শশী ঐ নির্দিষ্ট ঠাকুর-ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর সামনে সেইরূপই করিতে লাগিল।'

যুগাবতারের সত্তাকে এইভাবে তনুমননিবেদিত পূজা ও সেবার মাধ্যমে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষ করে তুলেছিলেন। আলোকচিত্রের মধ্যে তিনি তাঁকে সাক্ষাৎ জীবন্তভাবেই প্রত্যক্ষ করতেন এবং সর্বক্ষণ তার অস্তিত্ব অনুভব করতেন। 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ঠাকুরপূজা একটা দেখিবার জিনিস ছিল। ঠাকুরকে তিনি শুধু বিধি-অনুযায়ী পূজা করিয়াই তৃপ্ত হইতেন না; তাঁহাকে জীবন্ত জানিয়া তদনুরূপ সেবা করিতেন। গ্রীষ্মে নিজের কষ্ট হইলে তিনি পাখা লইয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেন এবং নিজে গলদঘর্ম হইতে থাকিলেও উহাতেই আরাম বোধ করিতেন। ভোরে উঠিয়া দায়ের উলটা দিক দিয়া তিনি ঠাকুরের জন্য দাঁতনকাঠি থেঁতো করিয়া দিতেন। একদিন বাল্যভোগ দিতে যাইয়া দেখেন যে, সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা) উহা ঠিকভাবে থেঁতো করেন নাই। অমনি মনে আঘাত পাইয়া সচ্চিদানন্দের সন্ধানে বাহির হইলেন আর বলিতে লাগিলেন, আজ তুই আমাদের ঠাকুরের মাড়ি দিয়ে রক্ত বের করেছিস!'[১]

এ জিনিস ভক্তের অন্ধ বিশ্বাস বা তার মনের নিছক কল্পনা-বিলাস এমন যদি কেউ বলেন তাহলে তাঁকে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রতি একবার সশ্রদ্ধ ও সানুরাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলব। তাঁর অলৌকিক সাধনায় মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হয়ে উঠেছিলেন, নিরাকার সাকার চৈতন্যরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রাণঢালা পূজা-অর্চনা শ্রীরামকৃষ্ণকে শুধু আমাদের মনশ্চক্ষে নয়, আমাদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে' শাশ্বতকালের জন্য জীবন্ত করে রেখেছে। বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে বলছি। কাশীপুরে ঠাকুর

---

১. ভক্তমালিকা (প্রথম ভাগ)।

যেদিন মহাসমাধি লাভ করেন সেদিন এক আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সেই ঘটনার যিনি সাক্ষী ছিলেন তিনি লিখেছেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে শ্রীমা প্রায় সংজ্ঞাহারা হন। তিনি আপনার ঘরে শোকাতুরা হইয়া সধবার চিহ্ন দুই হস্তের সোনার বালা খুলিয়া ফেলিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ঘটনা ঘটিল অন্যরকম। শ্রীমা যখন হস্তের বালা ইত্যাদি খুলিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর স্থূলশরীরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে হস্তের বালা খুলিতে নিষেধ করিতেছেন। তিনি শ্রীমার দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এ'ঘর থেকে ও'ঘর। শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখের অভয়বাণী শুনিয়াও হাতের বালা ও কপালের সিন্দুর সেই সঙ্গে মুছিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। শ্রীমা ভালভাবেই বুঝিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্থিব শরীরই শুধু নষ্ট হইয়াছে কিন্তু দিব্যশরীরে তিনি সর্বদাই বিদ্যমান আছেন।'[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও এই রকম দর্শন ঘটেছিল যখন তিনি পওহারী বাবার কাছ থেকে যোগ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করবেন মনস্থ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে নিষেধ করেছিলেন।

মায়ের এই দর্শন যে কল্পনা-বিলাস ছিল না সেটা আমাদের সামনে প্রমাণিত করেছেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর ঠাকুর-পূজার ভেতর দিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, শশী যেভাবে ঠাকুরের পূজা করে তা শুধু পূজা নয়, পূজার অধিক কিছু—'it is worship'. এই 'worship' কথাটির প্রকৃত মর্ম যাঁর জানা আছে তিনিই বুঝবেন যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো পূজা করতেন না। তাঁর মধ্যে তাঁর দিব্য উপস্থিতিটা প্রত্যক্ষ করতেন। বরাহনগর মঠের একদিনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। তখন

১. আমার জীবনকথা: স্বামী অভেদানন্দ।

মঠে অনটনের দিন চলেছে। বেলা দ্বিপ্রহর। তখনো যাঁরা ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন ফেরেন নি। কিছুক্ষণ বাদে তাঁরা শূন্য থলি হাতে ফিরলেন। মঠের ভাঁড়ারও সেদিন শূন্য। তখন শশী মহারাজের ভাবনা হলো—হায় হায়, ঠাকুর উপোস করে থাকবেন। কোন গুরুভাইকে না জানিয়ে গেলেন এক প্রতিবেশির কাছে। পেলেন পোয়াখানিক চাল। গোটা কতক আলু আর সামান্য ঘি। তাই রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দিলেন; ভোগের পর তাই দিয়ে কয়েকটি পিণ্ড তৈরি করে অভুক্ত গুরুভাইদের মধ্যে বিতরণ করলেন। মাত্র একটি পিণ্ড, কিন্তু আস্বাদে অনুপম এবং তাই খেয়ে প্রত্যেকেই পরম পরিতৃপ্ত হলেন। এই একটিমাত্র ঘটনাই প্রমাণ করে যে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ঠাকুর-পূজা পূজামাত্র ছিল না—তা ছিল সত্যিই worship বা অর্চনা। পূজার পর তিনি যে আরতি করতেন তা দেখবার জিনিস ছিল। তাঁর রচিত ঠাকুরের পূজাবিধি একটি আশ্চর্য গ্রন্থ।

১৮৯৭। মার্চ মাস।

শুরু হয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায়। এই মাসের শেষভাগে জাহাজে করে তিনি মাদ্রাজ এলেন। স্বামীজি তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতার তত্ত্বাবধানের জন্য, তাঁরই একজন বিশ্বস্ত শিষ্য স্বামী সদানন্দকে সঙ্গে দিয়েছিলেন। সেই থেকে একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর ধরে তিনি মাদ্রাজে অবস্থান করেছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণভারতে তিনি রামকৃষ্ণনামের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন এবং মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে দুটি স্থায়ী মঠ গড়ে তুলেছিলেন। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ তাঁর কর্মজীবনের এক মহতী কীর্তি। বাঙ্গালোর ও মাদ্রাজে যখন তাঁর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে দুটি স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তখন শশী মহারাজের কর্মশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর গুরুভ্রাতাগণ রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন। বরাহনগর ও আলমবাজারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে যে শক্তি লুক্কায়িত ছিল তা আজ বৃহত্তর পরিবেশে যেন

বিস্ফোরণের মতো প্রকাশিত হলো। 'শশী খুব কাজের লোক'—স্বামীজির এই উক্তিটির সত্যতা আজ চূড়ান্ত ভাবে যাচাই হয়ে গেল।

এতো গেল তাঁর কাজের এক দিক। এর অন্যদিকও আছে। যে চৌদ্দ বছর কাল তিনি দক্ষিণভারতে অবস্থান করেছিলেন সেই সময়ের মধ্যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে কত বিভিন্ন স্থানে কত বক্তৃতা দিতে হয়েছিল তার সীমা সংখ্যা নেই। বক্তৃতার সঙ্গে থাকতো ক্লাস-লেকচার। চিকাগো ধর্ম মহাসভায় ঐতিহাসিক সাফল্যলাভের পর, স্বামীজি যেমন ঝটিকা বেগে আমেরিকার বহু স্থানে বক্তৃতা করে, নিউ ইয়র্ক শহরে বেদান্ত সমিতির পত্তন করে ঐ দেশের ধর্মপ্রাণ নর-নারীর মনে একটা চেতনার প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন, আজ আমরা যেন ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করলাম মাদ্রাজে ও দক্ষিণভারতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের মধ্যে। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, শহরের পর শহরে গিয়ে একাধিক সভাসমিতিতে তিনি বক্তৃতা করতেন, শাস্ত্রালোচনা করতেন, গীতা ও উপনিষদ ব্যাখ্যা করতেন। প্রায় সব সময় তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাপ্রচারে ব্যাপৃত থাকতেন। উৎসবাদির আয়োজনও বাদ যেতনা। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৮৯৯ সালের ১৯ মার্চ রবিবার মাদ্রাজ শহরে শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রথম জন্মতিথি উৎসব হয়, তাতে সকল শ্রেণীর হিন্দু, এমন কি মুসলমানরাও যোগদান করেছিল। এইভাবে তাঁর ঐকান্তিক উদ্যম ও উৎসাহ তখনকার দিনে পাশ্চাত্য-ভাবে ভাবিত দক্ষিণ ভারতের শিক্ষিত সমাজে কিরকম নতুন ভাবরন্যা এনেছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। স্বামীজির মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যেই শহরে, শহরের বাইরে ও বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে ছয়টি বিবেকানন্দ সোসাইটি তাঁর তত্ত্বাবধানে চলতো। এইসব সমিতিতে সাময়িক বক্তৃতা ও ক্লাসের সঙ্গে পূজা, ভজন ও দরিদ্র ছাত্রদেরকে সাহায্যদানের কাজ চলতো। বেলুড়মঠে বসে স্বামী

ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ তাঁর গুরুভাইরা মাদ্রাজে তাঁর কর্মোদ্যমের উত্তাপ বোধ করে বিস্মিত হতেন।

এইবার বলি তাঁর প্রধান কর্মকীর্তি মাদ্রাজ মঠ স্থাপনের কথা। ত্রিবান্দ্রম, বাঙ্গালোর ও মাদ্রাজ—এই তিনটি স্থানে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তিনটি স্থায়ী মঠ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'তিনি কিরূপ প্রতিকূল অবস্থায় তখন কার্য পরিচালনা করিতেন তাহা অনুধাবন না করিলে তাঁহার এই কালের চরিত্রের দৃঢ়তা সহজে উপলব্ধ হইবে না। একদিন কার্যান্তে ঘর্মাক্ত কলেবরে মঠে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুরকে ভোগ দিবার মতো কিছুই নাই। তখন গায়ের কাপড় ফেলিয়া রুদ্ধদ্বার গৃহে রুদ্ধ অভিমানে পুরুষসিংহ পাদচারণা করিতে করিতে ঠাকুরকে বলিলেন, পরীক্ষা হচ্ছে? আমি তোমায় সমুদ্রের তীর থেকে বালি এনে ভোগ দেব এবং তাই প্রসাদ পাব। পেট নিতে না চায় আঙুল দিয়ে ঠেলে সে প্রসাদ গলায় ঢোকাব।'[১]

বাঙ্গালোর মঠের নব-নির্মিত ভবনের উদ্বোধন হয় ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে। রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে। স্মরণীয় বলছি এইজন্য যে, এই উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন করেছিলেন স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা স্থানীয় অধিবাসীদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করবার জন্য শশী মহারাজ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বাঙ্গালোরে নিয়ে আসেন এবং তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অনায়াসে ভ্রমণের জন্য অকাতরে শ্রম ও অর্থব্যয় করেন। এই উপলক্ষ্যে মহারাজের পৌরোহিত্যে একটি মহতী সভায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে ভাষণ প্রদান করেন তার ফলে সমগ্র দক্ষিণভারতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের পথ সুগম হয়েছিল এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

১. ভক্তমালিকা (প্রথম ভাগ)

হয়েছিল। এই বাঙ্গালোর মঠে দু'বছর বাদে (১৯১১) শ্রীমায়ের পদার্পণ আর একটি স্মরণীয় ঘটনা।

এইভাবে দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রমের ফলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তাঁর জীবন ব্রত—যে ব্রতের ভার তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—উদ্‌ঘাপিত হয়েছে; এইকথা মনে করে তাঁর মনে যেন আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। বহুমূত্র, কাসি ও জ্বর তাঁকে আক্রমণ করল। বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাঙ্গালোর মঠে এলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো না। পরন্তু চিকিৎসক বললেন যে, তাঁর যক্ষ্মারোগ হয়েছে। বেলুড় মঠে সংবাদ গেল। গুরুভ্রাতাগণ তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় চলে আসতে অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন। সেই অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। কলকাতার অভিমুখে যাত্রা করলেন যথাসময়ে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন পুরীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি খুরদারোড স্টেশনে এসে ট্রেনে প্রিয় গুরুভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁকে নানা ভাবে সমবেদনা জানালেন এবং বললেন, 'শশী, ডাক্তার কবিরাজ যেমনটি বলবে ঠিক তেমনটি করবে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি মঠে ফিরছি।'

কলকাতায় পৌঁছে তিনি উদ্বোধন আপিসে উঠলেন। তখন অবিলম্বে ভাল ডাক্তার আনিয়ে তাঁকে দেখানো হলো। চিকিৎসক কোন ভরসা দিলেন না। একজন বিচক্ষণ কবিরাজকে দিয়েও দেখানো হলো। তিনিও আরোগ্যের কোন ভরসা দিতে পারলেন না। চিকিৎসায় কোন ফল হচ্ছে না দেখে স্বামী সারদানন্দ আর একজন ডাক্তার দিয়ে দেখাবার কথা বলতেই রোগশয্যায় শায়িত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শুধু জানালেন: 'এ দেহ-মন-প্রাণ ঠাকুরের চরণে অর্পণ করেছি। আমার নিজের কোন মতামত নেই।' রামকৃষ্ণ-সন্তানের যোগ্য কথা। ১৯১১, ২১শে আগস্ট মহাসমাধি-লাভ করেন তিনি প্রশান্ত মনে এবং ঠাকুরের চরণামৃত পান করে। দিনের সূর্য তখন মধ্যগগনে।

'শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দাস্যভঙ্গির এক অপূর্ব অত্যুজ্জ্বল আদর্শ এ যুগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। কি ঠাকুর-ঘরে, কি বক্তৃতামঞ্চে, কি লোক ব্যবহারে—সর্বত্র অনন্যসাধারণ গুরুভক্তিই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ও কর্ম প্রচেষ্টার প্রধান উৎস।' এই রামকৃষ্ণ-সন্তানের প্রকৃত মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে স্বামী ব্রহ্মানন্দের একটি মাত্র উক্তিতে। একবার বেলুড়মঠে নবাগত জনৈক সাধুকে তিনি বলেছিলেন: 'শশী মহারাজের সঙ্গে তিন বছর কাটাও, তাহলে সাধুজীবনে তোমার অপ্রাপ্য কিছু থাকবে না।' অদোষদর্শী নিরভিমান এই সন্ন্যাসী ছিলেন একাধারে উপদেষ্টা, বক্তা ও লেখক। তাঁর জীবনের দক্ষিণ ভারত পর্বটি ছিল সবচেয়ে গৌরবময়। বক্তা ও লেখক হিসাবে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ তাঁর জীবনের এই পর্বেই ঘটেছিল। বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃতে তিনি যেমন বক্তৃতা করতে পারতেন তেমনি ঐ তিনটি ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর এক জীবনীকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন: 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বাঙাল্পা, ইংরেজী ও সংস্কৃতে বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন। উহার কিছু কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙালা ভাষায় তাঁহার প্রণীত 'রামানুজচরিত' তাঁহার প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং বঙ্গভাষায় উহা এক অমূল্য সম্পদ। বস্তুতঃ রামানুজ ও তাঁহার শ্রীসম্প্রদায় সম্বন্ধে ইহাই উক্ত ভাষায় একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। ইংরেজীতে যে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'Universe and Man' 'Sri Krishna, the Pastoral and King-maker', 'The Soul of Man' ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রথম গ্রন্থে আছে বেদান্তের কয়েকটি স্থূল তত্ত্বের আলোচনা। দ্বিতীয় গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও দ্বারকালীলা এবং তৃতীয় পুস্তকে মানবের স্বরূপ আলোচনা।'[১]

---

১. তদেব

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মহিমামণ্ডিত জীবন শ্রদ্ধাসহকারে আলোচনার বিষয়। ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বিত মূর্তি ছিলেন তিনি। তাঁরই জীবনে পরিলক্ষিত হয় প্রতিভা ও অনুভূতির অপূর্ব মিশ্রণ। রামকৃষ্ণসঙ্ঘে হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তুলনীয়। অথচ তিনি ছিলেন একেবারে শিশুর মতো সরল এবং সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী এবং নিরভিমানী। তাঁরই জীবনে অভিব্যক্ত হয়েছিল দুর্লভতম ভক্তি এবং সেই কথা আমরা যখনই স্মরণ করি তখনই আমাদের মনে হয় যে তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের এক গৌরবময় দান। সেই সম্পদ আমরা যেন অবহেলায় না হারাই।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

'আমার আধ্যাত্মিক জীবন যেন নানা ফুলের একটি সাজি।'

এই কথা বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একটি ফুলের সাজির মধ্যে আমরা কি দেখি? দেখি সেখানে বিচিত্র বর্ণের ও নানা গন্ধের ফুলের নয়নলোভন সমাবেশ। সাজিটির সৌন্দর্য তো ঐসব ফুলের একত্রিত সমাবেশের জন্যই। তেমনি হিন্দুশাস্ত্রে যত কিছু ধর্মীয় ভাব ও আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার কথা উল্লিখিত হয়েছে সে সবই সাজির ফুলের মতো সুসমন্বিতভাবে রামকৃষ্ণের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর অলৌকিক আধ্যাত্মিক জীবনের এই যে বর্ণসুষমা তা পরিপূর্ণভাবেই ফুটে উঠেছিল তাঁর ষোলটি মানস-সন্তানের মধ্যে। এই যুগাবতারকে আমরা যদি একটি ফুলের সাজি বলে কল্পনা করি, তাহলে সেই দিব্য সাজির এক-একটি ফুল তাঁর এই এক-একটি চিহ্নিত সন্তান। সকলেই জানেন, তাঁর কোনো দুটি শিষ্য এক রকমের ছিলেন না—না আকৃতিতে, না প্রকৃতিতে। প্রত্যেকেরই ছিল অনন্যসাধারণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আর আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা। অথচ প্রত্যেকেরই প্রেরণার উৎস একজনই—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রত্যেককেই তিনি পৃথক পৃথক ধাঁচে তৈরি করেছিলেন। বড় সামান্য কারিগর ছিলেন না দক্ষিণেশ্বরের এই দেবমানব।

নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ ছিলেন রামকৃষ্ণ-সাজির বর্ণগন্ধভরা এইরকম একটি ফুল যার সৌরভ, কালের প্রান্তর অতিক্রম করে, আজো পৃথিবীর ধর্মপ্রাণ নর-নারীর চিত্তকে আমোদিত করে তোলে। প্রথম

দর্শনেই ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—'তুই নিত্যসিদ্ধের দলে। তুই রামচন্দ্রের ভাব নিয়ে জন্মেছিস।' নিত্যনিরঞ্জনের বয়স তখন আঠার বছর হবে যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথম এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনে। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর এই কিশোরটির সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন যেন সে তাঁর কতকালের চেনা। হাজার হোক, লীলাসহচর তো! সেদিন তাঁরই মুখে নিত্যনিরঞ্জন শুনেছিলেন তিন রকম ভক্তের কথা, যথা—সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ আর নিত্যসিদ্ধ। 'কেউ কেউ অনেক কষ্টে ক্ষেত্রে জল ছেঁচে আনে; আনতে পারলে ফসল হয়। এরা সাধনসিদ্ধ। আবার কারু জল ছেঁচতে হলো না। বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। কষ্ট করে জল আনতে হলো না। এরা কৃপাসিদ্ধ। মায়ার হাত থেকে এড়াতে গেলে কষ্ট করে সাধন করতে হয়। কৃপাসিদ্ধের কষ্ট করতে হয় না। সে কিন্তু দু' একজনা। আর যারা নিত্যসিদ্ধ, তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞানচৈতন্য হয়ে আছে। তাদের প্রথম অনুরাগ যখন লোকে দেখে, তখন অবাক হয়। বলে এত ভক্তি বৈরাগ্য প্রেম কোথায় ছিল।'

এই ভক্তি প্রেম আর বৈরাগ্য নিয়েই জন্মেছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

তাইতো শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই সন্তানটিকে প্রথম দেখেই নিত্যসিদ্ধ বলে চিনেছিলেন। নিত্যসিদ্ধরাই ঈশ্বরকোটি। তাঁর লীলাসহচরদের মধ্যে মাত্র ছয়জন এই দুর্লভ গৌরবের অধিকারী ছিলেন—নরেন, রাখাল, যোগীন, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও পূর্ণ।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দের পূর্ব-আশ্রমের অর্থাৎ সংসার জীবনের নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ; লোকে তাঁকে নিরঞ্জন বলেই ডাকতো। চব্বিশপরগণা জেলার রাজারহাট-বিষ্ণুপুর গ্রামে, আনুমানিক ১৮৬৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শৈশবাবধি তিনি থাকতেন কলকাতায় তাঁর জ্ঞাতি-খুড়া কালীকৃষ্ণ মিত্রের কাছে। এইখানেই তাঁর লেখাপড়া। বালক বয়সে তিনি প্রেততত্ত্ববাসীদের বা স্পিরি-

চুয়ালিস্টদের (Spiritualist) সঙ্গে খুব মেলামেশা করতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কলকাতায় শিক্ষিতদের মধ্যে একশ্রেণী স্পিরিচুয়ালিজমের খুব চর্চা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রামকৃষ্ণ সন্তানদের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন তিনি এই বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং অনুশীলনও করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিষয়টির উপর আলোকসম্পাত পূর্বক LIFE BEYOND DEATH নামে একটি জ্ঞানগর্ভ বইও লিখেছিলেন তিনি। এই ভূতুড়ে বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রণিধানযোগ্য।

কলকাতায় একটি বিশিষ্ট স্পিরিচুয়ালিষ্টদের চক্রে নিয়মিতভাবে যাওয়া-আসা করতেন কিশোর নিরঞ্জন এবং মাঝে মাঝে তিনি সেখানে 'মিডিয়াম' নির্বাচিত হতেন। তিনি খুব ভাল মিডিয়াম[১] ছিলেন। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার (psychic power) বিকাশ লক্ষ্য করা যেত এবং সেই শক্তির সহায়তায় তিনি আশ্চর্যভাবে লোককে রোগমুক্ত করতে পারতেন। কথিত আছে, এই শহরের একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি আঠারো বছর ধরে অনিদ্রা ব্যাধিতে ভুগছিলেন। অনেক চিকিৎসা করেও ফল পাননি। অবশেষে লোকমুখে নিরঞ্জন ঘোষের কথা শুনে রোগমুক্তির জন্য তিনি তাঁর শরণাপন্ন হন। পরবর্তীকালে এই ঘটনাটির উল্লেখ করে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলতেন : 'সেই ধনী ব্যক্তিটি আমার সহায়তায় রোগমুক্ত হতে পেরেছিল কিনা তা আমি জানি না। তবে এই উপলক্ষে আমার মধ্যে পার্থিব বিষয়ের অসারতা সম্পর্কে একটি বিচিত্র অনুভূতি জেগেছিল।

---

১ মিডিয়ম হওয়া মানে দেহ ও মনকে শূন্য করে অপর শক্তির কাছে বিলিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ দেহ ও মনকে কোন কিছু একটা শক্তির অধীনে থাকবার মতো করে তৈরি করা। কোন একটা বাইরের ভৌতিক শক্তি যা মিডিয়ামের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে তার কাছে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে সঁপে দেওয়া।

লোকমুখে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শুনে, একদিন বিকেলবেলায় তাঁর কয়েকজন স্পিরিচুয়ালিষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এলেন নিরঞ্জন। কথিত আছে, তাঁরা ঠাকুরকে 'মিডিয়ম হওয়ার' জন্য অনুরোধ করা মাত্র তিনি রাজী হন এবং সরল নিষ্পাপ শিশুর মতো তাদের সামনে বসেন। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তিনি বিরক্ত হয়ে আসন থেকে উঠে পড়েন ও অন্যত্র চলে যান। প্রেততত্ত্ববাদীরা তাঁর এই অদ্ভুত আচরণে অবাক হয় এবং তারাও চলে আসে। নিরঞ্জনও চলে আসেন কিন্তু তাঁর মন থেকে কিছুতেই মুছে যায়না রামকৃষ্ণের দিব্য মূর্তি। মাত্র কয়েক মিনিটের দর্শন, তথাপি তাঁর মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানর পক্ষে এটুকু দর্শনই যথেষ্ট ছিল। রাজোচিত আকৃতি ছিল নিরঞ্জনের—দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত কাঁধ আর সুগঠিত শরীর, শরীরে অপরিমেয় শক্তি। সমস্ত মুখখানি যেন সরলতায় উদ্ভাসিত।

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন তক্তপোষের উপর। ভক্তের দল মেঝেতে বসে ঘিরে আছে তাঁকে। তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলেন, ভক্তরা শুনছেন উৎকর্ণ হয়ে। সেই আসরে নিরঞ্জন এসে হাজির। ঘরের এক কোণে চুপটি করে বসে তিনি শুনতে থাকেন ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র রামকৃষ্ণের চকিত দৃষ্টি আগন্তুককে যেন একবার দেখে নিল। কী একটা দিব্য পরিবেশ বিরাজ করছে এখানে, মনে মনে অনুভব করেন নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। ঠাকুর বলছেন :

'ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধনের দরকার। আমাকে কঠোর সাধন করতে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে। চোখের জলে গা ভেসে যেতো! ঈশ্বরের ওপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। কিন্তু বড় কঠিন। নির্জন না হলে

ভগবান চিন্তা হয় না। ঈশ্বর সকলের মধ্যেই আছেন। সাধনের দ্বারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে।’[1]

মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল।

ঠাকুর অমনি নীরব হলেন। আলোচনা বন্ধ হলো।

ভক্তরা তাঁকে প্রণাম করে একে একে বিদায় নিলেন। রইলেন শুধু একজন। তিনি নিরঞ্জন। ঠাকুর তাঁকে কাছে ডাকলেন আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন এবং পরে বললেন; তুই সেদিন কতকগুলো ভূতুড়ে লোকদের সঙ্গে এসেছিলি। ওসব বিষয় বিশ্বাস করিস?

—করি।

—আর করবি না। তুই যদি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করিস, তা হলে ভূত-প্রেত হয়ে যাবি। আর যদি ঈশ্বরের কথা চিন্তা করিস, তখন দেখবি তোর জীবন ঈশ্বরময় হয়ে উঠবে। তোর কোনটা পছন্দ?

—শেষেরটা নিশ্চয়ই।

—তাহলে ওদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবি না, ওদের দলে মিশবি না।

—আজ্ঞে আপনি যা বলছেন তাই করব।

—তোর নাম নিরঞ্জন—কোনো অঞ্জন নেই তোর মধ্যে। মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন তুই এখানকার—তুই নিত্যসিদ্ধ।

এই বলে ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ করলেন। সেই দিব্য স্পর্শলাভ করে মুহূর্তমধ্যে নিরঞ্জনের মধ্যে কি একটা শক্তি সঞ্চারিত হয়ে গেল, তিনি বুঝতে পারলেন না। তারপর কত কথা বললেন তাঁকে। যেন তিনি রামকৃষ্ণের কতকালের পরিচিত। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে নেমেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন রাতটা তাঁকে সেখানে থেকে যেতে বললেন। কিন্তু কাকা চিন্তা করবেন বলে নিরঞ্জন রাজী

১ কথামৃত (২য় ভাগ)।

হলেন না ; তবে পুনরায় আসবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

সেই স্বল্পক্ষণের সাক্ষাৎকার যুবকের মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। সারা রাস্তা তিনি কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে, করতে ফিরলেন। বাড়িতে ফিরেও তাঁর সমস্ত চিন্তা জুড়ে রইলেন দক্ষিণেশ্বরের সেই অদ্ভুত মানুষটি। দু'তিনদিন পরের কথা। নিরঞ্জন আবার এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাঁর ঘরে একলা বসেছিলেন। নিরঞ্জন দরজার কাছাকাছি আসতেই তিনি ছুটে গিয়ে তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর হৃদয়ের গভীর ভাবের সঙ্গে তিনি বলতে থাকেন : 'ওরে দিন যে চলে যাচ্ছে, কখন ভগবানের কথা চিন্তা করবি ? তাঁকে যদি না পেলি, তাহলে সমস্ত জীবনটাই যে অর্থহীন হয়ে যাবে। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে কখন তাঁর আরাধনা করবি সেই চিন্তায় আমি যে অস্থির হয়েছি রে।'

নিরঞ্জনের মুখে কথা নেই।

বিস্ময়ে ভরে ওঠে তাঁর সমস্ত চিত্ত।

অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! মনে মনে ভাবেন তিনি। 'আমি ঈশ্বরকে লাভ করিনি, সেজন্য ওঁর এত চিন্তা-ভাবনা ! কে ইনি ?' যাই হোক, অমন দরদভরা কথা কিশোরের অন্তরকে গভীরভাবেই স্পর্শ করলো। সে রাতটি তিনি দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলেন। পরের দিন এবং তারপরের দিনটাও এক অব্যক্ত আনন্দের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয় সেখানে। কলকাতায় ফিরলেন তিনি চারদিন বাদে। ইতি-মধ্যে তাঁর কাকা দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরে এলে তাঁকে যারপর নাই ভর্ৎসনা করলেন এবং তাঁর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন যাতে নিরঞ্জন আর কোথাও না যেতে পারেন। পরে অবশ্য যখন ইচ্ছা দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য নিরঞ্জন অনুমতি লাভ করেছিলেন। অনুমান হয় ১৮৮১ সালের শেষভাগে অথবা ১৮৮২ সালের প্রথমভাগে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে থাকবেন।

বিবাহ করে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিরঞ্জনের চিন্তায় কখনো স্থান পায়নি। বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণা। যখন তাঁর আত্মীয়স্বজন বিয়ের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তখন নিরঞ্জনের সে কী আতঙ্ক। তাঁর মনে হতে লাগল কে যেন তাঁকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে। অতি পবিত্র আত্মার অধিকারী ছিলেন তিনি। তাইতো শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : নিরঞ্জনের চরিত্রে বিন্দুমাত্র মলিনতা স্পর্শ করেনি। তবে তাঁর মধ্যে ক্রোধের ভাবটা একটু প্রবল ছিল, যদিও হৃদয়টি তাঁর ছিল কোমলতায় পরিপূর্ণ। তবে রেগে গেলে তিনি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। একদিন হয়েছে কি তিনি একটা ফেরি নৌকো করে দক্ষিণেশ্বর আসছিলেন। নৌকোতে আরো কিছু যাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দা করছিল। সেই নিন্দাবাদ তাঁর কানে আসতেই নিরঞ্জন প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ নিষ্ফল হয়। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি নৌকাটি দু'হাত দিয়ে প্রবলভাবে দোলাতে লাগলেন এবং কটুভাষণ বন্ধ না হলে নৌকাটি ডুবিয়ে দেবেন বলে যাত্রীদেরকে ভয় দেখালেন। তাঁর সেই বলিষ্ঠ দেহ আর ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে নিন্দাকারীরা রীতিমত ভীত হয়ে উঠল এবং তাদের এই মন্দ আচরণের জন্য ক্ষমা চাইল। এই ঘটনাটির কথা যখন রামকৃষ্ণদেব জানতে পারলেন তখন তিনি নিরঞ্জনকে তাঁর ক্রুদ্ধ স্বভাবের জন্য ভৎ‍র্সনা করলেন এবং বললেন ; 'রাগ মহাপাপ—কেন তুই রাগের বশবর্তী হবি ? নির্বোধ লোকেরা তাদের অজ্ঞতার জন্য অনেক কিছু বলে থাকে—সেগুলি বিবেচনার যোগ্য নয় মনে করে একেবারে উপেক্ষা করা উচিত।' অথচ অনুরূপ ক্ষেত্রে স্বামী যোগানন্দকে ঠাকুর সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর সন্তানদের প্রকৃতি অনুসারে তিনি স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন।

১৮৮৪। নিরঞ্জন এখন বিশ বছরের যুবক। তাঁর খুল্লতাতের

সনির্বন্ধ অনুরোধে একটি সওদাগরি অফিসে তিনি একটি চাকরী নিলেন। চাকরীতে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল—অনিচ্ছা তো বটেই। কিন্তু বৃদ্ধা মায়ের জন্য তাঁকে চাকরী নিতে হয়েছিল। এই সংবাদে ঠাকুর যারপর নাই মর্মাহত হয়েছিলেন। কথিত আছে, তিনি বলেছিলেন, এর চেয়ে ওর মৃত্যুসংবাদ পেলে আমি দুঃখবোধ করতাম না। তারপর যখন সব ব্যাপারটা তিনি জানতে পারলেন তখন নিরঞ্জনের সাক্ষাতেই ঠাকুর এই মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন, 'তাহলে সব ঠিক আছে। মায়ের ভরণ-পোষণের জন্য চাকরী করছিস, এতে কোন দোষ তোর মনকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু যদি পেটের দায়ে চাকরী করতিস তা হলে তোকে আমি ছুঁতাম না। আমি ভাবতেই পারতাম না যে তুই এতটা নীচে নেমে যেতে পারিস।'

তাঁর মুখে এই রকম কথা শুনে একজন ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে তখন জিজ্ঞাসা করলেন: 'চাকরী করা কি অন্যায়? তা যদি হয়, তবে একজন লোক কেমন করে নিজের ও তার পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চালাবে?' তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: 'অন্যের যা খুশি ইচ্ছা করুক। আমি এইসব ছেলেদের জন্যই এই কথা বলি, কারণ এদের জাত আলাদা।' চাকরী নেবার কিছুকাল বাদে একদিনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। রবিবার। শ্রীরামকৃষ্ণ সকাল নয়টার মধ্যেই দক্ষিণেশ্বর থেকে কাঁকুড়গাছিতে সুরেন মিত্তিরের বাগানে এসেছেন। আজ এখানে মহোৎসব। নাম-সংকীর্তন হবে। কীর্তনীয়ারা এসেছেন। খুব ধুম-ধাম। অনেক ভক্তের সমাবেশ হয়েছে এখানে। আগে থেকেই নিরঞ্জনের জানা ছিল এই উৎসবের কথা। কথামৃতে ঘটনাটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে:

'কীর্তনান্তে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে একটু উপবেশন করিয়াছেন। এমন সময় নিরঞ্জন আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আনন্দে বিস্ফারিত লোচনে সস্মিত মুখে বলিয়া উঠিলেন, তুই এসেছিস!

'(মাস্টারের প্রতি)—ছাখো, এ ছোকরাটি বড় সরল। সরলতা পূর্ব জন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারী —এসব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা।

'শ্রীরামকৃষ্ণ (নিরঞ্জনের প্রতি)—ছাখ, তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস কিনা, তাই পড়েছে। আফিসের হিসাবপত্র করতে হয়—আরও নানা রকম কাজ আছে; সর্বদা ভাবতে হয়। সংসারী লোকেরা যেমন চাকরী করে তুইও চাকরী করছিস। তবে একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্য চাকরী স্বীকার করেছিস। মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ী স্বরূপা। যদি মাগ-ছেলের জন্যে চাকরী করতিস, তা'হলে আমি বলতুম ধিক্! ধিক্! শতধিক! একশ' ছি!'১

কিন্তু চাকরী তাঁকে বেশী দিন করতে হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যখন কাশীপুরে আনা হয় তখন যে কয়জন সেবক-সন্তান দিবারাত্র তাঁর সেবা-শুশ্রূষার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন নিরঞ্জন ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন। সন্তানদের আন্তরিক সেবা-যত্নের ফলে ঠাকুর রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠবেন, এই ছিল সেবকদের মনের আশা।

সেদিন কাশীপুর বাগান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার স্থান হয়ে উঠেছিল। কত তপস্যা, ধ্যান, সমাধি। তাঁর মহাসমাধির স্থান—সিদ্ধস্থান। কিন্তু এত প্রাণঢালা সেবা-পরিচর্যা সত্ত্বেও আনন্দের হাট ভেঙে গেল। ১৮৮৬, ১৬ আগস্ট রাত্রি দ্বিপ্রহরে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর সেবক-সন্তানগণ। তারপর কাশী-পুরের মহাশ্মশানে তার পুণ্য শরীরের সৎকারের পর, অস্থি-কলস মাথায় নিয়ে, নগ্ন পদে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলে কাশীপুরের

১ কথামৃত (১ম ভাগ)

বাগানে ফিরে এলেন। সমস্যা দেখা দিল এই অস্থি-কলস কোথায় রাখা হবে। আগস্ট মাসের পর কাশীপুরের বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। রামচন্দ্র দত্ত (ইনিই কাশীপুর বাগান বাড়ির ভাড়া বহন করতেন) বললেন তাঁর কাঁকুড়গাছির বাগানে ঐ অস্থি-কলস রেখে দেবেন। তখন রাত অনেক হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সেবক-সন্তানগণ নীরবে সেই অস্থি-কলসের চারদিকে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিলেন তখন নিরঞ্জন বললেন: 'আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত অস্থি কিছুতেই রামবাবুকে দিব না। আমাদের শরীরই তাঁর জীবন্ত সমাধিস্থান।' তখন তারই পরামর্শক্রমে পবিত্র অস্থির বেশীর ভাগ কলস থেকে বের করে একটি কৌটাতে রেখে সেই কৌটা বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে লুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর দৃশ্যপট উঠবে বরাহনগরে।

১৮৮৬ সালের আশ্বিন মাসে বরাহনগর-মঠের প্রতিষ্ঠা হলো একটি জীর্ণ ও পরিত্যক্ত বাড়িতে। সেবক সন্তানদের কেউই আর গৃহে ফিরে যান নি। তাঁদের ইষ্টদেবতার নাম নিয়ে ও তাঁর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করে ঠাকুরের ভাবে ও আদর্শে ত্যাগ-বিশুদ্ধ জীবন তাঁরা অতিবাহিত করবেন—এই ছিল তাঁদের সংকল্প। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: 'তখন সকলের জীবন অতিশয় দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনে সহায়-সম্বল করিয়া মনের আনন্দেই দিন যাপন করিতাম।' তাঁর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে নিরঞ্জনও এই দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরম সত্যের উপলব্ধির জন্য মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে সর্বদাই একটা স্বাধীনভাব বলবৎ এবং তারই তাড়নায় তিনি মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায়। তবে বরাহনগর মঠ এবং পরে আলমবাজার মঠ, অন্যান্য গুরুভাইদের মতো তাঁরও প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল।

বরাহনগর মঠে অসাধারণ একাগ্রতা সহকারে তিনি ঠাকুরের ভস্মাবশেষ অর্চনায় শশীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপর নিরঞ্জনের বিশ্বাস এমন জীবন্ত ছিল যার ফলে তিনি একটা স্বতন্ত্র শক্তি অর্জন করেছিলেন এবং সেই শক্তির দৌলতে তিনি সমস্ত পৃথিবীর নিন্দা বা স্তুতি কিছুই তাঁর গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। শুধু তাঁর চিন্তা-চেতনা নয়, তাঁর অস্থি-মজ্জা, দেহের শোণিতের প্রতিটি বিন্দু—সবই তখন রামকৃষ্ণময় হয়ে উঠেছিল। এইভাবেই তিনি বিশ্বময় প্রাণসত্তার দর্শন করতেন। গীতায় এই অবস্থাকেই ভগবান বলেছেন :

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ (৬।৩০)

চৈতন্য চরিতামৃতের কবি এই ভাবকেই প্রকাশ করে বলেছেন : 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' এই মহৎ ভাবটি তখন নিরঞ্জন মহারাজের মধ্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যদেশ জয় করে সগৌরবে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি প্রিয় গুরুভ্রাতাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কলম্বো পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন। পরে স্বামীজির উত্তরভারত পরিভ্রমণের সময় তিনি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। কিছুকাল তিনি তপস্যা করার জন্য কাশীতে গিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছিলেন এবং সেই সময় তিনি মাধুকরী দ্বারা আহার্যের সংস্থান করতেন। ভিক্ষান্ন পবিত্র—ঠাকুরের এই নির্দেশ তাঁর প্রত্যেকটি সন্ন্যাসী-সন্তানই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন।

শ্রীমার প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা স্বামী বিবেকানন্দকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামীজির একটি উক্তি স্মর্তব্য : 'শ্রীমায়ের সেবায় শরৎ ও বাবুরামের ভক্তি খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু নিরঞ্জনের মাতৃভক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। একবার শ্রীমা নিজের

হাতে রান্না করে নিজের হাতে তাকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। এ সৌভাগ্য আমাদের মধ্যে আর কারো জীবনে ঘটেনি। অতুলনীয় তাঁর মাতৃভক্তি এবং শুধু এই জন্যই আমি নিরঞ্জনের হাজারটা দোষ ক্ষমা করতে পারি।' অনুরূপ সাক্ষ্য ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রও দিয়েছেন। শ্রীমার ঐশী ক্ষমতা গোড়ার দিকে বিশেষ স্বীকৃতি পায়নি এবং গিরিশচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে, তিনি ঠাকুরকে যে রকম ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করতেন, শ্রীমার সম্পর্কে তাঁর মনে ঠিক ঐরকম ভাব ছিল না। 'নিরঞ্জনই আমার চোখ খুলে দিয়েছিল যখন সে একবার আমাকে জয়রামবাটি মাতাঠাকুরাণীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সেইখানে আমি কয়েক মাস তার সঙ্গে অবস্থান করে শ্রীশ্রীমায়ের প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছিলাম।' —এই স্বীকারোক্তি স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের। বস্তুত স্বামী নিরঞ্জনানন্দের প্রচারের ফলেই রামকৃষ্ণ সংঘে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল এবং বহু ভক্ত তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। মাতৃমহিমা প্রচারেই সার্থক তাঁর জীবন। এ বড়ো কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।

কোমলতা ও কঠোরতায় এক আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের এই 'ঈশ্বরকোটী' সন্তানটি। সত্যের জন্য তিনি কখনো আপোষ করতেন না। একবার কলকাতার এক ধনীব্যক্তি কাশীতে একটি শিবমন্দির তৈরি করেন। সেই সংবাদ শুনে স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্তব্যটি করেন: 'ভদ্রলোকটি দরিদ্রের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য যদি কিছু অর্থব্যয় করতেন তাহলে তিনি অমন হাজারটি শিবমন্দির নির্মাণের ফল পেতেন।' কথাটি ভদ্রলোকের কানে যায় ও মনেও লাগে। তখন কাশীতে সবেমাত্র রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পত্তন হয়েছে।* তিনি উৎসাহের বশবর্তী হয়ে সেবাশ্রমকে প্রচুর অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেলে প্রতিশ্রুত অর্থের এক-চতুর্থাংশ মাত্র দান করতে

এসেছিলেন। স্বামী নিরঞ্জানন্দ তখন এখানে অবস্থান করছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ তাঁর সত্যপরায়ণ মন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না। তিনি সেই ভদ্রলোকের দান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যদিও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেটা তখন কম ক্ষতির বিষয় ছিল না।

বস্তুত কোন একটি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের হিসাব-নিকাশ বহিরঙ্গ ঘটনার দ্বারা করা চলে না। তাঁর চারদিকে নিঃশব্দে তিনি যে পরিমাণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেন একমাত্র তাঁর দ্বারাই ব্যক্তিবিশেষের আধ্যাত্মিক মহিমার উচ্চতা পরিমাপ করা সম্ভব। বহুজনের জীবনেই স্বামী নিরঞ্জানন্দ স্বীয় জীবনের মুদ্রাঙ্কিত করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে বহুলোক ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে রামকৃষ্ণ-সংঘে যোগদান করেছিলেন। মোট কথা, স্বামী নিরঞ্জানন্দকে জানতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই উক্তিটি স্মরণ করতে হয়: 'আমার অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে নিরঞ্জন একজন।' ১৯০৪ সালে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে এই রামকৃষ্ণ-সন্তান মহা সমাধিলাভ করেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

মা দুর্গার বরে জন্ম ; তাই পিতামাতা নাম রেখেছিলেন সারদা।

সারদাপ্রসন্ন মিত্র।

ইনিই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ নামে পরিচিত।

চব্বিশ-পরগণার এক অভিজাত এবং সৎবংশে ১৮৬৫ সালের ৩০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সারদাপ্রসন্ন। বিদ্যালাভের জন্য বালক সারদাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্র হিসাবে তিনি খুবই দেদীপ্যমান ছিলেন এবং তাঁর চরিত্রগুণে তিনি সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন—ব্যবহার ছিল পরিশীলিত, আচরণ সুমিষ্ট। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি মেট্রোপলিটন স্কুলের শ্যামবাজার শাখায় চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। 'কথামৃত'কার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, রামকৃষ্ণ-সন্তানদের মধ্যে অনেকেই মাস্টার মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল থেকেই সারদাপ্রসন্ন যথাসময়ে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি বরাবর ভাল ছিলেন, তাই সকলেই—স্কুলের শিক্ষকগণ, বাড়ির আত্মীয়স্বজন এবং সহপাঠিগণ আশা করেছিলেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষাতে সারদা নিশ্চয়ই কৃতিত্ব প্রদর্শন করবেন এবং পারিতোষিক ও বৃত্তি লাভ করবেন। কিন্তু নিয়তি বাদ সাধল। পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে তাঁর সোনার ঘড়িটি চুরি গেল। অসতর্কতার ফলেই এটা ঘটেছিল। ঘড়িটি হারিয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর মন খুবই খারাপ হয়ে যায় ; কোন রকমে পরীক্ষা দিলেন মাত্র। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরুলো ; দ্বিতীয় ডিভিসনে পাশ করলেন। ফল

দেখে সবাই দুঃখিত হয়—এতটা নিরাশ হতে হবে কেউ তা ভাবতে পারেনি। সবচেয়ে দুঃখিত হয়েছিলেন সারদা নিজে—এত দুঃখিত যে কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি তাঁর এই শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে থাকেন।

মাস্টার মহাশয় খুবই স্নেহ করতেন সারদাকে। তাঁর প্রিয়তম ছাত্রটিকে এইভাবে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়তে দেখে তিনি একদিন (১৮৮৪, ২৭ ডিসেম্বর) তাঁকে সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এলেন। তুচ্ছ একটা সোনার ঘড়ি হারানোর ঘটনা পরোক্ষ কারণ হয়ে উঠেছিল ভবিষ্যতের বিরাট ঘটনা সমূহের। সারদার মতো একটি বিশুদ্ধ আত্মা তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরের সাধকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং অতঃপর অবকাশ পেলেই তিনি সেখানে যাওয়া আসা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই সারদার মধ্যে এক দুর্লভ ধর্মপ্রবণতা পরিলক্ষিত হতো। পূজা-অর্চনাতেই তিনি আনন্দ পেতেন বেশি। এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ দিতেন তাঁর বাবা ; দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় তিনি জপ-তপ নিয়েই থাকতেন। সাত-আট বছর বয়স থেকেই সারদা সংস্কৃত পড়তেন এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি এমন প্রখর ছিল যে ঐ বয়সেই তিনি শতাধিক সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করেছিলেন। সুললিত কণ্ঠে তিনি যখন ঐগুলি আবৃত্তি করতেন তখন সবাই শুনে মুগ্ধ হতো। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকে তাঁর ধর্ম-প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ঠাকুর তাঁর এই বালক ভক্তটির শিক্ষাদীক্ষার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

অভিজাত পরিবারের পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন সারদা ; তার ফলে তাঁর মনের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল সংসারে সব কাজ সকলের জন্য নয়—এমন কতকগুলি কাজ আছে যা শুধু বাড়ির চাকর-বাকরদের জন্যই নির্দিষ্ট। ঠাকুর তার এই আভিজাত্যের মূলে কিরকম কুঠারাঘাত করেছিলেন সেই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ্য।

এক গরমের দিনে সারদা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে কয়েকটি সমবয়সী বন্ধু। রামকৃষ্ণ তখন তাঁর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সারদা আসতেই তাকে বললেন: 'এক ঘটি জল এনে আমার পা দুটো ধুয়ে দে'।

পা ধুয়ে দিতে হবে। সারদার মন বিরূপ হয়ে ওঠে এই কথা শুনে। বন্ধুরা কাছে দাঁড়িয়ে, তারাই বা কি মনে ভাবছে। অপমানে সারদার সমস্ত মুখ লাল হয়ে ওঠে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

—কি রে পা ধুয়ে দিবিনে?

নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে সেই হীন কাজ করতে হলো।

আভিজাত্যের অহঙ্কার বিনষ্ট হয় চিরকালের মতো। সেবা ভাবের বীজ বপন করলেন ঠাকুর বালকের হৃদয়ে। একটি আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে যায় তার সমগ্র সত্তার মধ্যে।

সারদা ভর্তি হলেন মেট্রোপলিটন কলেজে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্র হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন। কিন্তু এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর যাওয়া-আসা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে পড়াশুনায় তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ দুই-ই হ্রাস পেতে থাকে। পিতামাতা স্বভাবতই উদ্বেগ বোধ করেন। তাঁরা ভাবলেন হয়ত ছেলের বিয়ে দিলে তার মনে পরিবর্ত্তন আসতে পারে, তাই তাঁকে না জানিয়েই বিয়ের সব ব্যবস্থা করা হয়। যেইমাত্র তিনি ব্যাপারটি জানতে পারলেন অমনি সারদা বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলেন। প্রথমে গেলেন ঠাকুরের কাছে। তিনি যে তাঁর পিতামাতার অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করেছেন ঠাকুরকে সে কথা গোপন করে শুধু জানালেন পদব্রজে পুরী যাওয়ার পরিকল্পনা। পুরীর পথে বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। একবার উপর্যুপরি দুদিন তিনি অনাহারে ছিলেন। ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত সারদা পায়ে হেঁটে চলেছেন পুরীর পথে। সন্ধ্যা হলো, ভাবলেন হয়ত কোন গ্রামে আশ্রয় মিলবে।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই একটা গভীর অরণ্যের মধ্যে এসে পড়লেন তিনি ; যতই অগ্রসর হতে থাকেন অরণ্য ততই নিবিড় হয়ে ওঠে। সেই অসহায় অবস্থায় রাত্রির মতো একটি গাছের মাথায় আশ্রয় নিলেন। বৃক্ষশাখায় যখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন কে যেন তাঁর নাম ধরে ডেকে তাঁকে কিছু আহার্য দিয়ে চলে গেল। পরের দিন সকালে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বনের মধ্যে কাউকে দেখা গেল না। মানুষের চিহ্নই নেই—তাহলে কে রাত্রিতে এসে তাঁকে খাবার দিয়ে গেল ?

ইতিমধ্যে সারদার পিতামাতা জানতে পেরে, পুরীর দিকে রওনা হন এবং মাঝপথ থেকে ছেলেকে ধরে বাড়ি নিয়ে আসেন। এফ.এ. পরীক্ষার তখন মাত্র একমাস বাকী। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে অনেক দিন সম্পর্ক না থাকলেও, একমাসের মধ্যেই সারদা পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য কাশীপুর বাগান-বাড়িতে রয়েছেন। রামকৃষ্ণকে ঘন ঘন দর্শন করাতে পিতার প্রবল আপত্তি ছিল, তাই ঠাকুরের পরিচর্যা করার জন্য কাশীপুরে এসে তিনি অবস্থান করতে পারেন নি, তবে সুযোগ পেলেই আসতেন ও সেবা করে কৃতার্থ হতেন। ঠাকুর অপ্রকট হওয়ার পর সারদার মধ্যে আবার জাগে পার্থিব বিষয় সম্পর্কে বৈরাগ্য। তখন থেকে প্রায়ই তিনি গৃহে অনুপস্থিত থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে তখন তাঁর মনের মধ্যে জেগেছে সংসার ত্যাগের তীব্র বাসনা। কিন্তু পিতামাতা আঘাত পাবেন মনে করেই তিনি বিরত থাকেন।

কোন অলৌকিক উপায়ে সারদার মনের গতি পরিবর্তন করার জন্য তাঁর অগ্রজ প্রচুর অর্থব্যয়ে দেড়মাস ধরে বাড়িতে একটি যজ্ঞ করালেন। যজ্ঞ শেষ হওয়ার পর, পুরোহিতগণ ঘোষণা করলেন যে, এই ছেলের মনের গতি পরিবর্তিত হওয়া কঠিন ; সন্ন্যাসী হওয়া তার বিধিলিপি। তথাপি তাঁর অগ্রজ নিরস্ত হলেন না ; কনিষ্ঠের

বৈরাগ্যের পথে নানাবিধ বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু যখন সব চেষ্টা নিস্ফল হলো, তখন সারদার অগ্রজ রামকৃষ্ণের শিষ্যদের ধরলেন যাতে সংসারে মতিগতি হয় অনুজের। এই কথা জানতে পেরে সারদা যারপরনাই বিরক্ত হলেন এবং বরাহনগর মঠে যোগদান করলেন। এখানেও কিন্তু আত্মীয়-স্বজন এসে তাঁকে বিরক্ত করতে থাকেন। এঁদের হাত এড়াবার জন্য তিনি পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। প্রসঙ্গান্তরে উল্লিখিত হয়েছে যে, এই বরাহনগর মঠে রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ বিধিমত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তখন প্রত্যেকেই সন্ন্যাস-জীবনের নাম গ্রহণ করেন। সারদার নাম হয় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে, সারদার নামটা তিন হাত লম্বা; ওর উচিত ছোট করা। তখন থেকে তিনি সংঘে ত্রিগুণাতীত বলেই সম্বোধিত হতেন।

আবাল্য তীর্থ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বামী ত্রিগুণাতীতের, কিন্তু স্বামীজির প্রতি আন্তরিক ভালবাসা বশতই তিনি মঠেই রয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে ১৮৯১ সালে তিনি তীর্থ পর্যটনে বেরুলেন এবং বৃন্দাবন, মথুরা, জয়পুর, আজমীর ও কাথিয়াবাড় ভ্রমণ করেন। পোরবন্দরে আকস্মিকভাবে স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তিনি তখন গুরুভাইদের অজ্ঞাতসারে পরিব্রাজক-জীবন যাপন করছিলেন। ফিরবার পথে আরো কয়েকটি স্থান দর্শন করে তিনি বরাহনগর মঠে ফিরলেন। কিছুকাল পরে, ১৮৯৫ সালে, স্বামী ত্রিগুণাতীতকে আবার তীর্থ পর্যটনে বেরুতে দেখা যায়। এইবার তিনি দুর্গম কৈলাস ও মানস সরোবরের যাত্রী হয়েছিলেন। দুর্গম হলেও তাঁর অপরাজেয় মানসিক শক্তি তাঁকে চালিত করতো। তখন জুন কি জুলাই মাস। সবে মাত্র বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। সেই দুর্গম প্রদেশে কঠোর শ্রমসাধ্য ভ্রমণ তাঁর সার্থক হয়েছিল যখন চারদিকের রমণীয় সৌন্দর্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

এই তীর্থ ভ্রমণকালে একাধিকবার তাঁর জীবন বিপদাপন্ন এবং প্রত্যেকবারই তিনি রহস্যজনকভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই অভিজ্ঞতা তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস দৃঢ়তর করে তুলেছিল।

তীর্থভ্রমণ শেষ করে স্বামী ত্রিগুণাতীত কিছুকাল কলকাতায় তাঁর এক ভক্তের বাড়িতে অবস্থান করেন এবং এই সময়টা তিনি গভীরভাবে শাস্ত্রাধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। দিনরাত তিনি বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকেন এবং কিছু কিছু সাহিত্যকর্ম করতেন। মাঝে মাঝে তিনি শহরের বিভিন্ন স্থানে শাস্ত্রপাঠের ক্লাস করতেন; অনেকেই সেই ক্লাসে যোগ দিতেন। কিছুকাল বাদে তিনি উঠে এলেন আলমবাজার মঠে। এখানেও সমানে চলতে থাকে শাস্ত্রাধ্যয়ন; এখানে তাঁর ঘরটি বইপত্তরে একেবারে ঠাসাঠাসি থাকত।

১৮৯৭। দিনাজপুর থেকে ভীষণ দুর্ভিক্ষের খবর এলো কলকাতায়। স্বামী ত্রিগুণাতীত সেখানে চলে গেলেন এবং সংকটত্রাণের ব্যবস্থা করলেন। এই ব্যাপারে তাঁর অত্যাশ্চর্য সেবাকার্যের দৃষ্টান্ত দেখে সবাই প্রশংসা করে। নিজে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করে, কখনো বা অনশনে থেকে, তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন। খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা। দিনের পর দিন তিনি মাত্র এক টুকরো ফল খেয়ে জীবন যাপন করতে পারতেন। আবার যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তা'হলে চারজন মানুষে হজম করতে পারে এত খাদ্য অনায়াসে খেতে পারতেন। একবার এক তীর্থস্থানে গিয়ে সেখানকার এক হোটেলে এমন খেলেন যে শেষ পর্যন্ত হোটেলওয়ালা হাতজোড় করে তাঁকে বলেছিল যে, মহারাজ, আর খেতে চাইবেন না; যা খেয়েছেন তার দাম দিতে হবে না আপনাকে। উত্তরকালে এই কাহিনীটি বলে তিনি খুব কৌতুকবোধ করতেন।

যুগাবতারের ভাবধারা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে এই সময় তিনি

একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা করেন। স্বামীজি তখন পাশ্চাত্য দেশে এবং সেইখান থেকেই তিনি তাঁর গুরুভ্রাতার এই উৎসাহকে অভিনন্দিত করেন ও আশীর্বাণী পাঠিয়ে দেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের এই আইডিয়া যখন বাস্তবে রূপায়িত হয় তখন মঠ আলমবাজার থেকে বেলুড়ে একটি ভাড়াবাড়িতে উঠে এসেছে। প্রস্তাবিত পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় অর্থ স্বামীজি পাঠিয়ে দিলেন। সেই টাকা দিয়ে একটি ছাপাখানা কেনা হলো এবং সমস্ত বিষয়টির দায়িত্ব স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর ন্যস্ত হলো। স্বামীজি পত্রিকার নামকরণ করলেন 'উদ্বোধন'; পত্রিকার সম্পাদক, প্রেসের ম্যানেজার—সবই একজন। তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীত। এজন্য তাঁকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল; খাওয়া-দাওয়া, এমন কি শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য-অসাচ্ছন্দ্য সব ভুলে গিয়ে তিনি পত্রিকা প্রকাশের কাজে নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করেছিলেন যা দেখে স্বামী সারদানন্দ একবার বলেছিলেন, 'সারদা নইলে এ কাজ আর কারো দ্বারা হতো?' সত্যি 'উদ্বোধন' তখন হয়ে উঠেছিল তাঁর সকল চিন্তার একমাত্র বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দ যখন এই পত্রিকা প্রকাশে তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতার পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকারের কথা জানতে পেরেছিলেন তখন তিনি এই মন্তব্যটি করেছিলেন: 'যিনি নিখিল মানবের কল্যাণের জন্য জীবন ধারণ করেছিলেন সেই প্রেমময় ঠাকুরের সন্তানের পক্ষেই এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হওয়া সম্ভব।'

এই 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রসঙ্গে মঠের সরকারী ইতিহাসে বলা হয়েছে:

'The year 1899 saw the birth, on January 14, of the Bengali fortnightly Udbodhan, under the editorship of Swami Trigunatita. It aimed at propagating the new message and was for a time

printed at its own press, purchased with the money provided by Swami Vivekananda, and published from 14 Ramchandra Maitra Lane, Kambuliatola, Calcutta. The journal converted into a monthly from its tenth year, became the nucleus of a publication centre of the Ramkrishna Math.'[১]

ত্রিগুণাতীতের সংগঠনশক্তির পরিচয় পেয়ে স্বামীজি তাঁকে আমেরিকাতে পাঠাতে চাইলেন। নেতার আদেশ পালনে ত্রিগুণাতীত সর্বদাই তৎপর ছিলেন। তাঁর ভারতীয় জীবনধারা হয়ত কিছুটা বিপর্যস্ত হতে পারে। তথাপি তিনি অতলান্তিক পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু সহসা বিনামেঘে বজ্রপাতের তুল্য ১৯০২ সালের ৪ জুলাই বেলুড় মঠের চূড়া ভেঙে পড়ল—স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রয়াণ করলেন। এর ফলে স্বামী ত্রিগুণাতীতের আমেরিকা যাত্রা একটু বিলম্বিত হয়েছিল। কয়েক মাস পরে, প্রশান্ত মহাসমুদ্র হয়ে তিনি আমেরিকা যাত্রা করলেন এবং ১৯০৩ সালের নববর্ষের প্রথমেই স্যান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছলেন। শুরু হয় তরুণ সন্ন্যাসীর জীবনে এক নতুন অধ্যায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর। প্রাচ্য দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়েই তিনি ঐ দেশে গিয়েছিলেন আর যতদিন ছিলেন সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্যই গ্রহণ করতেন। কোন অসুবিধা হতো না, কারণ আমেরিকাতে এসে তিনি দেখতে পেলেন যে, এখানে শাক-সব্জী অপর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মায়। শ্রীরামকৃষ্ণের আর একজন প্রত্যক্ষ শিষ্য এসেছেন—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার

১. HISTORY OF THE RAMAKRISHNA MATH AND MISSION : Swami Gambhirananda.

সঙ্গে সঙ্গে স্যান ফ্রান্সিসকো বেদান্ত সমিতির সভ্য ও সভ্যাদের মধ্যে উৎসাহ-আগ্রহের ঢেউ বয়ে যায়। দেখতে দেখতে নবাগত সন্ন্যাসীর সময় কর্মপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। ক্লাস সংগঠন, রবিবাসরীয় বৈকালিক লেকচার—সবই নিয়মিত আরম্ভ করে দিয়েছিলেন তিনি। কিছুকাল বাদে সনির্বন্ধ আহ্বান এলো দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার লস এঞ্জেলস শহরের ধর্মপ্রাণ নরনারীদের কাছ থেকে। জায়গাটি স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে চারশো পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এখানে তিনি বেদান্ত সমিতির একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। পরে এই কেন্দ্রের দায়িত্ব অপর একটি সন্ন্যাসীর ওপর ন্যস্ত হয়।

১৯০৪। স্যান ফ্রান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটির কাজ এমন বৃদ্ধি পায় যে, সমিতির জন্য একটি নিজস্ব ভবনের প্রয়োজন হয়। ত্রিগুণাতীত যা চিন্তা করতেন তা বাস্তবে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হতেন না। তৎক্ষণাৎ গঠিত হয় একটি কমিটি; সেই কমিটির উপর একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তারপর সমিতির সভ্যদের একটি সভা ডাকা হলো, চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হলো এবং শীঘ্রই সমিতির নামে একখণ্ড জমি ক্রয় করা হয়। ভবনের পরিকল্পনাটি তৈরি করলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত স্বয়ং। একটি হিন্দু মন্দিরের আকারেই পরিকল্পনাটি প্রস্তুত হয়। পাশ্চাত্য দেশের মাটিতে সেই প্রথম হিন্দু মন্দির। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় অর্থ চাঁদা তুলে সংগৃহীত হয়েছিল; সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ধনী, দরিদ্র, বৃদ্ধ, তরুণ সকলেই অকাতরে অর্থদান করেছিল। ১৯০৬, ৭ জানুয়ারি সর্বজনসমক্ষে মন্দিরটি মানবকল্যাণে উৎসর্গ করা হয়। আমেরিকাতে এই মন্দিরটি তাঁর প্রধান কর্মকীর্তি।•

কিছুকাল বাদে বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে একটি মঠ (Monastery) স্থাপনের কথা তিনি চিন্তা করলেন। সোসাইটিতে

কিছুসংখ্যক তরুণ নিয়মিত লেকচার শুনতে আসত ; তারা ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করে মঠে থাকার অভিলাষ প্রকাশ করতেই স্বামী ত্রিগুণাতীতের সে কী আনন্দ। ঠাকুরের ভাবধারা, তাঁর আদর্শ পাশ্চাত্য দেশের নর-নারী একদিন গ্রহণ করবে—এই স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামীজি চিকাগোর ধর্মমহাসভার মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে। তেরো বছরের মধ্যেই তাঁর সেই স্বপ্নকে রূপায়িত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রমুখ তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতাগণ। মঠের ব্রহ্মচারীদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হতো : প্রত্যুষে উঠে ধ্যানে বসা, মঠের যাবতীয় কাজ নিজের হাতে সম্পন্ন করা, সকাল-সন্ধ্যা সমবেত প্রার্থনা, মধ্যাহ্নে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ—এইসব কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরে সম্পন্ন হতো এবং এর ফলে তাদের দেহমন পবিত্র থাকত। কখনো কখনো স্বামী ত্রিগুণাতীত মন্দিরের তরুণ ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে প্রত্যুষে অর্ধমাইল দূরবর্তী স্থান ফ্রান্সিসকো উপসাগরের তীরে যেতেন ও সেইখানে তাদের দিয়ে ধ্যান ও গানের মাধ্যমে উপাসনা করাতেন। সেই নির্জন শান্ত পরিবেশে সমবেত কণ্ঠ থেকে উত্থিত সুললিত সংগীতের ঝঙ্কার, সংস্কৃত স্তোত্র ও প্রার্থনা, আমরা কল্পনা করতে পারি, উপকূলস্থ নাবিক ও ধীবরদের হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় ভাব জাগিয়ে তুলতো।

সত্যিকার আধ্যাত্মিক আস্পৃহা যে শিষ্যের মধ্যে তিনি দেখতে পেতেন তাকে তিনি বলতেন : 'যদি তোমার শরীরের প্রত্যেকটি হাড় আমি ভেঙে দিই সেজন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখবোধ করব না যদি তার ফলে আমি তোমাকে অমৃত সাগর তীরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারি। তাহলেই আমার কাজ শেষ।' কখনো কখনো তরুণরা তাঁর নিয়মানুবর্তিতার অধীনে তপস্বীর মত জীবন যাপন করার অভিপ্রায় জানাত। তাদের মধ্যে অনেকেই সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবন পাঠ করে এতদূর অনুপ্রাণিত হয়েছিল যে তাদের

মনশ্চক্ষে নির্জন সন্ন্যাস-জীবনের বহুবিধ দুশ্চর তপশ্চর্যার চিত্র ফুটে উঠতো। এই শ্রেণীর তরুণদের তিনি কিছুকাল মঠে অবস্থানপূর্বক নির্জন জীবনের উপযোগী করে তোলার উপদেশ দিতেন। তাঁর ট্রেনিং দেবার পদ্ধতি ছিল অতি সুন্দর। কিছু সংখ্যক মহিলা শিষ্যাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাদের জন্য তিনি একটি স্বতন্ত্র আশ্রম (Nunnery) স্থাপন করেছিলেন। ভবিষ্যতে আমেরিকার ধর্ম-প্রাণ মেয়েদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে এই আশ্রমটি সহায়ক হবে, এই আশা তিনি তাঁর মনের মধ্যে পোষণ করতেন। ১৯০৯ সালে তিনি VOICE OF FREEDOM নামে একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন। যাঁরা তার বক্তৃতাসভায় যোগদান করতে পারত না অথবা যারা দূরে থাকত—তাদের পক্ষে এই মাসিক পত্রিকাটি খুবই উপযোগী হয়েছিল। বেদান্ত দর্শনের উচ্চ সত্য আদর্শগুলিই তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করতেন।

আমেরিকায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের সাফল্যমণ্ডিত প্রচার কার্য সম্পর্কে স্বামী অতুলানন্দ এই সাক্ষ্য দিয়েছেন: 'A year or so, after Swami Turiyananda had left America, Swami Trigunatita came from India to carry on the Vedanta propaganda in California.'

মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে শান্তি আশ্রমে যেতেন। অধ্যাত্ম সাধনার উপযোগী এমন সুন্দর স্থান আমেরিকাতে আর দ্বিতীয়টি নেই। হিমালয়ের পাদমূলে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের আশ্রমের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এই শান্তি আশ্রম। স্বামী ত্রিগুণা-তীতের সময় এর সমধিক উন্নতি হয়েছিল।

১৯১৪, ডিসেম্বর। স্যান ফ্রান্সিসকোর মন্দিরে বড়দিনের উৎসব প্রতিপালিত হয় সাড়ম্বরে। এর ঠিক তিন দিন বাদে মন্দিরে বেদীর উপর দাঁড়িয়ে রবিবাসরীয় প্রার্থনায় স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন তন্ময় ছিলেন সেই সময় তাঁরই এক শিষ্যের বোমার আঘাতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন এবং ১৯১৫, ১০ জানুয়ারি তাঁর জীবনাবসান ঘটে সেই দিনটি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন।

স্বামী সুবোধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের মধ্যে বয়সে যিনি সবচেয়ে ছোট তিনিই সংঘে স্বামী সুবোধানন্দ বা খোকা মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সুবোধচন্দ্র ঘোষ। ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরের[১] প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর ঘোষের বংশে তিনি ১৮৬৭, ৮ নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। এই কালীমন্দিরের দেওয়ালে একটি শিলা-লিপিতে খোদাই করা আছে—'শঙ্করের হৃদিমাঝে সদা কালী বিরাজে।' তাঁর পিতা যেমন একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন তেমনি শাস্ত্রগ্রন্থ ও ধর্মীয় পুস্তক পাঠে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তাঁর মা-ও ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণা মহিলা। সুবোধচন্দ্রের ধর্মজীবন গঠনে তাঁর পিতামাতার প্রভাব বড় কম ছিল না। ছেলেবেলায় তিনি মায়ের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনতেন—শুনতেন ভাগবত-পুরাণের কত গল্প। এর ফলে শৈশবেই বালকের মনে জেগেছিল ঈশ্বর-ভক্তি আর সত্যের প্রতি অনুরাগ। এই বয়সেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো তীব্র বৈরাগ্যের ভাব এবং বালকের মনে একটা অস্পষ্ট ভাব জাগত যে তিনি যেন এই সংসারের নন তাঁর জন্য নয় সংসারী জীবন। বয়োপ্রাপ্ত হলে যখন বিয়ে করার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করা হয়, তখন তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন যে, তিনি একজন ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবেন ঠিক করেছেন;

---

১ দক্ষিণ কলকাতায় বাহান্ন পীঠের অন্যতম পীঠস্থান কালীমন্দিরের তুল্যই সেকালে উত্তর কলকাতার এই ঠনঠনিয়া কালীমন্দিরের খ্যাতি ছিল। রামকৃষ্ণ বহুবার এখানে এসেছেন।

কাজেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না। পিতামাতা কিন্তু ছেলের বিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন; স্কুলে ক্লাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই তার বিয়ে হওয়ার কথা। সুবোধ ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন তাঁর পরীক্ষার ফল যেন খারাপ হয়। ভগবান বালকের প্রার্থনা শুনলেন। তিনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন, ক্লাস প্রোমোশন পেলেন না। সুবোধ প্রথমে ছিলেন হেয়ার স্কুলের ছাত্র এবং তারপর তাঁকে বিদ্যাসাগরের মেট্রো-পলিটান স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল।

দৈবক্রমে এইসময়ে একদিন সুবোধের হাতে একখানি বই এলো। বইটির নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ'; লেখক—সুরেশচন্দ্র দত্ত। বইটি তাঁর বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন তিনি। বইটি পাঠ করে তিনি এতদূর মুগ্ধ হন যে রামকৃষ্ণকে একবার দেখবার জন্য তাঁর মনের মধ্যে জেগে ওঠে একটা প্রবল আগ্রহ। পড়তে পড়তে কয়েকটি কথা গেঁথে যায় তাঁর মনের মধ্যে :

সত্য কথাই কলির তপস্যা।

কামিনী-কাঞ্চনই মায়া।

এই জগৎ মিথ্যা নয় —তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন।

আমি-জ্ঞান চলে গেলেই ঈশ্বর দর্শন হয়। ষোল-আনা মন না দিলে ঈশ্বরের পূর্ণ দর্শন কখনো হয় না।

ঈশ্বরকে অন্তরে-বাহিরে পূজা করতে হয়।

অবিদ্যা মানুষকে সংসারে মুগ্ধ করে। বিদ্যাশক্তি থেকে বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান ও প্রেম সবই হয়।

সকাল ও সন্ধ্যায় জপ-ধ্যান করলে মন পরিষ্কার থাকে, ময়লা জমে না। সেই মনে ভগবানের রূপ ফুটে ওঠে।

কী সুন্দর উপদেশ! সুবোধচন্দ্রের মন বলে ইনি নিশ্চয়ই মানুষ নন, ইনি দেবতা। সেই দেবতাকে একটিবার দেখবার জন্য উতলা হলেন তিনি। একদিন বাবাকে বললেন তাঁর মনের কথা। 'বেশ

তো। একটা ছুটির দিনে তোকে নিয়ে যাব দক্ষিণেশ্বরে।' এই কথায় কিশোরের মন আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু তাঁর যেন আর দেরী সয় না। ১৮৮৪। জুন মাস। গরমের দিন। একদিন বাড়ির কাউকে না জানিয়ে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে সুবোধ যাত্রা করলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। এতটা পথ পায়ে হেঁটেই চললেন। সেখানে পৌছতেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরম স্নেহভরে গ্রহণ করেন তাঁকে এবং হাত ধরে তাঁর পাশে বসালেন। সাধু মানুষের বিছানায় বসতে সুবোধ ইতস্তত করেন। কিন্তু নিকট আত্মীয়ের মতো ঠাকুর তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন যে তাঁর সকল সংকোচ দূর হয়ে যায়। তাঁকে পাশে বসিয়ে ঠাকুর শুরু করেন কথাবার্তা।

—তোদের বাড়ি আমি মাঝে মাঝে গেছি।

—আমাদের বাড়ি?

—হ্যাঁ রে। তোর বাবা-মাকেও চিনি। তোদের ঠনঠনের কালীমন্দিরে। কতবার গেছি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। তুই যে হেথা আসবি তা আমি আগে থেকেই জানতাম।

তারপর সুবোধের ডান হাতখানি ধরে তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান করলেন। ধ্যানের পর তাকে বললেন, 'তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যারা যারা মায়ের কৃপালাভ করবে তিনি এক-এক করে তাদের সবাইকে এখানে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই যে তুই এলি এ তোর ইচ্ছেতে নয়, মায়ের ইচ্ছায় ঘটছে।'

প্রসাদী মিষ্টি একটু খেতে দিলেন। তারপর বিদায়ের বেলায় সেই তাঁর চিরাভ্যস্ত রীতিতে ঠাকুর বলেন: 'আবার আসিস। শনি-মঙ্গলবারে আসবি।'

—আসা কঠিন। এখানে আসার কথা যদি মা-বাবা জানতে পারেন তাঁরা আপত্তি করবেন।

সেদিন ঐ পর্যন্ত।

পরের শনিবারে স্কুল থেকে পালিয়ে তাঁর সেই বন্ধুটির সঙ্গে সুবোধচন্দ্র আবার এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এই দর্শনটি ছিল কিশোরের জীবনে স্মরণীয় দর্শন। তাকে তাঁর ডান পাশে বসিয়ে ডান হাতখানি সুবোধের কাঁধে রেখেই ঠাকুর উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তারপর তার নাভি থেকে গলাপর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিয়ে তাঁর জিভে কিসব লিখে দিলেন আর সেই সময় তাঁর সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ঃ 'জাগো মা কুণ্ডলিনী।' তখন তিনি কিশোরকে ধ্যান করতে বললেন। ধ্যান শুরু হতেই সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে এবং তার মনে হলো মেরুদণ্ড দিয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত কি যেন একটা শক্তি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অমনি এক অব্যক্ত আনন্দের মধ্যে ডুবে যায় কিশোর—এক আশ্চর্য আলোর মধ্যে ফুটে ওঠে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি এবং পরমুহূর্তেই মূর্ত্তিগুলি মিলিয়ে যায় অনন্তের মধ্যে। দেখতে দেখতে ধ্যান গভীর হয়ে ওঠে এবং সুবোধচন্দ্র হারিয়ে ফেললেন সমস্ত বাহ্যিক চৈতন্য। যখন তিনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন, তখন দেখতে পেলেন ঠাকুর বিপরীত দিকে তাঁর অঙ্গ সঞ্চালন করছিলেন।

—তোর ধ্যানের বহর দেখে আমি খুশি হয়েছি।

—ছেলেবেলা থেকেই আমি বাড়িতে ধ্যানের অভ্যাস করে আসছি।

—কার কাছে শিখলি?

—বাবার কাছে। আর মায়ের মুখে যেসব দেব-দেবীর গল্প শুনতাম তাঁদের কথা চিন্তা করতাম।

এই দর্শনের পর সুবোধ তাঁর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে এক প্রকার আশ্চর্য জ্যোতি দেখতে পেতেন। মায়ের কাছে এই কথা বলতেই তিনি এই বিষয় কাউকে না বলতে ছেলেকে নিষেধ করে দিলেন। 'কেন

মা, বললে ক্ষতি কি? আমি তো এই আলো চাইনা—চাই আলোর উৎসকে।' ছেলের মুখে এই রকম কথা শুনে মা অবাক হয়ে যান।

ছেলেবেলা থেকেই সুবোধ সরল এবং স্পষ্টবাদী। তাঁর মন-মুখ এক ছিল। তাঁর সমগ্র জীবনে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতো। যা তিনি অনুভব করতে বা বুঝতেন কিছুমাত্র না রেখে-ঢেকে তা বলতেন। গোপনতা জিনিসটা তাঁর স্বভাব থেকে বহুদূরে ছিল। একদিন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আমাকে তোর কি বোধ হয়?'

—অনেক লোক অনেক কথা বলে থাকে আপনার সম্পর্কে। আমি নিজে যতক্ষণ না পরিষ্কার প্রমাণ পাচ্ছি ততক্ষণ ওসব বিশ্বাস করব না।

স্পষ্ট ভাষণ ছিল তাঁর প্রকৃতির একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। এরই একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ্য। একদিন কথায় কথায় ঠাকুর সুবোধকে বলেছিলেন, যখনই সময় পাবে তখনই সে যেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে ('কথামৃত'কার শ্রীম) যায়; তিনি তাদের বাড়ির কাছেই বাস করেন। কথিত আছে, ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনে সুবোধ বলছিলেন: 'তিনি তো এখনো পর্যন্ত সংসারের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন নি, তাঁর কাছ থেকে ঈশ্বরের কথা আবার কি শুনবো?' এই উত্তর শুনে ঠাকুর মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলেন তাঁর এই সন্তানটির মধ্যে ত্যাগের একটা সহজভাব প্রত্যক্ষ করে।

—যেতে দোষ কি রে? তিনি তো আর নিজকথা কিছু বলবেন না। এখানে তিনি নিয়মিত আসেন। তাই এখানে যা শিখেছেন তাই তোকে শোনাবেন।'

—বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন যাব।

একদিন সুবোধ এলেন গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে, মাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে। কিশোরের সরলতায় মুগ্ধ হন তিনি। বলেন:

'আমি একজন নগণ্য ব্যক্তি। আমি এক মহাসাগরের পাশে বাস করি। আমার কাছে থাকে দুই-এক কলস সেই মহাসাগরের বারি। আমার কাছে যে আসে আমি তাকে সেই অমৃতবারি দিয়ে অভ্যর্থনা করি। আমি কী জানি, আর কীই বা বলব?' তাঁর নম্র ও সুমিষ্ট ব্যবহারের গুণে সুবোধ মাস্টার মহাশয়ের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই থেকে তিনি সময় পেলে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতেন এবং তার মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঠাকুরের কথা শুনতেন।

ধর্মজীবনে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করবার জন্য অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে কার কিভাবে এবং কতখানি প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, অনন্ত ভাবময় ঠাকুর তা প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করতেন এবং সেইজন্যই এক-একজনকে এক-এক ভাবে গড়ে তুলেছিলেন। দক্ষ কারিগর ছিলেন তিনি, সন্দেহ নেই। সে গঠনের কালে নির্বিচারে তাঁর আদেশ ও উপদেশ পালন করা ভিন্ন তাঁদের অন্য কিছু করবার ছিল না। আবার সে আদেশ-পালনও যে তাঁদের আত্মাভিরুচির উপর নির্ভর করত এমন নয়! তা এ ান্তভাবে নির্ভর করতো একজনের ইচ্ছার উপর। তিনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যাকে দিয়ে জপ করিয়ে নিতেন, ধ্যান করিয়ে নিতেন, জ্ঞান-সঞ্চয়ের জন্য যাকে দিয়ে বহু অধ্যয়ন করাইয়া নিতেন—সেই সন্তানই শুধু সেই রকমটি করতে পারতেন, আর কেউ নয়। মোট কথা, সকলের সকল রকম ভাব ধারার এবং তাদেরকে নিজনিজ পথে পরিচালিত করবার বিচিত্র শক্তি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের।

একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, নিজের সুকৃতিবলে ও ভগবানের কৃপায় স্বামী সুবোধানন্দ এমন একজন গুরু পেয়েছিলেন, যিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ যুগাবতার—বলতে গেলে যিনি ছিলেন পূর্ববর্তী সকল অবতারের সুসমন্বিত ভাবঘন মূর্তি। তাঁর

নিজ হাতে তৈরী সন্তানদের মুখ দিয়ে মহাসমন্বয়ের বাণী প্রচার করবার জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর প্রখর যুক্তি ও বিজ্ঞানের যুগে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। এই আবির্ভাব ছিল ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে একটি সুমহৎ আবির্ভাব। একটি আশ্চর্য প্রকাশ।

দিন যায়। ঠাকুরের প্রতি তরুণ সুবোধের আকর্ষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। তারপর ঠাকুর যখন অপ্রকট হলেন তখন তিনি সংসার ত্যাগ করে বরাহনগর মঠে যোগদান করেন। এইখানে তিনি বিধিমত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; তখন তাঁর নাম হয় স্বামী সুবোধানন্দ। কিন্তু যে:হেতু তিনি সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ সেইজন্য এবং অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 'খোকা' বলে ডাকতেন এবং গুরুভাইরা ঐ নামেই তাঁকে সম্বোধন করতেন। উত্তরকালে রামকৃষ্ণ-সংঘে তিনি 'খোকা মহারাজ' এই নামে অভিহিত হতেন। ১৮৮৯, ডিসেম্বর মাস। তীর্থ ভ্রমণে যাবেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজি মহারাজের সহচররূপে সুবোধা-নন্দকে পাঠালেন তাঁর সঙ্গে। তাঁরা বৈদ্যনাথ দর্শনান্তে বারাণসীতে উপস্থিত হলেন। এবং সেইখানে কয়েকমাস তপস্যা করেন। সেখান থেকে একে একে নর্মদা, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থদর্শন করে তাঁরা বৃন্দাবনে এসে উপনীত হলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বৃন্দাবনে রয়ে গেলেন আর স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের অনুমতি নিয়ে উত্তরাখণ্ড যাত্রা করেন। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রামকৃষ্ণ-সন্তানগণের প্রায় সকলেই তীর্থ দর্শনে গিয়েছেন ও সেখানে তপস্যা করেছেন।

স্বামীজি পাশ্চাত্যদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করেই তাঁর গুরু-ভ্রাতাদের বলেছিলেন যে, নির্জন সাধনায় জীবন অতিবাহিত না করে তাঁরা সকলেই যেন ঠাকুরের বাণী প্রচার এবং মানব-কল্যাণ কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সেদিন যাঁরা এই সুমহৎ কর্মে অগ্রণী হয়েছিলেন, স্বামী সুবোধানন্দ

ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন। তখন থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের লক্ষ্য সাধনে তিনি নানাবিধ সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৯। কলকাতায় মহামারীরূপে প্লেগ দেখা দিল। রামকৃষ্ণ মিশন প্লেগ-আক্রান্তদের সেবায় নামলেন। সেই সময়ে সুবোধানন্দ নিজের জীবন বিপন্ন করেও ঝাড়ু ও বালতি হাতে কলকাতার রাস্তায় কাজ করেছেন। ১৯০৮ সালে উড়িষ্যার চিল্কা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হলো। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাদল বাহিনীকে সেখানেও দেখা গেল। এইখানে এসে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীর দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে স্বামী সুবোধানন্দের কোমল প্রাণে খুবই আঘাত লেগেছিল। তিনি এই দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ কার্যে নিজের জীবন তুচ্ছ করে প্রাণ-মন উৎসর্গ করেছিলেন। বাংলা ও বিহারের বহু স্থানে মিশনের পক্ষ থেকে যে কোন ত্রাণ কার্যে তাঁর সংগঠনী শক্তি দেখে গুরুভ্রাতাগণ বিস্ময়বোধ করতেন।

১৯০১ সালে, তাঁর মহাপ্রয়াণের অল্পকাল পূর্বে, স্বামীজি যখন একটি বিধিসম্মত অর্পণনামা বা 'ট্রাস্ট ডীড' সম্পাদন পূর্বক বেলুড়মঠ তাঁর গুরুভ্রাতাদের হস্তে অর্পণ করেন তখন ট্রাস্টিদের মধ্যে স্বামী সুবোধানন্দ ছিলেন একজন। পরে তিনি মঠ ও মিশনের ট্রেজারার পদে নির্বাচিত হন। ইস্টদেবতার পরেই তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা তিনি অর্পণ করেছিলেন স্বামীজিকে—স্বামীজির প্রতি তিনি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন বলেই না যখন তিনি মিশনের পক্ষ থেকে প্রচার অভিযানে বহির্গত হতেন তখন সুবোধানন্দ যুগপৎ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করতেন অক্লান্ত ভাবে। বেলুড় মঠে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের সুন্দর চিত্র পাই মঠের এক প্রাচীন সন্ন্যাসীর স্মৃতি কথায়। তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

'তখন মঠের অফিস ও লাইব্রেরি স্বামীজির ঘরের পশ্চিমে বড় ঘরে ছিল। আমাদের তখন ঐ অফিসের ও লাইব্রেরির কিছু কিছু

কাজ করিতে হইত বলিয়া আমরা অধিকাংশ সময়ই উপরে পূজনীয় খোকা মহারাজের ঘরের নিকটেই থাকিতাম। রাত্রেও নীচে শুইবার স্থানাভাবে খোকা মহারাজের ঘর ও স্বামীজির ঘরের মাঝের ছোট বারান্দাতেই আমাদের শুইতে হইত। কিন্তু তাঁহার এত নিকটে থাকিয়াও সে সময়ে আমরা তাঁহার বিশেষত্ব বা মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই। তিনি বাস্তবিক শিশুর মতনই ছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গেই বসিয়া খাইতেন ও সকল বিষয়ে আমাদের মতনই ব্যবহার করিতেন। ছোট একটি জামা ও ছোট একটি কাপড় পরিতেন ও নিজেই উহা পরিষ্কার করিতেন। তখন তাঁহার কোনও সেবক ছিল না। তিনি দিনে ও রাত্রে অতি অল্পই খাইতেন। যদি কোনও ভক্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতেন, কি খাওয়াবে? ভক্তটি হয়তো বিনয়বশতঃ বলিতেন, কি আর খাওয়াব। শুধু চারটি ডাল আর ভাত। তিনি যথাসময়ে সেখানে গিয়া আহারে বসিতেন ও তাঁহার থালায় নানাবিধ পঞ্চব্যঞ্জনাদি থাকিলেও তিনি তাহার কিছুই স্পর্শ করিতেন না। শুধু ডালভাত খাইয়াই চলিয়া আসিতেন। ভক্তটি অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও তাঁহার ইহাতে অন্যথা হইত না। তিনি বলিতেন, কথার সত্যতা রাখিতে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের এই শিক্ষা দিয়াছেন।'[১]

স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অনেকেই পূর্ববঙ্গে গিয়ে ঠাকুরের ভাবধারা প্রচার করে এসেছেন। স্বামী সুবোধানন্দও দুইবার পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। প্রথমবার গিয়ে ঢাকা বালিয়াটি গ্রামে তদানীন্তন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তার ১৯২৬ সালে তিনি আবার কয়েকজন সাধু নিয়ে ঢাকা মঠে আসেন। তারপর কয়েকদিন বাদে সোনারগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কয়েকজন সন্ন্যাসীদের নিয়ে সেখানে

---

১. পুণ্যস্মৃতি: স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ।

রওনা হন। পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে সেখানকার মন্দিরে তাঁরই পবিত্র হস্তে শ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ দিন বৈকালে এক জনসভায় তিনি 'যতমত ততপথ' এই আদর্শটি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। সকলেই তাঁর সেই বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন।

সোনার গাঁ থেকে ফিরে আসার পর অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁর শরীর ভেঙে পড়ায় স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে তিনি কাশী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে চিকিৎসকগণ রোগ নির্ণয় করে ঘোষণা করেন যে, খোকা মহারাজের শরীরে ক্ষয় রোগ প্রবেশ করেছে। তখন থেকে মঠাধ্যক্ষের নির্দেশে, দুজন সেবক সর্বদাই তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকত। তাঁর সেবকগণ ও মঠের অন্যান্য সাধুরা তাঁর যথাসাধ্য সেবা করতেন। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ লিখেছেন: 'দেখিতাম তখনও, ঐ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার সর্বদা হাসিমুখ। আমরা দূর হইতে আসিয়াছি বলিয়া খুঁটিনাটি করিয়া আমাদের সকল খবর লইলেন। তাঁহার শারীরিক খবর জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর যে রকম রেখেছেন সে রকমই আছি।'

এই তো রামকৃষ্ণ-সন্তানের যোগ্য কথা।

ধীরে ধীরে মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনিয়ে আসে তাঁর উপর। কিন্তু তাঁর পরিচর্যাকারী সেবকগণ লক্ষ্য করতেন যে খোকা মহারাজের মুখে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের ভাব দেখা যেত না—বরং তিনি তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। মহাপ্রয়াণের পূর্ব রাত্রে তিনি বলেছিলেন: 'এই মঠের ওপর ঠাকুরের আশীর্বাদ চিরন্তন হয়ে থাকুক—এই আমার শেষ প্রার্থনা।' ১৯৩২, ২ ডিসেম্বর, স্বামী সুবোধানন্দ মহাসমাধিলাভ করেন।

———

জীবনীসাহিত্যে শৈব্যার শ্রেষ্ঠ অবদান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত

জীবনীশতক

দুটি অভিমত

[এক] সভ্যতার রাজপথে মহাজীবনের মিছিলে আমরা যে কৃতী পুরুষদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখেছি স্বভাবতই তাদের জীবন আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। এই রকম একশজন বিখ্যাত ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আলোচিত হয়েছে 'জীবনীশতক' গ্রন্থে। গ্রন্থের পরিধি খুব বিস্তীর্ণ।...কয়েকজন মহীয়সী নারীর জীবনকথা এ গ্রন্থের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করেছে। লেখক জীবনী রচয়িতারূপে সুপরিচিত। এখানেও তিনি জীবনী রচনার মূল নীতি অনুসরণ করেছেন। সর্বত্রই তাঁর সযত্ন চেষ্টা এবং আশ্চর্য নিরাসক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

[দুই] Moni Bagchi is one of our distinguished writers of biography, and for the best part of his literary career has presented Bengali readers with many excellent biographical pieces. Now he has presented a volume of one hundred biographical sketches. Even a little bit of anything good is worthwhile. This perhaps is the message of 'Jibanishatak'...It is a major achievement.

The Statesman